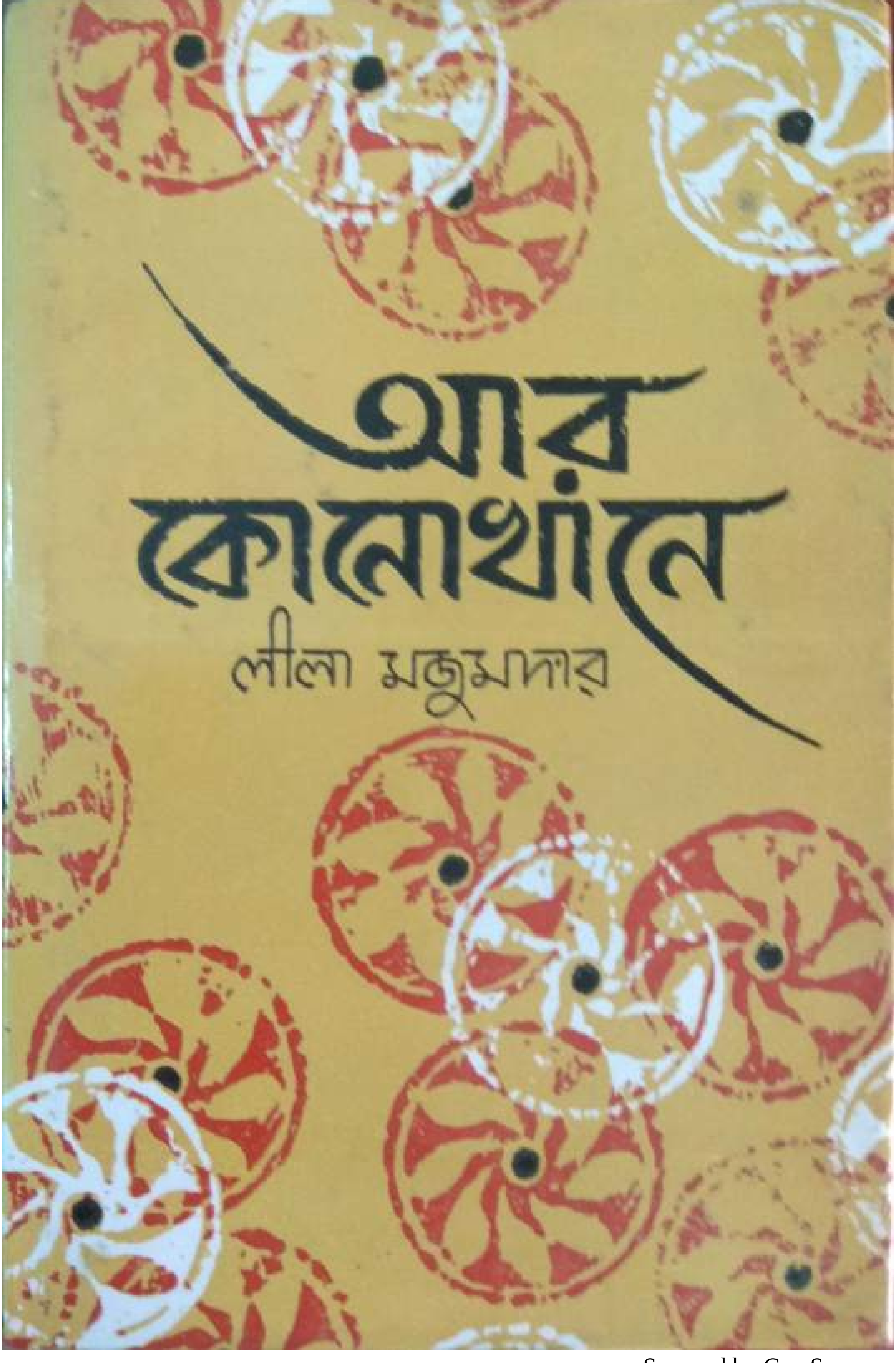

Scanned by CamScanner

আর কোনোখানে / লীলা মজুমদার

Scanned by CamScanner

আর কোনোখানে

লীলা মজুমদার

রবীন্দ্র পুরস্কার ঃ ১৩৭৫

মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭৩

Scanned by CamScanner

প্রথম প্রকাশ, ফাল্গুন ১৩৭৪
ঊনবিংশ মুদ্রণ, ভাদ্র ১৪১৯

— একশ কুড়ি টাকা—

প্রচ্ছদপট :
অঙ্কন—আশু বন্দ্যোপাধ্যায়
লীলা মজুমদারের ছবি
১৪.৮.৭৫-এ চৌরঙ্গীর বাড়িতে তোলা
সৌজন্য—মোনা চৌধুরী
পুস্তক অলঙ্করণ : শ্রীপার্থপ্রতিম বিশ্বাস

লীলা মজুমদারের সংক্ষিপ্ত জীবন ও সাহিত্য পরিচয়
লীলা মজুদার : ফিরে দেখা—বারিদবরণ ঘোষ

AAR KONOKHANEY
A memoir by Leela Mazumdar. Published by Mitra & Ghosh Publishers Pvt. Ltd. 10 Shyama Charan Dey Street, Kolkata 700 073

Price Rs. 120/-

ISBN : 81-7293-232-4

WEBSITE : www.mitraandghosh.co.in

॥ বিশেষ বিজ্ঞপ্তি ॥

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনও রকম পুনর্মুদ্রণ বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনর্ব্যবহার বা পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘন করলে লঙ্ঘনকারীর বিরুদ্ধে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩ হইতে পি. দত্ত. কর্তৃক প্রকাশিত ও অটোটাইপ, ১৫২ মানিকতলা মেন রোড, কলকাতা ৭০০ ০৫৪ হইতে তপন সেন কর্তৃক মুদ্রিত

Scanned by CamScanner

এই বইখানি আমি আমার সব চেয়ে ছোট ভাই যতির স্মৃতিতে উৎসর্গ করলাম। সে ছিল আমাদের মধ্যে সব চাইতে সুন্দর ও সব চাইতে দুঃখী। কিন্তু তার অন্তরে যে দীপশিখাটি নিরন্তর জ্বলত, তার আলোতে আজো আমি পথ দেখতে পাই।

এই বইয়ে বর্ণিত ঘটনা ও মানুষ সব-ই সত্যি। নামগুলিও বদলাই নি। সর্বদা চেষ্টা করেছি যেন কল্পনার খাদ মিশে না যায়। তবু জানি স্মৃতিশক্তি অভ্রান্ত নয়।

সুখ-দুঃখে ভরা এই সংসারে, কেউ যদি এই বই পড়ে এতটুকু আনন্দ বা সান্ত্বনা পায়, সেই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

Scanned by CamScanner

'আর কোনোখানে'—অধ্যায়-বিন্যাস

অধ্যায় এক	— শিলং-এর প্রাকৃতিক দৃশ্য আর প্রবল বৃষ্টিপাতের কথা।
অধ্যায় দুই	— শিলং-এর শীত। রাতের হিম জমে পাহাড় মাঠ ভোরবেলায় সাদা হয়ে থাকার দৃশ্য।
অধ্যায় তিন	— 'বাংলার বাঘ'-এর (স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়) আগমন শিলং-এ। মাসের গোড়ায় 'সন্দেশ' পত্রিকার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকা।
অধ্যায় চার	— শিলং-এ রবীন্দ্রনাথের আগমন ১৩২৬।
অধ্যায় পাঁচ	— লেখিকার বড়দা (সুকুমার রায়) সস্ত্রীক সুপ্রভা সহ শিলং-এ আগমন।
অধ্যায় ছয়	— বড়দাকে ঘিরে পারিবারিক স্মৃতিচারণ।
অধ্যায় সাত	— লেখিকাদের শিলং-এর জীবনযাত্রা খুব সাদাসিধে ছিল। মাংস রান্না হলে বাড়িতে আনন্দের ঢেউ পড়ে যেত।
অধ্যায় আট	— এবার শিলং থেকে কলকাতায় ফেরার পালা। প্রথমে প্রতিবেশী কাঞ্জিলালবাবুরা—তারপর লেখিকাদের পরিবার ১৯১৯-এ কলকাতার উদ্দেশে রওনা দিলেন।
অধ্যায় নয়	— কলকাতায় ফেরা—পাণ্ডুঘাটে জাহাজ করে ব্রহ্মপুত্র পার হয়ে পরে আবার ট্রেনে।
অধ্যায় দশ	— কলকাতায় ফেরার সময় ছোট ভাই যতি ট্রেন থেকে নীচে পড়ে যায়।
অধ্যায় এগারো	— স্বদেশী আন্দোলন শুরু। ১৯১৯ রাউলাট বিল নিয়ে সারা দেশে গণ্ডগোল। গান্ধীজী নেতৃত্ব দিয়েছেন আন্দোলনে।
অধ্যায় বারো	— সমগ্র রায় পরিবারের পারিবারিক কথা।
অধ্যায় তেরো	— কলকাতায় ভবানীপুরে লেখিকাদের বাড়ি ভাড়া আর লেখিকার পিতার শিলং থেকে সব পাট চুকিয়ে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন দৃশ্য।
অধ্যায় চোদ্দ	— 'সন্দেশ' পত্রিকায় লেখিকার গল্প লেখা শুরু। আর এই সময় সব থেকে মর্মন্তুদ ঘটনা ১৯২৩-এ সুকুমার রায়-এর আকস্মিক মৃত্যু, পুত্র সত্যজিতের বয়স মাত্র এক।
অধ্যায় পনেরো	— ১৯২৪শে লীলা মজুমদারের জলপানি নিয়ে ম্যাট্রিক পাশ ও কলেজে ভর্তি।
অধ্যায় ষোল	— কলেজ জীবন পূর্ণোদ্যমে। আর গিরিডিতে স্বাস্থ্যের জন্য বেড়াতে যাওয়া।
অধ্যায় সতেরো	— কলেজ জীবনের নানা বন্ধু বান্ধবদের কথা ও কলেজের শিক্ষক শিক্ষিকাদের বিষয় আলোচনা।
অধ্যায় আঠারো	— রবীন্দ্র-সান্নিধ্য লাভ ও শান্তিনিকেতনে গুরুদেবের সত্তর বছর পূর্তির জয়ন্তী উৎসব পালন।
অধ্যায় উনিশ	— দীনদা—অর্থাৎ শান্তিনিকেতনে দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ঘিরে নানা প্রসঙ্গ।
অধ্যায় কুড়ি	— শান্তিনিকেতনের চাঁদের হাটের প্রসঙ্গ। নানা জ্ঞানী-গুণিজনের নানা কথায় ভরা।
অধ্যায় একুশ	— শান্তিনিকেতনে নাটকের মহড়া ('শাপমোচন' ও 'নটীর পূজা')। শান্তিনিকেতন থেকে লেখিকার ইস্তফা ও পরে রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী চিঠি পাওয়া ১৯৩৯-এ।
অধ্যায় বাইশ	— লেখিকার আশুতোষ কলেজে মেয়েদের বিভাগে পড়ানোর চাকরি—শ্যামাপ্রসাদের চেষ্টায়।
অধ্যায় তেইশ	— একই সঙ্গে অধ্যাপনা ও লেখালিখি শুরু।
উপসংহার	— সমগ্র স্মৃতিকথার সংক্ষিপ্তসার।

Scanned by CamScanner

লীলা মজুমদার : ফিরে দেখা

বাংলার শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি ও মননের বিকাশের ক্ষেত্রে ঠাকুর পরিবারের মতই আর একটি পরিবার যে বিশেষ নজর কেড়ে নিয়েছে তা হল রায়চৌধুরী পরিবার। সারদারঞ্জন, প্রমদারঞ্জন, উপেন্দ্রকিশোর, সুকুমার, কুলদারঞ্জন, সুখলতা, পুণ্যলতা, সত্যজিৎ রায়রা এই পরিবারের এক একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। লীলা মজুমদারও এই কৃষ্টিজগতের এক অন্যতম যশস্বিনী তারকা।

লীলা রায়ের জন্ম ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯০৮ সালে, কলকাতায়—জ্যাঠামশাই উপেন্দ্রকিশোরের বাড়িতে। বাবা প্রমদারঞ্জন রায়, মা সুরমা দেবী। প্রমদারঞ্জন যখন মারা যান ১৯৫১ সালে, তখন লীলার বিয়ে হয়ে গেছে বিশ বছর আগে—রায় থেকে মজুমদার হয়েছেন ততদিনে। আট ভাই বোন তাঁরা—প্রভাতরঞ্জন, সুলেখা, লীলা, কল্যাণরঞ্জন, অমিয়রঞ্জন, সরোজরঞ্জন, যতিরঞ্জন এবং লতিকা। পিতা প্রমদা নিজেও ছোটোদের জন্যে অনেক লিখেছিলেন—'সন্দেশে'র পৃষ্ঠায় সেগুলি ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। জরিপের কাজে শ্যাম ও ব্রহ্মদেশ ঘুরে বেড়ানোর অভিজ্ঞতাকে ছোটদের উপযোগী ভাষায় লিখতেন। 'বনের খবর' নামে একটি ছোট্ট বই-ও বের হয়েছিল তাঁর। বাবার চাকরিসূত্রেই লীলা রায়ের ছোটবেলা কেটেছিল (১৯০৮-১৯১৯ পর্যন্ত) শিলঙে।

পড়াশুনোর শুরু এখানের লরেটো কনভেন্টে ১৯১৪ সালে। ১৯১৯ সালে বাবার সঙ্গে কলকাতায় এলেন। ভর্তি হলেন কলকাতার ডায়োসেশান স্কুলে ফোর্থ ক্লাসে, অর্থাৎ এখনকার ক্লাস সেভেনে। ১৯২৪ সালে এখান থেকে চারটি লেটার নিয়ে ফার্স্ট ডিভিসনে ম্যাট্রিক পাশ করেন। সব পরীক্ষার্থীদের মধ্যে স্থান হল দ্বাদশ, আর মেয়েদের মধ্যে দ্বিতীয়। এই ডায়োসেশান স্কুল থেকেই আই. এ. পাশ করলেন দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে ১৯২৬ সালে। ১৯২৮ সালে পাশ করলেন বি. এ. ইংরেজিতে অনার্স সহ। এবারে একেবারে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান দখল করে নিলেন। ১৯৩০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এম. এ. পাশ করলেন প্রথম শ্রেণীতে যুগ্মভাবে প্রথমস্থানটি বজায় রেখেই।

একটা কথা লীলা মজুমদার বলতেন শুনেছি, বয়সে লেখা শুরু না করলে ভাল লেখক হওয়া যায় না। লীলা মজুমদার যখন লীলা রায়, তখনই কিন্তু তাঁর লেখালিখির সূচনা। ছ' বছর বয়সেই নিজের ছোট্ট খাতায় জন্তু-জানোয়ারদের নিয়ে ইংরেজি গল্প লেখার আঁকিবুকির সূত্রপাত। সেটা জানাজানি হতেই কুট্টিবেলার সেই ছোট্ট খাতাটি কুটিকুটি করে ছিঁড়ে ফেলেছিলেন। তখন অবিশ্যি ভাল করে বাংলা অক্ষর পর্যন্ত চিনতেন না। নিজের চেষ্টাতেই কোন্ ছোট বেলাতেই তাঁর বাংলা শেখার সূচনা। কলকাতায় পড়ার সময় ম্যাট্রিক পাশের দু'বছর আগেই সুকুমার রায়ের প্রবর্তনায় সন্দেশে প্রথম লেখা ছাপা হল 'লক্ষ্মীছাড়া' 'লক্ষ্মীছেলে' নামে। তার আগেও অবিশ্যি তাঁর লেখা প্রকাশ পেয়েছিল, তবে ছাপার অক্ষরে নয়, হাতের লেখায়। তাঁর স্কুলের হাতে লেখা পত্রিকা 'প্রসূন'-এ একটি হাসির গল্প। সে ১৯২০ সালে লেখা। অর্থাৎ, বারো বছর বয়সেই কুমারী লীলার আত্মপ্রকাশের সূচনাক্ষণ।

Scanned by CamScanner

'সন্দেশে'র লেখাটি অনেকের প্রশংসা কুড়িয়ে নিলে। কিন্তু লেখিকা খুশি নন। গল্পে একটি ছেলে দুষ্টুমি করে লাভবান হয়েছিল—এটা লেখিকার কুশিক্ষা মনে হয়েছিল পরে। তাই নিজেকে তৈরি করতে লাগলেন ইংরেজি বাংলা দুটো লেখাতেই। এ সময়েই আবার 'সন্দেশ' বের হতে সুরু করল সুবিনয় রায়ের সম্পাদনায়। বছর দুয়েক চলেছিল। 'সন্দেশে'র এই পর্বে গল্প লেখার জন্যে ধরলেন সুবিনয়। লিখলেন এম.এ. ক্লাসের ছাত্রী লীলা রায় 'দিন দুপুরে'। মনের জানলা গেছে খুলে। প্রতিমাসেই 'সন্দেশে' একটা করে গল্প লিখতে আরম্ভ করেছেন। এভাবে জমে গেল বারোটি গল্প। তাই জমিয়ে ছাপা হল তাঁর প্রথম বই 'বদ্যিনাথের বড়ি'। ছাপলেন ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, দাম আট আনা। ভেতরকার ছবিগুলিও তিনিই এঁকে দিলেন। সেটা ছিল ১৯৩৬ সাল। লীলা রায় ততদিনে লীলা মজুমদার হয়ে গেছেন।

১৯৩৩ সালে বাবা-মায়ের অমতেই লীলা রায় বিয়ে করলেন প্রখ্যাত দন্ত-চিকিৎসক ডা. সুধীরকুমার মজুমদারকে। তাঁদের রেজেস্ট্রি বিয়েতে উপস্থিত ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। এক ছেলে রঞ্জন (জন্ম ১৯৩৩), এক কন্যা কমলা (জন্ম ১৯৩৭)।

বিয়ের আগে ১৯৩০ সালে প্রথম শিক্ষকতা করেছেন দার্জিলিং-এর মহারানি স্কুলে। পরের বছরে রবীন্দ্রনাথ ডেকে পাঠালেন শান্তিনিকেতনে পড়াবার জন্যে। তখন সেখানে শিশু বিভাগে পড়াতেন অসাধারণ দেশকর্মী আশা অধিকারী। তিনি এক বছরের ছুটি নিয়েছিলেন। ১৯৩০-এর শেষের দিকে তাই শান্তিনিকেতনে এসে বছর খানেকের জন্য 'শিশু বিভাগ' পরিচালনার দায়িত্ব পান অধ্যাপক হিসেবে। পড়াতেন ইংরেজি এবং গণিত। মাইনে পেতেন পঁয়ষট্টি টাকা। এরপর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আহ্বানে তিনি আশুতোষ কলেজে মেয়েদের বিভাগের দায়িত্ব নিয়ে চলে আসেন শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায়। বছরখানেক (১৯৩২-৩৩) এখানে অধ্যাপনা করেন। সেখান থেকেই চলে আসেন বিদ্যাসাগর কলেজে মহিলা বিভাগে অধ্যাপনাসূত্রে (১৯৩৪-৩৫)।

ঠিক এই পর্বেই শুরু হয় তাঁর স্বাধীনভাবে সাহিত্যসাধনার অধ্যায় ১৯৫৬ সালে, আকাশবাণী কলকাতায় যোগদানের আগে পর্যন্ত। রচিত হতে থাকে আলোচনা, সুকুমার-সাহিত্য, নাটক, উপন্যাস—নানান ধরনের রচনা। এম. এ পাশ করার পর শান্তিনিকেতনে পড়ানোর সূত্রে নন্দলাল বসুর কাছে ছবি আঁকাও শিখতে গিয়েছিলেন। কিছুদিন কুলদারঞ্জন রায়ের বন্ধু পরশ দত্ত-র কাছেও তালিম নিয়েছিলেন জলরঙে আঁকার। তার ফসল আমরা পেয়েছি 'বদ্যিনাথের বড়ি' বইতে। তারপর থেকে আরও লেখা ছাপা হয়েছিল। একদিন লাইট হাউসে সিনেমা দেখে ফেরার পথে সত্যজিৎ রায় (তাঁদের মানিক) প্রস্তাব দিলেন সিগনেট প্রেস লীলা মজুমদারের গল্পের বই ছাপতে চায়। খুশি তিনি। ১৯৪০ সালে সেখান থেকে ছেপে বের হল 'দিনদুপুরে' খান পঁচিশেক গল্প নিয়ে। ছবি আঁকলেন সত্যজিৎ-ই। কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের রং মশাল কাগজে বের হয়েছিল তাঁর প্রথম কিশোর উপন্যাস—'পদীপিসির বর্মী বাক্স'। 'ভয় যাদের পিছু নিয়েছে' নাম বদল করে 'গুপির গুপ্তখাতা' নামে ছেপে বের হল ১৯৫৯ সালে (পরে অবশ্য) আদি নামেই ছাপা হতে থাকে। প্রথম বড়দের উপন্যাস 'শ্রীমতী' ও 'জোনাকি' ছাপা হয় 'শ্রীমতী' পত্রিকায়। তাও বের হল বই আকারে।

Scanned by CamScanner

১৯৫২ সালে বেতারে মহিলামহলে 'ঠাকুমার চিঠি' ধারাবাহিকভাবে প্রচারিত হত। এশিয়া পাবলিশিং হাউস বের করে 'মণিমালা', 'বাঘের চোখ' ছাপা হল ১৯৫৫ সালে।

১৯৬১ সালে সত্যজিৎ রায়ের উদ্যোগে আবার প্রকাশ পেল 'সন্দেশ'। তাতে তিনি প্রকাশ করেন মজুমদার মশাই-এর 'স্মৃতিকথা'। এ বছরের ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড প্রকাশ করে লীলা মজুমদারের 'টাকা গাছ' জয়ন্ত মজুমদারের সঙ্গে। তাঁর প্রথম নাটিকা 'বক-বধপালা' ১৯৬৩ সালে দিল্লির সঙ্গীত নাটক আকাদেমির পুরস্কার নিয়ে নেয়। প্রকাশ পায় গল্প-দাদুর আসরে প্রচারিত নাটক 'মোহিনী'-ও। একে একে বের হতে শুরু করে বড়দের উপন্যাস 'চীনে-লণ্ঠন', 'ইস্টকুটুম' বড়দের ছোটগল্পের সংগ্রহ 'লাল নীল দেশলাই'। ১৯৬৬ সালে প্রকাশ পেল দুটি বই—'গণু পণ্ডিতের গুণপনা' এবং 'হট্টমালার দেশে'। সন্দেশের প্রকাশিত 'কলের পুতুল', 'মাকুর গল্প' বই আকারে ছাপার পর চিলড্রেন বুক ট্রাস্ট প্রকাশ করে 'রিপ দি লেপার্ড' আর ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট 'বড় পানি'। ১৯৭৩ সালে 'কথাসাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ধারাবাহিক উপন্যাস 'যাত্রী' এবং এ বছরেই যুগান্তরে প্রকাশ পায় খুচরো খুচরো দারুণ লেখা, 'খেরোর খাতা'। 'নাকুগামা' ছাপা হল রোশনাই পত্রিকায় ১৯৭৪ সালে। আর এ বছরেই আনন্দ পাবলিশার্স বের করে তাঁর কল্পবিজ্ঞানের বই 'বাতাসবাড়ি'। ১৯৭৯ সালে সন্দেশে বের হতে থাকে ধারাবাহিকভাবে, 'ভূতোর ডাইরি'। ভূতের গল্প সংকলন 'আরো ভূতের গল্প' ছাপা হয় ১৯৮১ সালে। তাঁর একশো বছরের জীবনে শতাধিক গ্রন্থের লেখিকা লীলা মজুমদারের অন্যান্য বইয়ের মধ্যে রয়েছে টংলিং, হলদে পাখীর পালক (১৯৫৮), উপেন্দ্রকিশোর, অবনীন্দ্রনাথ, নেপোর বই, নদীকথা, বড়পানি, হাতিহাতি, ঝাঁপতাল, আয়না, নাচঘর, পাখি, আগুনি বেগুনি, আমি ত তাই, ঘরকন্নার বই, জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি, পটকা চোর, পাকদণ্ডী প্রভৃতি।

মিত্র ও ঘোষ থেকে প্রকাশিত হয় 'আমি নারী' (১৯৮৯) উপন্যাস এবংস্মৃতি-কথা 'আর কোনোখানে' (১৯৬৮)। 'আর কোনোখানে' বই আকারে প্রকাশিত হবার আগে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় মাসিক 'কথাসাহিত্য' পত্রিকায়। ১৯৬৮ সালে রবীন্দ্রপুরস্কারে সম্মানিত 'আর কোনোখানে' একটি ব্যতিক্রমী বই। এটি লেখা কীভাবে হল সে সম্পর্কে লেখিকা নিজেই লিখেছেন—'আমার চেয়ে আট বছরের ছোট, আমাদের ভাই-বোনদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট ভাই, প্রথম জীবনে আমরা মনে করতাম সে খুব ঈশ্বরের আশীর্বাদ পেয়েছে, তার ছিল যেমন সুন্দর চেহারা, পড়াশুনোতেও খুব ভাল ছিল, কর্মজীবনেও সফল হয়েছিল সেই ভাই, পরবর্তী জীবনে নানারকম দুঃখ পেয়ে শেষে অসুখ করে বেশ কম বয়সে মারা যায়। তখন আমার এত দুঃখ হয়েছিল যে, মনের মধ্যে যেন সমস্ত ছোটবেলাটা উথলে উঠেছিল। সেই সময় গজেনবাবু (গজেন্দ্র মিত্র) একবার এসেছিলেন, ওঁকে এই কথাগুলি বলতে উনি বললেন, 'লিখুন না'। সেই লিখলাম 'আর কোনোখানে'। শিলং থেকে কলকাতায় আসা—আমার বিয়ের আগে পর্যন্ত ওতে আছে। আমার মনে যে কথাটি যে-ভাবে এসেছে, ঠিক সেভাবেই লিখেছি। ওতে কোনও একটি কথাতেও সাহিত্যের সাজ

Scanned by CamScanner

বাইরে থেকে পড়ানো নেই। এরপরে আর কখনও আত্মজীবনী লেখার কথা ভাবিনি, যতদিন না 'অমৃত' পত্রিকা থেকে মণীন্দ্র রায় এসেছিলেন। .... এভাবেই শুরু হয় 'পাকদণ্ডী'র প্রথম পর্ব। ....'আর কোনোখানে'তে আমার মনের জগতের বিবরণীই প্রাধান্য পেয়েছে। 'পাকদণ্ডী' আমার বহির্জগতের অভিজ্ঞতা নির্ভর লেখা।'' এজন্যেই বলছিলাম —'আর কোনোখানে' একটি ব্যতিক্রমী বই। এখানেই লীলা মজুমদারের মনের জগতের যাবতীয় ভাণ্ডার।

'আকাশবাণী'তে তিনি দীর্ঘদিন ছিলেন—১৯৫৬-১৯৬৩ কালপর্বে, প্রযোজকের পদে বৃত হয়ে—শিশু ও মহিলা বিভাগের দায়িত্ব নিয়ে। তারপরেই পুনশ্চ স্বাধীনভাবে সাহিত্য সাধনার পালা। এই পর্বে 'সন্দেশ' পত্রিকার সম্পাদনাভার গ্রহণ তাঁর জীবনের একটি অন্যতম মুখ্য দায়িত্ব পালন ছিল (১৯৯৪)অবধি। নানা প্রতিষ্ঠানে তিনি সদস্য হিসেবে যুক্ত ছিলেন। যেমন, মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদ, ডি. পি. আই.-এর সম্পাদক বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী কার্যনির্বাহক পরিষদ, সাহিত্য আকাদেমির সাধারণ পরিষদ প্রভৃতি। ১৯৬৩ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'লীলাস্মৃতি লেকচারার' পদে যোগ দেন। ১৯৬৬ সালে সমগ্র সাহিত্য-কৃতির কারণে ভূষিত হন আনন্দবাজার পত্রিকার 'সুরেশ স্মৃতি পুরস্কারে'। ১৯৬৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুনশ্চ তাঁকে 'শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লেকচারার' মনোনীত করে। তাঁরা তাঁকে ভুবনমোহিনী 'সুবর্ণ পদক' দানেও সম্মানিত করেন। অন্যান্য পুরস্কারের মধ্যে রয়েছে লীলা পুরস্কার, বিদ্যাসাগর পুরস্কার, শিশুসাহিত্যের জন্য ভুবনেশ্বরী পদক। ভারত সরকার প্রদত্ত শিশুসাহিত্য পুরস্কার এবং সঙ্গীত-নাটক আকাদেমির পুরস্কারের কথা আগেই বলা হয়েছে।

লীলাদির ছোটবেলা কেটেছে শিলং-এ, মধ্য বয়স কলকাতায় এবং ১৯৫৪-এর পর শান্তিনিকেতনে বাড়ি করে শান্তিনিকেতনবাসী। প্রায়শই, শ্বশুরবাড়ি নদিয়া জেলার, তারপরে বিহারে, আরও পরে মধ্য-এশিয়ায়। এক কথায় একটা বহুজাতিক-বহুস্থানিক জীবনের অভিজ্ঞতা-সরস লীলা মজুমদার নিজেই একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠেন। মেয়েদের মেয়েলিপনা তিনি সইতে পারতেন না, কিন্তু মেয়েদের যে কিছু বিশিষ্ট গুণ থাকার প্রয়োজন, তা অনুভব করতেন। নইলে রান্নাবান্না নিয়ে তাঁর এতো লেখালেখি করতেন না। নিজে রাঁধতে এবং রেঁধে খাওয়ানতে তাঁর জুড়ি ছিল না। রবীন্দ্রনাথ একদা তাঁর 'ডালের পায়েস' খেয়ে অভিভূত হয়েছিলেন। তার কলমে যে কালিটি ভরা থাকতো তার তরল মাধ্যমটি ছিল তাঁর সরস রসবোধ। লীলা মজুমদার এই রসেই লীলায়িত—তাই তাঁর কলমে বড়দের-ছোটদের লেখায় এতো মিতালি।

সরস-সৃষ্টিশীল এই লেখনি এক সময়ে থেমে গেল—১৯৯৪ সাল নাগাদ। তারপর দীর্ঘ অসুস্থতা। এরই মধ্যে পা দিলেন একশো বছরে। আর তারপরেই সাহিত্যের শতকুম্ভ পূর্ণ করে এই মহীয়সীর চিরপ্রস্থান ৫ এপ্রিল ২০০৭-এ।।

Scanned by CamScanner

(১৯০৮ — ২০০৭)

Scanned by CamScanner

আর
কোনোখানে

Scanned by CamScanner

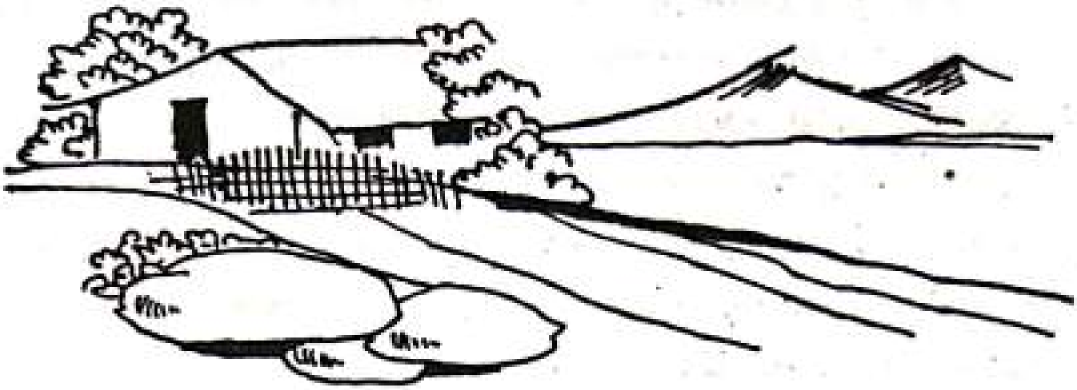

॥ এক ॥

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে নিরাপদ স্থান ছিল আমার মায়ের বাড়িটি। দু'সারি ইকড়া দিয়ে গাঁথা তার দেয়াল, তার উপরে ভিতরে বাইরে চুন বালির পলেস্তারায় চুনকাম করা। দুই সারি ইকড়ার মাঝখানে এক বিঘৎ ফাঁক, তার মধ্যে রাতে বড় বড় ইঁদুরদের দাপাদাপিতে মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে যেত, কিন্তু ঐ ফাঁক রাখার জন্যই বাইরের প্রচণ্ড শীত ঘরের ভিতরে ততটা সেঁধোতে পারত না। মাথার উপরে নীল করোগেটের ছাদ, তার তলায় টান করে চুনকাম করা ক্যাম্বিসের সিলিং; এমন সুন্দর, এমন আরামের, এমন নিরাপত্তার জায়গা এ জগতে আজ অবধি তৈরি হয়েছে বলে আমার মনে হয় না। যদিও একটা বড় করাত দিয়ে যে কেউ দু'সারি ইকড়ার দেয়াল কেটে ফেলতে পারত, তবু বিপদের যে কোনো সম্ভাবনাই ছিল না এ বিষয়ে আমরা সবাই নিশ্চিন্ত ছিলাম, কারণ ধারেকাছে কোথাও বিপদের সম্ভাবনা হবামাত্র আমার মা যে তাঁর গোলাপি নখ দেওয়া ফর্সা হাত দুটি দিয়ে তাকে স্বচ্ছন্দে ঠেকিয়ে রাখতে পারবেন, এ বিষয়ে আমাদের কারো মনে বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না।

পাহাড়ের ঢালের উপর লম্বা একহারা বাড়ি, চারদিকে তার কাঁটা-তারের বেড়া ঘেঁষে মে-ফ্লাওয়ারের ঝোপ, বসন্তকালে তাতে থোপা থোপা সাদা ফুল ফুটে, লতানে গোলাপের ফুলের ছড়ার সঙ্গে মাখামাখি হয়ে থাকে। লালচে রঙের কাঠের ফটক দিয়ে ঢুকে, ঢালু কাঁকর বিছানো পথ দিয়ে নেমে ছোট একটা পাথরের পুল পার হয়ে আমাদের বাড়ির সামনের কাঠের রেলিং ঘেরা কাঠের বারান্দায় উঠতে হত।

Scanned by CamScanner

ব্যস্, আর কোনো ভয় নেই। বারান্দার ছাদের কড়ি থেকে ঝুলে থাকত তারে বাঁধা সরলগাছের ছালসুদ্ধ সরু ডালের তৈরি অনেকগুলি চারকোণা ঝোড়া, তাতে অর্কিড ফুলের বাহার দেখে লোকে অবাক হয়ে যেত। যেন মোমের তৈরি ফুল; কি তাদের রঙ, ফিকে বেগ্‌নি, হলদে, সাদা, খয়েরি ফুটকি, ঘোর বাদামি ডোরা-কাটা, স্বর্গের ফুল সব, তার ভুরভুরে গন্ধ ধুপধুনো মসলার কথা মনে করিয়ে দিত। এখনো মাঝে মাঝে স্বপ্নে সে গন্ধ পাই।

অর্কিডের তলায় তলায় বারান্দার ধার দিয়ে রেলিং ঘেঁষে এক সারি সবুজ চারকোণা কাঠের টব ছিল, তাতে ছোট বড় নানান রঙের নানান জাতের জেরেনিয়ম ফুল ফুটত। তার গোল পুরু নরম লোমশ পাতা ছিঁড়ে আমরা হাতে ঘষতাম, তারপর রাতে নরম গরম বিছানায় শুয়ে অনেক সময় নিজেদের আঙুল শুঁকতাম, কি যে তার সুগন্ধ!

বেজায় বৃষ্টি পড়ত ঐ পাহাড়ে দেশে; শুনতাম মাত্র বত্রিশ মাইল দূরে ছোট একটি জায়গায় পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বেশি বৃষ্টি পড়ে ; শুনে ভারি একটা গর্ব মনে হত। বছরের পাঁচ মাস বৃষ্টি পড়ত বটে, কিন্তু কোথাও এক ফোঁটা জল দাঁড়াত না, পাহাড়ের গা বেয়ে পুরনো নদীকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে, হাজার হাজার নতুন ছোট নদী তৈরি করে, সে জল নিচের উপত্যকায় নেমে যেত। রাতে আমার দিদির গা ঘেঁষে, একই মোটা লেপের নিচে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে শুয়ে, শুনতে পেতাম টিনের ছাদে অবিরাম ঝম ঝম করে বৃষ্টি পড়ছে। মাঝে মাঝে টিনের কোনো ছ্যাঁদা দিয়ে জল চুঁয়ে সিলিং ভিজে, টপ্ টপ্ করে ঘরের কাঠের মেঝেতেও পড়ত, তার আরেক রকম শব্দ। মা উঠে সেখানে এনামেলের ছোট গামলা বসিয়ে দিতেন, তার মধ্যে টুপ টুপ করে জল পড়ার শব্দ শুনতে শুনতে আবার কখন ঘুমিয়ে পড়তাম। একেক সময় দিদি বিরক্ত হয়ে ঠেলে দিত, বলত, 'কেন আমার গায়ে ঠাণ্ডা পা লাগাচ্ছিস?' দিদি আমার চেয়ে এক বছরের বড়, কি আরামের যে ওর গরম হাত-পা ছিল, সে আর কি করে বোঝাই!

টিনের ছাদ থেকে জল গড়িয়ে বাড়ির চারদিকে খোঁড়া খুদে পরিখা

Scanned by CamScanner

ধরে ধরে গিয়ে, বাড়ির পিছনে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে, একেবারে নিচে আমাদের কাঁটাতারের বেড়ার বাইরে ছোট নদীতে গিয়ে মিশত। অন্য সময়ে যে নদী ছোট-বড় নানারকম নুড়ি পাথরের মধ্যে দিয়ে কুলকুল করে বয়ে যেত, বৃষ্টির সময়ে ভীষণ গর্জন করে, কূল ছাপিয়ে, পাথর ডুবিয়ে, পাঁচশো বুনো ঘোড়ার মতো দাপাদাপি করে সে ছুটে চলত। তার মধ্যে মানুষ পড়লে কোথায় ভেসে যেত, আর তাকে খুঁজে পাওয়া যেত না।

কিন্তু আমাদের নীল ছাদ দিয়ে ঢাকা ছোট নিরাপদ বাড়ি থেকে এত সব টেরই পাওয়া যেত না তবে মেঘলা বিকেলে, স্নানের ঘরে বড় লোহার আংটা জ্বেলে, তার উপর মস্ত বাঁশের ধামা চাপিয়ে, তার উপরে আমাদের কাচা জামা শুকোনো হত, আমাদের পাহাড়ি ধাইমারা তখন কত যে ভয়ের গল্প করত তার ঠিক নেই। শোবার ঘর থেকে স্নানের ঘরে নামবার পাথরের সিঁড়ির ধাপে জড়াজড়ি করে বসে শুনে শুনে আমাদের সর্বাঙ্গে কাঁটা দিত।

ইল্‌বন বলত—'সন্ধে না হতেই কা'কমি ভোরেন, কা'কমি মেভিলা বাড়ি চলে যায় কেন জান তো? ডাকুর ভয়ে।'

আমরা শিউরে উঠতাম। দাদা বলত—'তোমারো নিশ্চয় ভয় করে তাই তুমি রাতে বাড়ি যাও না, ইল্‌বন?'

ইল্‌বন নাক সিঁটকে বলত—'তাই না আরো কিছু। আমাদের বংশের সবাই সাপের পুজো করে, আমাদের আবার কিসের ভয়।'

'তবে তুমি এখানে থাক কেন? বাড়ি যাও না কেন?'

ইল্‌বন একটু অন্যমনস্ক হয়ে বলত—'আমার বাড়িঘর নেই, তাই যাই না। ভয় করব কেন?'

আমি চটে যেতাম। 'বাড়িঘর নেই আবার কি, তবে তোমার ছেলে হেড্রিক্সন কোথায় থাকে?'

'সে থাকে তার ঠাকুমার বাড়িতে, আমি তাকে চার বছর দেখি নি।'

কি বলব ভেবে পেতাম না, ওর মুখটা যেন কি রকম হয়ে যেত। দাদা তবু বিশ্বাস করতে চাইত না, বলত, 'দেখ নি তো সেদিন কি করে বললে হেড্রিক্সন নংপোর স্কুলে বরাবর প্রাইজ পায়।'

Scanned by CamScanner

ইল্‌বন শুকনো কাপড়ের তাল হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে, কর্কশ গলায় বলত—'যারা ভালো হয় তারা নিশ্চয় স্কুলে প্রাইজ্‌ পায়, তার জন্যে তাদের দেখবার দরকার করে না। আমার ছেলে হেড্রিক্সন তোমাদের সবার চেয়ে ঢের ঢের ভালো।' তাতে আমাদের কোনো আপত্তি ছিল না, আমাদেরও দৃঢ় বিশ্বাস ছিল হেড্রিক্সনের মতো ভালো ছেলে হয় না, নইলে ইল্‌বন অত করে বলে কেন। দিদি ইল্‌বনের বটুয়া ধরে টেনে বলত—'না, ইল্‌বন, না, আমরা জানি হেড্রিক্সন বড্ড ভালো। একটু পানের বোঁটা চিবুতে দাও না।'

ইল্‌বনের রাগ পড়ে যেত, আরেক গোছা ভিজে জামা ধামার উপরে সাজিয়ে, ধামার কানা তুলে ধরে, কেরোসিনের টিনের ঢাকনি দিয়ে আংটায় নতুন কাঠ-কয়লায় হাওয়া দিতে দিতে বলত, 'আমি ডাকু ভয় পাই না বলে যেন আবার তোমরা ভেবো না যে সাপের পুজোতে ভয়ের কিছু নেই। যথেষ্ট আছে।'

'কেন, ডাকুরা সাপের পুজোয় কি করে?'

'ও মা, তাও জানো না, ওরাই তো মানুষ মেরে, তাদের নাক কান থেকে তাজা রক্ত নিয়ে, পূজুরিদের দেয়। তবে তোমাদের কোনো ভয় নেই, তোমরা হলে গিয়ে উদ্‌খার, তোমাদের রক্ত অপবিত্র, তাই দিয়ে দেবতার পুজো হয় না, আমাদের জাতের মানুষের রক্ত চাই।'

দিদি বলত—'পূজুরি কি করে?'

'পূজুরি সাপের নামের মন্ত্র পড়তে থাকে আর রক্তটা গাঢ় হয়ে গিয়ে তাল বাঁধতে থাকে। যখন একবারে জমে একটা ফলের মতো দলা হয়ে যায়, তখন দলাটা ফেটে গিয়ে, তার মধ্যে থেকে এক হাত উঁচু সুন্দর একটি মেয়ে বেরিয়ে আসে।'

'তারপর?' এই বলে দিদি আর আমি চোখ ঢাকতাম, কারণ তারপরের সাংঘাতিক কথাটা আমাদের জানা ছিল। ইল্‌বন কিন্তু আমাদের এতটুকু রেহাই দিত না, তারিয়ে তারিয়ে বলত,—'তখন সাপ তার ঝোড়া থেকে বেরিয়ে এসে মেয়েটার পায়ের আঙুলের আগা থেকে চুলের ডগা পর্যন্ত সব খেয়ে ফেলে। খেয়েই তার মুখে ভাষা আসে, সে বলে—কি

Scanned by CamScanner

চাও?—তখন তার কাছে যা চাওয়া যায়, তাই পাওয়া যায়।'

আমরা ইল্‌বনের হাতে হাত বুলিয়ে বলতাম, 'তুমি কেন বড়দির চেয়ে নিয়ে, হেড্রিক্সনকে এনে তোমার কাছে রাখো না?'

'কি করে রাখব? সে আসবে কেন? সে তো আমাকে ভুলে গেছে।'

তারপর হঠাৎ আমার দিকে ফিরে কড়া গলায় ইল্‌বন বলত—'তাছাড়া সাপের বর পাওয়া অত সহজ নয়; ওঠ এবার, এক্ষুণি তোমাদের মা আসবেন তোমরা কি করছ দেখতে।'

বাস্তবিক বলতে না বলতেই ছোট্ট যতিকে কোলে নিয়ে মা দরজার কাছ থেকে বলতেন, 'ও, তোমরা সবাই এখানে, আমি ভাবি বাড়ি এত চুপ কেন? এদিকে কিন্তু খাবার সময় হয়ে গেছে।'

তক্ষুণি আমরা যে যার উঠে পড়তাম। কোনো একটা অব্যক্ত নিয়ম অনুসারে মার কাছে সাপের গল্প কেউ বলতাম না, শুনলে মা যে খুশি হবেন না সেটুকু বুঝতাম। ভয় হত হয়তো আর সাপের গল্প বলতে ইল্‌বনকে মা বারণ করবেন। মার কথা ইল্‌বন অমান্য করবে না জানতাম; সে মাকে ভালোবাসত।

সামনের বারান্দার পরই বসবার ঘর, তার পিছনে কয়েক ধাপ মাদুর মোড়া সিঁড়ি নেমে খাবার ঘর। খাবার ঘরের পিছনে জমিটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে, রান্নাঘর, কলতলা, সব্জিবাগান, চাকরদের গুদোম, তুঁতফলের গাছ পেরিয়ে, নদী পর্যন্ত। নদীর ওপারে লুম্‌পারিং পাহাড়; এঁকে বেঁকে একটা রাস্তা একেবারে তার উপরে উঠে গেছে, খানিকটা হাঁটা পথ, খানিকটা পাথরের সিঁড়ি। দুধারে একটু অবস্থাপন্ন পাহাড়িদের বাড়ি, রাতে ঘরে ঘরে মিটিমিটি তেলের বাতি জ্বলত। মাথার উপরে তারা-ভরা আকাশটাকে অদ্ভুত ঘোর বেগ্‌নি দেখাত। বাড়ির পিছনে কয়েকটা ন্যাসপাতি গাছ। ভাদ্র মাসে যখন তাদের ফল পাকত, শেয়ালের মতো বড় বড় বাদুড় বিশাল কালো ছাতার মতো ডানা মেলে, এক গাছ থেকে আরেক গাছে উঠে যেত। রাত হলে জানলার বাইরে বড় একটা চাইতে ইচ্ছা হত না।

খাবার টেবিলের মাঝখানে সাদা ডোম পরানো বড় তেলের বাতি

Scanned by CamScanner

জ্বলত, তার কোমল আলোতে গোল হয়ে বসে আমরা যে সব আটার পরটা, তরকারি, ডিমভাজা, দুধ খেতাম, তার স্বাদ এখনো মনে পড়ে।

যামিনীদা আমাদের রান্না করত; সে আমাদের দেশের লোক। দু'বছরে একবার সে বাড়ি যেত, ফিরবার সময় ঠাকুমা আমাদের জন্য আমসি, আমসত্ত্ব, ক্ষীরের ছাঁচ, নারকেল চিড়ে দিয়ে দিতেন। ঠাকুমাকে আমরা তখনো চোখে দেখি নি। যতদিনের কথা ভাবতে পারতাম, আমরা ঐ পাহাড়ের শহরে থাকি, ঠাকুমা দেশে থাকেন। বাবা জরিপের কাজ করতেন, বছরে ছ'মাস বনজঙ্গলে হাতি ঘোড়া লোকজন নিয়ে ঘুরতেন আর ছ মাস আমাদের কাছে থাকতেন, ওখানকার জরিপের আপিসে কাজ করতেন আর সব চেয়ে ক্লেশকর ব্যাপার হল যে আমাদের গতি-বিধির উপর বড় কড়া নজর রাখতেন। কিন্তু সেই ছ মাস বাবার কালো ঘোড়া কালামানিক আমাদের গুদোমের শেষের ঘরটাতে থাকত। রাতে ঘুম ভেঙে গেলে শুনতাম আস্তাবলের কাঠের মেঝেতে কালামানিক পা ঠুকছে, শুনে প্রাণটা জুড়িয়ে যেত।

বাবাকে আমরা দারুণ ভয় করতাম, কিন্তু আমাদের মুহূর্তের মধ্যে মুগ্ধ করবার মন্ত্রও তাঁর জানা ছিল। অদ্ভুত গল্প বলবার ক্ষমতা ছিল তাঁর ; সে সব গল্পের তুলনা নেই, দেশবিদেশের গল্প, নিজের বনজঙ্গলের অভিজ্ঞতার গল্প, পূর্ব-বাংলায় তাঁর ছোটবেলাকার গল্প। শুনে শুনে আমাদেরও চোখের সামনে ভেসে উঠত আম-কাঁঠালের বনে ছাওয়া, জল থৈ-থৈ-করা দীঘি পুকুরে শীতল-করা আমাদের গাঁয়ের ছবি। সেখানকার আনারস আর মিষ্টি লাল গোল আলু যে একবার খেয়েছে সে নাকি জন্মে কখনো ভুলতে পারত না। হাতি চেপে ধানক্ষেতের পাশ দিয়ে এ গাঁ থেকে ও গাঁতে অন্নপ্রাশনের নেমন্তন্ন খেতে যাওয়া, এসব যেন আমাদের নিজেদের চোখে দেখা। যদিও কখনো যাই নি সেখানে, আর যাবও না।

মাঝে মাঝে বাইরে হু-হু করে হাওয়া দিত, ন্যাসপাতি গাছ থেকে শুকনো পাতা খসে পড়ত, ঘরের কোণে তেলের বাতির আলো কমে আসত, চারদিক থম থম করত, সেদিন বাবা আমাদের দুঃখের গল্প বলতেন। কেমন করে স্বামী ছেলেকে পাত পেড়ে বসিয়ে রেখে, বাবার কাকি জল

Scanned by CamScanner

আনতে গিয়েছিলেন আর ফেরেন নি। বসে থেকে থেকে বিরক্ত হয়ে তাঁরা সবাই উঠে গিয়ে দেখেন উঠোনের ধারে পেতলের কলসি গড়াগড়ি, তার চারদিকে বড় বড় থাবার ছাপ, কাকির কোনো চিহ্ন নেই। মশাল জ্বেলে পাগলের মতো সারা রাত খুঁজে বেড়িয়ে, ভোরের আগে দূরে বনের ধারে কাকির মাথার একরাশি কালো কোঁকড়া চুল আর হাতের মোটা বালা জোড়া ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় নি। বাঘের দেশের ছেলে আমার বাবার গলাটা এসব গল্প বলতে বলতে, অন্য রকম হয়ে যেত, আমরা কাঠ হয়ে শুনতাম, গলার ভেতরটা টনটন করত।

আবার মজার গল্পও বলতেন বাবা, যামিনীদার শ্বশুর নাকি বেজায় গাঁজা খেত। একদিন সন্ধেবেলায় নেশায় বুঁদ হয়ে তক্তপোশে বসে বসে ঝিমুচ্ছে, এমন সময় তার বৌ এসে বললে—'তেঁতুলতলা থেইক্যা বাছুর আনতে অইব না?' ঝপ করে উঠে দাঁড়াল শ্বশুর, তাই তো, বড় ভুল হয়ে গেছে তো, শেষটা বকনা বাছুরটাকে না বাঘে খায়, যাই গিয়ে নিয়ে আসি। অত ডাকে কেন বাছুরটা! যেমন বলা তেমনি কাজ। এক নিমেষের মধ্যে দরজা খুলে, তেঁতুলতলায় গিয়ে, বাছুর কোলে তুলে, যামিনীদার শ্বশুর ঘরের দোরগোড়ায় হাজির। ঘর থেকে এক ফালি আলো দরজা দিয়ে বেরিয়ে বাছুরটার গায়ে পড়তেই, শ্বশুর অবাক হয়ে চেয়ে দেখে, এ কি, বাছুরের ল্যাজটা ডোরা-কাটা কেন? গাঁজার ঘোরে ভুল দেখছি নাকি? কিন্তু শুধু ল্যাজে তো নয়, সর্বাঙ্গেই যে ডোরা-কাটা! অমনি কোল থেকে জানোয়ারটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিতেই 'ঘউঁক' করে এক হাঁক দিয়ে ল্যাজ তুলে সেটা চোঁ-চা দৌড় দিল। শ্বশুর নেশার ঘোরেই দরজাটা তেমনি খোলা রেখে, আবার তেঁতুলতলায় ফিরে গিয়ে, এবার খুঁটির দড়ি খুলে সত্যিকার বাছুরটাকে ঘরে তুলল। তারপর আবার দরজায় হুড়কো টেনে তক্তাপোশে বসে ঝিমুতে লাগল। পরদিন সকালে নেশা ছুটলে পর তার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসবার যোগাড়, তবে কি বাছুর ভাইব্যা ভুল কইরা বাঘ তুলছিলাম নাকি, অ্যাঁ!!

একরকম বলতে গেলে বাঘেরই দেশ ছিল সেটা। সন্ধ্যা হলে অনেক সময় অন্ধকারের মধ্যে বাঘের কাশি শুনে যে যার দরজা জানলা দুমদাম

Scanned by CamScanner

বন্ধ করত, হাঁক দিয়ে পাড়া-পড়শীদের সাবধান করে দিত। একদিন রাত হয়েছে বেশ, যামিনীদার শ্বশুর গাঁজার আড্ডা ছেড়ে বাড়ি যাবার জন্য সবে উঠে দাঁড়িয়েছে, এমনি সময় ঝোপের আড়ালে খক্ করে বাঘের কাশি! কড়াম্ করে দরজা এঁটে সবাই জড়সড় হয়ে বসতেই, কে যেন বললে—ব্যাটাকে কেউ যদি তাড়িয়ে গাঙ পার করে দিয়ে আসতে পারে, তাকে দুইটা ট্যাহা দিবাম। আর যায় কোথায়, যামিনীদার শ্বশুর লাফিয়ে উঠল, কাঁচা কাঁচা দুটো টাকা! 'আমি দিবাম।' বলেই ঘরের কোণ থেকে পাতাসুদ্ধ একটা বেশ বড় গাছের ডাল তুলে নিয়ে, কেউ কিছু বলবার আগেই দড়াম করে দরজা খুলে, বিকট শব্দ করে বাইরে লাফিয়ে পড়ে, মাটির উপর দারুণ জোরে গাছ আছড়েছে! তাই না শুনে কালবিলম্ব না করে ল্যাজ তুলে বাঘ চোঁ-চা দৌড় দিয়েছে। কিন্তু শুধু তাড়ালেই তো হবে না, গাঙ পার করাতে হবে। যামিনীদার শ্বশুর একেক লাফ দেয়, হারে-রে-রে বলে বিকট চ্যাঁচায় আর গাছ আছড়ায় আর বাঘও আরো জোরে ছুটতে থাকে। এমনি করে সত্যি সত্যি তাকে গাঙ পার করা হল। সত্যি করে কিছু গাঙ নয়, জলাভূমি বলা চলে, মাঝে মাঝে চড়া মতো, বর্ষাকালে সবটা মিলে বিশাল নদী হয়ে যায়।

বাঘকে ওপার করে, যামিনীদার শ্বশুর টাকা পাবার আশায় মনের আনন্দে কাঁধের উপর গাছটা তুলে, গান গাইতে গাইতে আবার ফিরেছে। ঐতেই ওর কাল হল। গান শুনেই গাঙপারে বাঘ থমকে দাঁড়াল, তবে ওটা মানুষ, বিকট জানোয়ার নয়! আর বলা কওয়া নেই, গাঁক্ করে ডাক ছেড়ে ধুপ্ ধুপ্ করে লাফাতে লাফাতে বাঘ তাকে তাড়া করল। যামিনীদার শ্বশুরও একবার গাঁক শুনেই গাছ ফেলে পাঁই পাঁই ছুট! কোনোমতে গাঁয়ের প্রথম বাড়িটাতে আপ্রাণ চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে পৌঁছতেই তারা দরজা খুলে তাকে ভিতরে টেনে, দরজাতেও হুড়কো দিয়েছে, বাঘও দেখা দিয়েছে। যাই হোক, কোনোমতে শ্বশুর সেদিন প্রাণে বাঁচল, টাকাও পেল।

Scanned by CamScanner

॥ দুই ॥

পাহাড়ে দেশ, বাংলার বাইরে, সমুদ্র থেকে পাঁচ হাজার ফুট উঁচুতে তার অবস্থান। সেখানকার ফুলফল-গাছপালা সবই আলাদা। সেখানে বেগ্‌নি, নীল, সবুজ চোখ আঁকা, নকশা কাটা এক বিঘতের চেয়েও বড় প্রজাপতিরা ফুলে ফুলে উড়ে বেড়াত। বনের গাছে যে সব পাখি ডাকত, এখানে তাদের কেউ চিনবে না। বড় বড় দাঁড়কাক ঝাউগাছের ডালে বসে কর্কশ গলায় বলত আ—আ—আ—আ, কুচকুচে কালো তাদের গায়ের রঙ, এখানকার পাতিকাকের মতো নয়। রাতে বাড়ির পেছনে ছোট নদীর ওপারে সরল বনে হুতুম প্যাঁচা ডাকত, দিদির পাশে গুটিশুটি হয়ে শুয়ে শুয়ে শুনতাম। ঘুম আসতে চাইত না, লুমপারিঙের পাহাড়িদের বাড়ি থেকে শীত-লাগা কুকুরের ডাক বড় করুণ শোনাত। মন খারাপ হয়ে যেত; তাকের উপরে ঘড়ির টিক টিক শব্দ কখনো মনে হত দূরে সরে মিলিয়ে যাচ্ছে, কখনো বা কানের কাছে এত জোরে শোনাচ্ছে যে কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছে। তারপর হঠাৎ একসময় চমকে দেখি রাত কেটে গেছে, পর্দার ফাঁকে দিনের আলো, মা'র ঘরে চলাফেরার শব্দ। চুপ করে শুয়ে শুয়ে বাড়িটার জেগে ওঠা অনুভব করতাম।

ও দেশে বছর জুড়ে ছয় ঋতু ঘটা করে আসত; তাদের মধ্যে সব-চেয়ে যে মনের উপর ছাপ দিয়ে যেত, সে ছিল শীতকাল। পুজোর পর থেকেই সে জানান দিত; লোকে শীতের কাপড় চোপড় বের করে রোদে দিতে শুরু করত। শীত যত কাছে আসে সবুজ পাতায় হলুদের ছোপ

ধরে, কোনোটা লালচে, কোনোটা পাটকিলে, কোনোটা প্রায় মেটে, কোনোটা প্রায় কালো। শিরশির করে উত্তর দিক থেকে শীতের হাওয়া বইতে থাকে। আকাশে এতটুকু মেঘ নেই, উঁচু জায়গায় দাঁড়ালে বহু দূরে, দিগন্তের শেষ নীল পাহাড়ের রেখার উপরে আকাশের গায়ে আঁকা ফিকে রুপোলি হিমালয় পাহাড় দেখা যায়। যেন পরীদের দেশের ভেল্কির পাহাড়, একটুও সত্যি বলে মনে হয় না।

হাওয়া আরো জোরে বইতে থাকে, রাশি রাশি পাতা গাছ থেকে খসে নিচে জমা হয়, তারপর বাতাসে ভর করে ঘুরে ঘুরে উড়তে থাকে, যেন অদৃশ্য ডাইনিরা তাদের ঝেঁটিয়ে নিয়ে চলেছে। আমাদের মালি বিকেল-বেলায় শুকনো পাতা জড়ো করে আগুন ধরিয়ে দিত, আমরা আগুন পোয়াতাম—ঘরে এলে গা-ময় পোড়া পাতার গন্ধ লেগে থাকত। এখন পাখিরা বেশি ডাকে না, বনের মধ্যে পাখিদের অবিরাম কোলাহল থেমে যায়; আমাদের বাড়ির পিপলের ঝোপের বেড়ার মধ্যে ঝিঁ ঝিঁ পোকারাও চুপ।

আমাদের গারো চাকর অমলানন্দ বলত ঝিঁঝিঁরা মোটেই ডাকে না, ডানায় পা ঘষে ঐরকম শব্দ করে। একদিন একটা ঝিঁঝিঁ ধরে এনে দেখিয়েও ছিল, বিশ্রী কালো মস্ত পোকা, তার পিঠে কাঠি দিয়ে চাপ দিতেই ক্ষীণ একটা ঝিঁ ঝিঁ শব্দ বেরুল, দেখি সত্যি সত্যি কাঁটাওয়ালা পা দিয়ে ডানা ঘষছে। আমরা রেগে গেলাম, 'দাও এক্ষুণি ওকে ছেড়ে। নইলে মরে যাবে।'

ওরকম শীতকাল আর কোথাও দেখি নি, রাতের হিম জমে পাহাড় মাঠ ভোরবেলায় সাদা হয়ে থাকে, খালের জল জমে কত রকম আকার নেয়। সরলগাছের লম্বা ছুঁচের মতো পাতা ঝরে গাছতলা পিছল হয়ে থাকে, তার উপর চলা দায়; ন্যাসপাতি গাছের সব পাতা ঝরে, নীল আকাশে ন্যাড়া ডালপালার অপূর্ব নকশা। শীতের শেষে ডালের আগায় ছোট ছোট কেঠো কুঁড়ি দেখা যায়; যেই তাতে এতটুকু বসন্তের হাওয়া লাগে অমনি সারা গাছ ফুলে ফুলে ছেয়ে যায়। সাদা ফুলের স্তবকে সে কি বাহার, গাছে একটি পাতা নেই, শুধু ফুল। তারপর একদিন সব ফুল

Scanned by CamScanner

ঝরে গিয়ে গুটির মতো খুদে খুদে ফল ধরে, যেমনি শক্ত, তেমনি কষা বিস্বাদ। সঙ্গে সঙ্গে কেঠো কুঁড়ি সব খুলে গিয়ে, কচি গুটিগুলিকে নতুন পাতার আশ্রয় দেয়; ঐ গুটি ক্রমে বড় হতে থাকে, গাঢ় সবুজ থেকে ফিকে সবুজ, তারপর সোনালি আভা লাগে। ভাদ্র মাসের শেষে পাকা ফলটি রসে টুসটুসে হয়ে পাতার মাঝে ঝুলে থাকে। শীতের ন্যাড়া গাছে যখন ফুল ধরেছিল, উঁচু ডালপালা নাগালের বাইরে ছিল; শরতের পাকা ফলের ভারে আনত সেই ডালই প্রায় মাটি ছোঁয়। গাছ থেকে সদ্য পাড়া ন্যাসপাতির স্বাদ আজও মুখে লেগে আছে।

দিনের পর দিন যায়, কোনো দুদিন এক রকম নয়, চারদিকের গাছ-পালা ঘাস লতা রোজ চেহারা বদলায়। শীতের নদী শুকিয়ে সরু হয়ে পাথরের মধ্যে দিয়ে কুলকুল করে বয়ে চলে। সেখানকার আকাশ যে কি ঘন নীল ছিল তার তুলনা নেই। খুদে খুদে জানোয়াররা যে যেখানে পারে লুকিয়ে পড়ে, মেঠো ইঁদুররা সারা শীতকাল ঘুমিয়ে কাটায়। সাপের অভাব ছিল না অন্য সময়, শীতকালে তারাও অদৃশ্য। শুধু একদিন পাহাড়ের গায়ে ছোট ফাটলের মধ্যে একটা উজ্জ্বল সবুজ সাপকে লম্বা হয়ে পড়ে থাকতে দেখেছিলাম, স্থির নিশ্চল, বুকের একটু ধুকধুকিও নেই মনে হয়েছিল। বাবার ঘোড়ার সহিস পন্নু বলেছিল, ওটা মরে নি, শীত কাটলে জেগে উঠবে, পুরনো ছাল ফেলে দিয়ে নতুন ছাল পরবে।

সমস্ত পাহাড়টা যেন শীতের শেষের জন্য অপেক্ষা করে থাকত। আমরা ভাইবোনেরা আমাদের নিরাপদ বাড়ির টিনের ছাদের তলায় লেপ মুড়ি দিয়ে পরম নিশ্চিন্তে শীত কাটাতাম। শীতকাল আমাদের ভালো লাগত। সেই সকালে ঘুম থেকে ওঠা, পর্দার ফাঁক দিয়ে হিম জমা সাদা পৃথিবীর উপর ভোরের আলোর অদ্ভুত প্রতিফলন দেখা, লেপ থেকে বেরিয়ে জামা মোজা পরে, চিমনির ধারে গিয়ে বসা।

চিমনির দুপাশের কোল দুটি সব চেয়ে আরামের, হাত পা গা গরম হয়, মুখে তাপ লাগে না। দাদা আর কল্যাণ সেখানে বসে। চিমনির সামনে বসলে মুখের উপর সমস্ত আঁচটি লাগে, কান গরম হয়ে ওঠে, কিন্তু ও জায়গায় বড় আকর্ষণ, দিদি, আমি, সরোজ গাদাগাদি করে সেখানে

Scanned by CamScanner

বসি, সেখানে বসে চিমনির কাঁচা কয়লার আগুনে কত বিচিত্র অগ্নিময় দৃশ্য দেখি। কত দুর্গ নগর পুড়ে খাক হওয়া, কত বহ্নির ফুল ফোটা—ভাষা দিয়ে সেসব প্রকাশ করা যায় না।

ওখানকার জন্তু-জানোয়ার পোকামাকড় আমাদের বড় কাছাকাছি বাস করত। বাড়ির সামনে গন্ধ-লেবু গাছের মাঝখানে প্রকাণ্ড অটকোণা মাকড়সার জাল ঝুলত। কি যত্ন করেই যে বিকট চেহারার মাকড়সারা সেই জাল বুনত, একটুখানি ছিঁড়ে গেলেই তখুনি তাকে মেরামত করত। তারপর লেবুপাতার আড়ালে চুপ করে অপেক্ষা করে থাকত। মাছি, মৌমাছি, সুন্দরী ড্রাগনফ্লাই, ছোট ছোট প্রজাপতি, সবাই জালে পড়ত, অমনি এক ঝলকে মাকড়সারা এসে তাদের ধরত। নিমিষের মধ্যে সমস্ত রসটি শুষে খেয়ে নিত, শুকনো শরীরটা তখনো জালে আটকিয়ে বাতাসে দোল খেত। সেদিকে তাকাতে ইচ্ছে করত না। কিন্তু এক-একদিন সকালে দেখেছিলাম সেই জালে শিশিরের ফোঁটা দুলছে, তাতে সকালের রোদ পড়ে হাজার রঙ ঠিকরোচ্ছে, যেন হীরের মালাখানি।

ঝাউগাছের গোড়া মাটি দিয়ে উঁচু করে বাঁধানো ছিল, সেখানে মা শখ করে ভায়োলেট ফুলের চারা পুঁতেছিলেন। মাটি থেকে চার-ছয় ইঞ্চি বেশি উঁচু নয়, গোল গোল একগোছা পাতার মধ্যে গাঢ় বেগ্‌নি ভায়োলেট ফুটত, পাঁচটি পাপড়ি অপরূপ ভঙ্গিতে সাজানো, মাঝখানে হলুদ কেশর কোনাকুনি বসেছে, সে ফুলের গন্ধ এ জগতের নয়।

ঐ ঝাউগাছের মগডালে বোলতারা মেটে রঙের মস্ত বড় চাক বেঁধেছিল, কাউকে কাউকে হুল ফুটিয়েছিল। একদিন রাতে বাবার অনুমতি নিয়ে, বাঁশের আগায় মশাল জ্বেলে, পাহাড়িরা বোলতার চাকে আগুন ধরিয়ে দিল। জ্বলতে জ্বলতে চাকটা নিচের মাটিতে পড়ল। অন্ধকারে শত শত বোলতা ডানা ঝলসে পুড়ে মরল, বাকিরা ঝাঁকে ঝাঁকে অন্ধের মতো লড়তে লাগল। দাদা বলল, রাতে ওরা চোখে দেখতে পায় না। দেখলাম দাদার মুখটা বড় গম্ভীর। পাহাড়িরা জ্বলন্ত চাকের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে, টপাটপ করে ঝলসানো বোলতার ডিম খেতে লাগল। বোলতাদের সে কি ব্যাকুলতা, বারে বারে চাকের কাছে আসে, ওরা

Scanned by CamScanner

তাদের পাতাসুদ্ধ গাছের ডালের বাড়ি দিয়ে তাড়ায়। অনেকক্ষণ ধরে মোমে টুপটুপ চাকটা মশালের মতো জ্বলতে লাগল, ঘাসের উপর লোকেদের ছায়াগুলো দুলছিল, জানলার পর্দা সরিয়ে, কাঁচে নাক ঠেকিয়ে আমরা দেখছিলাম, কী নিষ্ঠুর, কী বীভৎস, গা বমি করছিল।

চারদিকেই ঝপাঝপ জন্তু-জানোয়াররা মরে যেত। আমাদের পোষা নীল পায়রার চোখ ঠুকরে খেয়ে চিলে মেরে ফেলল। হলদে হলদে তুলোর গুলির মতো মুরগিছানাদের বেড়ালে ধরে নিয়ে যেত। হঠাৎ বানে ছোট নদী ফুলে ফেঁপে দুই কূল ভাসিয়ে নিল। যখন জল নেমে গেল, পাথরের ফোকরে ফাটলে, এখানে ওখানে ছোট ছোট পুকুর তৈরি হল, তাতে চক্চকে খুদে খুদে মাছরা মনের আনন্দে সাঁতরে বেড়াতে লাগল। দুদিন বাদে সে জল শুকিয়ে গেল, জল না পেয়ে মাছরা মরে গেল। বিদ্যুতের ঝলকের মতো যে শরীরগুলো ছুটে বেড়াচ্ছিল, তারা নেতিয়ে পড়ে পাথরের গায়ে লেপ্‌টে রইল, পরদিন দুর্গন্ধে সেখানে টেকা যায় না। দুঃখে আমাদের বুক ফেটে যেত।

মানুষরা মরে যায় শুনেছিলাম, কিন্তু কথাটা তেমন গায়ে লাগে নি। একদিন সকালে স্কুলে গিয়ে শুনি সেদিন ক্লাস হবে না, কারণ মাদার জোসেফ স্বর্গে গেছেন। সে আবার কি, এর আগে কখনো কেউ সত্যি সত্যি স্বর্গে গেছে বলে তো শুনি নি, তবে জ্যাঠামশাইদের লেখা বইতে স্বর্গের বিষয়ে গল্প পড়েছি বটে।

স্কুলের বাগান থেকে রাশি রাশি চন্দ্রমল্লিকা ফুল কুড়িয়ে কোল বোঝাই করে নিয়ে, ছোট্ট মাদার ফিলোমিনার সঙ্গে দিদি আর আমি ও অন্য কয়েকজন মেয়ে গির্জাঘরে গেলাম। নিঃশ্বাস বন্ধ করে দেখলাম, পেতল দিয়ে বাঁধানো ঝকঝকে একটা কালো বাক্সে সাদা একটা চাদর গায়ে দিয়ে বুড়ি মাদার জোসেফ ঘুমোচ্ছেন। চারধারে সাদা ফুলের স্তূপ, মাথার কাছে আর পায়ের কাছে, লম্বা রূপোর দীপাধারে দুটি করে মোমবাতি জ্বলছে, এত বড় মোমবাতি আগে কখনো দেখি নি।

চারদিকে কিসের সুগন্ধ ভুরভুর করছে, একজন মাদার ধূপদান দোলাচ্ছেন, একজন আমাদের কপালে কাঁচের আধার থেকে জর্দান নদীর

Scanned by CamScanner

পবিত্র জলের ফোঁটা কেটে দিলেন। মাদার জোসেফের পাশে আমরা অন্যদের দেখাদেখি হাতজোড় করে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লাম। বুকটা কানায় কানায় ভরে গেল, মানুষের মরে যাওয়াটা যে এত সুন্দর হয়, তাই বা কে ভেবেছিল। চেয়ে দেখলাম অনেকের চোখেই জল, তাই দেখে আমাদেরও কান্না পেতে লাগল।

মাদার ফিলোমিনা আমাদের ক্লাসে নিয়ে গিয়ে চোখ মুছে বললেন, ঐ যাকে দেখলে, সে আসলে মাদার জোসেফ নয়, ঐ মাটির দেহটাকে খসিয়ে ফেলে মাদার জোসেফ পার্গেটরিতে গেছেন। হাজার ভালো হলেও, সব মানুষের শরীরে পাপ থাকে। সেই পাপ ঝেড়ে ফেলতে না পারলে কারো স্বর্গে যাবার জো নেই। পার্গেটরিতে পাপ ধোয়া হয়। মাদার জোসেফের আত্মায় যে সব কালো কালো পাপের দাগ পড়েছে, অনুতাপ আর উপাসনা করে পার্গেটরির পবিত্র জলে মাদার স্নান করলেই, সব দাগ মুছে যাবে। তখন দুজন উজ্জ্বল দেহের দেবদূত এসে হাত ধরে জোসেফকে স্বর্গে নিয়ে যাবে, তাঁর দেহরক্ষী গার্ডিয়ান এঞ্জেলও যাবে। যতদিন মাদার জোসেফ বেঁচে ছিলেন সে-ই তাঁকে পাপের পথ থেকে বিরত করেছে, এবার সে-ও ছুটি পাবে।

পাপের অত সহজ সমাধানের কথা শুনে আমরা যত না আশ্চর্য হয়েছিলাম, নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম তার চেয়েও বেশি। মৃত্যুর সঙ্গে এই প্রথম দেখার স্মৃতি মনের মধ্যে মধুর হয়ে জমা রইল।

তবে মৃত্যুর যে ব্যথায় ভরা অন্য দিকও আছে, অল্প দিনের মধ্যে তা-ও জানতে পারলাম। তখন ১৯১৫ সাল, শীতকাল; মা'র বড় শখের সবুজ কাঠের লিলি-ফুলের টবে হঠাৎ কেমন করে ছোট একটি কুঁড়ি ধরেছে। এই সময় কুঁড়ি ধরবার কথা নয়, এখন লিলিগাছের লম্বা লম্বা পাতাগুলি শুকিয়ে ঝরে যায়, মাটির উপর গাছের কোনো চিহ্ন থাকে না। তার মানে এই নয় যে গাছ মরে গেছে, গাছের প্রাণ মাটির তলায় গোল একটি মূলের মধ্যে ঘুমিয়ে আছে, বসন্তের সাড়া পেলেই জেগে উঠবে, মাটি ঠেলে কচি সবুজ পাতা আলো দেখবে। এখন কুঁড়ি ধরা বড় আশ্চর্যের কথা। মাকে খবর দিতে ছুটে গিয়ে দেখি, হাতে একটা হলদে

খাম নিয়ে মা একদৃষ্টে দূর পাহাড়ের দিকে চেয়ে আছেন। চোখ না ফিরিয়ে একবার শুধু বললেন, 'ওরে, তোদের জ্যাঠামশাই (উপেন্দ্রকিশোর) মারা গেছেন। মাত্র ৫২ বছর বয়সেই চলে গেলেন।'

মার মুখ দেখে আমাদের বুকের রক্ত হিম। বাহান্ন তো অনেক বয়স। মা কেন অন্ধের মতো চেয়ে আছেন? চারদিক দিয়ে মাকে আমরা ছেঁকে ধরলাম, বহুদিন আগে একবার দেখা জ্যাঠামশাইয়ের শোকে নয়, মা যদি মনে মনে অন্য কোথাও চলে যান, আমরা সইব কেমন করে? কান্না শুনে মা এ জগতে ফিরে এলেন। বললেন, 'আমার যখন কেউ ছিল না, দাদাবাবু আমাকে মানুষ করেছিলেন।' শুনে শিউরে উঠি। কেউ ছিল না আবার কি? সে যে বড় সাংঘাতিক কথা। আমরা এখানে এতগুলি ভাইবোন, মা, বাবা, লোকজন গাদাগাদি করে থাকি, তাই না এত আরাম!

'কেন, তোমার মা ছিল না? তোমার মা কোথায় গেছিল মা?'

'আমার তিন বছর বয়সে আমার মা মারা গেছলেন। তাঁর মুখখানিও মনে পড়ে না, শুধু একটু একটু মনে পড়ে একটা বন্ধ দরজা, উপর দিয়ে শিকল তোলা, আমাদের নাগালের বাইরে। আমার দিদি লাফিয়ে লাফিয়ে সেটা খুলতে চেষ্টা করছে আর আমাকে বলছে, ওরে খুব কাঁদ, ঐ ঘরে মা আছে, তুই কাঁদলে ওরা দরজা খুলে দেবে, আমি বড় হয়েছি, আমার কথা কেউ শুনবে না। দিদির তখন পাঁচ বছর বয়স, আমার তিন আর তোদের ছোট মাসি বুটির এক!'

চারদিক থমথম করতে থাকে, আমাদের হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়, মা ছাড়া যে আমাদের কিছু নেই। ছোট ছেলেমেয়েদের মা মারা গেলে তারা বাঁচে কি করে?

মার মুখে একটুখানি হাসি দেখা দিল।

'ভগবান তাদের বাঁচিয়ে রাখেন। দিদি গেল বোর্ডিং-এ, আমাকে দাদাবাবু নিয়ে গিয়ে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করলেন, নিজের ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ে দিলেন আর বুটিকে শিবনাথ শাস্ত্রী মশাই মেয়ের মতো মানুষ করলেন, কতদিন পর্যন্ত বুটি জানতেও পারে নি, তাঁরা তাঁর সত্যিকার মা

Scanned by CamScanner

বাবা নন।'

'কিন্তু তোমার বাবা কোথায় গেলেন?'

'তিনি সন্ন্যাসী হয়ে চলে গেলেন। মস্ত বড় পণ্ডিত ছিলেন, লোকে তাঁকে বিদ্যারত্ন মশাই বলে ডাকত। নিজে শ্রাদ্ধ করে সন্ন্যাসী হলেন যখন, নাম হল রামানন্দ স্বামী, কত শিষ্য ছিল তাঁর। কত জায়গায় ঘুরেছিলেন, হেঁটে হিমালয় পেরিয়ে মানস-সরোবরে গিয়েছিলেন।'

আমরা বলতাম, 'তোমার বাবা ভালো না। তোমাদের জন্য একটু কষ্ট হল না?'

মা হাসতেন, 'লোকের দুঃখ দূর করবার জন্যই তিনি খাটতেন। আসামের চা-বাগানের কুলিদের কষ্ট দেখে "কুলীকাহিনী" লিখেছিলেন, ইংরেজ সরকারের তাই তাঁর উপর রাগ! আরও কত বই লিখেছিলেন, "হিমালয় ভ্রমণ", "উদাসী সত্যশ্রবার আসাম ভ্রমণ", আমার বাবার মতো কজনা হয়?'

আমাদের কণ্ঠরোধ হয়ে আসে।

'তোমাদের মায়ের মা ছিল না? সে কেন তোমাদের নিয়ে গেল না?'

'সে বড় দুঃখের কথা রে, দিদিমার বাকি জীবনটা কেঁদে কেঁদেই কেটেছিল। কিন্তু বাবা যে ব্রাহ্ম হয়েছিলেন, লুকিয়ে মাকে কলকাতায় নিয়ে এসেছিলেন, তাই দাদামশাই আর কোনো সম্পর্ক রাখেন নি, মস্ত বড় নামকরা গৃহী সাধু ছিলেন তিনি।'

'কি নাম ছিল তাঁর? কই, আমরা তো কখনো শুনি নি।'

'তাঁর নাম ছিল অচলানন্দ, লোকে বলত কোতরঙ্গের অচলানন্দ।'

'আরো বল মা, তারপর কি হল?'

মা সে প্রশ্ন শোনেন না, বলেন, 'বাবা ব্রাহ্ম হলে, দাদামশাই মাকে কোতরঙে আটকে রেখেছিলেন, বাবার কাছে আসতে দেন নি। বাবার তখন কম বয়স, বন্ধু শিবনাথ শাস্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে কোতরঙ গেলেন। দাদামশাইদের বাড়ি বড় গোঁড়া, রান্নার খাবার বাসন চাকরে ছুঁত না, মা যেই এঁটো বাসন নিয়ে খিড়কি পুকুরে এসেছেন, বাবা গিয়ে বললেন, যাবে আমার সঙ্গে কলকাতায়? মা বললেন, এই এঁটো কাপড়ে? বাবা বললেন, তাতে কি হয়েছে? আর কথা নেই, তোদের দিদিমা গিয়ে

Scanned by CamScanner

ছ্যাকড়া গাড়িতে উঠে বসলেন, বাপের বাড়ির সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকে গেল। মা ছাব্বিশ বছর বয়সে চোখ বুজলেন, বাবা সন্ন্যাসী হয়ে চলে গেলেন, তবু দাদামশাইরা আমাদের নিতে এলেন না। ভগবান আমাদের দেখাশুনো করলেন।'

মনে হত এ আর কোনো ভগবান ; স্কুলের গির্জাঘরের ক্রুশে-বেঁধা যীশুও নন; সুন্দরী মা মেরির কোলে বসা ছোট যীশুও নন; এ ভগবান মা-মরা ছোট মেয়েদের দেখাশুনোর ভার নেন।

দাদামশাইয়ের ছবি ছিল মার কাছে, বাগছালে বসা, পাশে কমণ্ডলু, খাটো ধুতি পরা, গা খালি; এ মানুষ যে কখনো ছোট মেয়েকে কোলে নেবে, আদর করবে, এ কথা ভাবা যায় না।

'কোথায় গেলেন তোমার বাবা, আমরা তো দেখি নি?'

'আমার যখন পনেরো বছর বয়স কাশীতে বাবা মারা গেলেন, বাহান্ন বছর বয়সে। শিষ্যরা তাঁর শরীরটা গঙ্গায় ভাসিয়ে দিলেন, সন্ন্যাসীদের নাকি পোড়াতে হয় না।'

চোখের সামনে ভেসে ওঠে ফুল দিয়ে সাজানো, ধূপধুনোর গন্ধে ঘেরা, কালো সুন্দর বাক্সে শোয়া মাদার জোসেফের মুখখানি। দাদামশাই আবার অন্যরকম করে মরলেন কেন? পাহাড়ের কোলে আমাদের ছোট বাড়িটির সামনে ফুলের বাগান ছিল, পিছনে ফলের বাগান, সব্জির বাগান, দাদামশাইয়ের জন্য সেখানে আমরা এক তিল ঠাঁই রাখি নি। মা একাই তাঁর স্মৃতি বুকের মধ্যে যত্ন করে রেখে দিতেন, বলতেন, 'বাবার ওপর রাগ করিস্ না, ডাক এলে কি কারো ঘরে থাকার জো আছে?'

এসবের পশ্চাৎপটে প্রথম মহাযুদ্ধ, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কিন্তু তার কোনো ছায়া পড়ে না। খাবারদাবারের অভাব নেই, অশান্তির কোনো চিহ্ন নেই, এখানকার দেশবাসীর ক্ষোভ নেই। সুদূর ইউরোপের লোকে যুদ্ধ করছে, আমাদের তাতে কতটুকু এসে যায়, খালি স্কুলে বৎসরান্তে প্রাইজের বদলে কার্ড দেওয়া হয়, যে টাকা বাঁচে তাই দিয়ে নাকি সোল্-জারদের জন্য জিনিস কেনা হয়। সেলাই ক্লাসে কম্‌ফর্টার বুনি, বড় বড়

Scanned by CamScanner

মোজা বুনি, শুনি ফিরিঙ্গি মেয়েদের হাতে বোনা জিনিস সাহেব সোল্-জাররা পরবে আর আমাদের বোনা জিনিস দিশি রেজিমেন্টের সোল্জাররা পরবে। ওদের পশম স্কুল যোগাত, আমরা বাড়ি থেকে পশম কিনে নিয়ে যেতাম, বলা বাহুল্য ওদের পশম যত ভালোই হোক না কেন, বোনাটা তত ভালো হত না!

সেলাই ক্লাসে আরেকটি কারণেও যুদ্ধের কথা মনে পড়ত। পৃথিবীটা আসলে খুব বড় নয়, যুদ্ধ যেখানে হচ্ছিল সে জায়গা থেকে ঐ নিরাপদ পর্বতবাসী আমরা একেবারে বিচ্ছিন্ন ছিলাম না। তার প্রমাণ মিস্ লেভেঙ্গ্! শুকনো পাতার মতো পাণ্ডুর, পাতলা মিস্ লেভেঙ্গের বয়স নিশ্চয় বেশি ছিল না।

মনের সব তারুণ্য জমে পাথর, কখনো তাঁকে হাসতে দেখি নি। ফিরিঙ্গি মেয়েরা বলত, 'হাসবে আবার কি, ওর বাড়ি যে বেলজিয়ামে, ওর চোখের সামনে জার্মানরা ওর বাপ ভাইদের মেরে ফেলেছে, বোমা ফেলে ওদের বাড়ি উড়িয়ে দিয়েছে, কিছু নেই ওর, একটা ভিখারির মতো এখানে এসেছে। রোমান ক্যাথলিকরা দয়ালু কিনা, তাই এরা ওকে কাপড়-চোপড় চাকরি-বাকরি দিয়েছে।'

মিস্ লেভেঙ্গকে হাসতে দেখি নি, কিন্তু অনেকবার কাঁদতে দেখেছি, চোখের জলে গাল ভেসে যেত, নাক দিয়ে জল গড়াত, সাদা মুখ লাল হয়ে উঠত, শেষে মুখে রুমাল দিয়ে ক্লাস ছেড়ে চলে যেতেন। ফিরিঙ্গি মেয়েরা তাঁকে নিয়ে আমোদ করত, তার ভাঙা ইংরিজি কথার নকল করত, ইচ্ছা করে ভুল বুঝত, নানারকম হৃদয়হীন প্রশ্নবাণে জর্জরিত করত, তাতে কেঁদে চলে যাবার কি আছে কিছুতেই তারা ভেবে পেত না। শেষে একদিন যেমন হঠাৎ এসেছিলেন, তেমনি হঠাৎ চলেও গেলেন, কেউ বলতে পারল না কোথায় গেলেন।

রোমান ক্যাথলিকদের জীবনযাত্রার একটা বাঁধা ছিরি-ছাঁদ আছে। আমাদের কনভেন্টের নান্রা স্কুলের প্রাত্যহিক জীবনেও সেটাকে প্রবর্তিত করতেন। তার মধ্যে গুরুগম্ভীর একটা পুরনো সৌন্দর্য ছিল, জীর্ণ কিন্তু অনড় একটা গতানুগতিকতা ছিল, কল্পনার ডানা মেলবার এতটুকু

Scanned by CamScanner

অবকাশ ছিল না। রোজ সকাল সকাল স্নান করে খেয়েদেয়ে, বিস্কুটের টিনে টিফিন ভরে, এক মাইলের বেশি হেঁটে বাবার চাপরাশির সঙ্গে স্কুল যেতাম।

পাহাড়ের উপরে স্কুল, ফটক পাহাড়ের নিচে রাস্তার উপরে, এঁকে-বেঁকে পথ উঠে গেছে, সরলগাছে ঢাকা পাহাড়ের ঢালু গা বেয়ে। সেই গা কেটে খেলার মাঠ তৈরি হয়েছে, তার উপরে বালি ছড়ানো, পাহাড়ের মাথায় স্কুল-বাড়ির চারপাশে ফুলবাগানের কত বাহার।

মেমদের স্কুল, আমাদের সেখানে খুব আদর নেই। মেয়েদের মধ্যে অনেকের গায়ের রঙ আমাদের মতো কিংবা আরো বেশি কালো হলেও, তারা আমাদের 'নেটিভ' বলে ঘৃণা করত ; টিফিন খেয়ে ফেলত ; টুপি কেড়ে নিয়ে খেলার সময় টুপি পরি নি বলে বকুনি খাওয়াত, কাঁদলে টিটকিরি দিত, আমাদের ইংরিজি উচ্চারণ নকল করে ভ্যাঙাত।

দিদির আর আমার তখন ছয় সাত বছর বয়স, নেটিভ মানে জানতাম না, ভাবতাম বোধ হয় খুব নিন্দার কিছু। দেখতে দেখতে ইংরিজি শিখে ফেললাম; সব ক্লাসেই দু-তিনটি করে দিশি মেয়ে ; তারাই ফার্স্ট সেকেন্ড হয়, টিচারদের পর্যন্ত সেটা গায়ে লাগে, মেয়েদের কথা ছেড়েই দিলাম। তবে তারি মধ্যে দু-চারজনের স্নেহ-মমতার কথা ভুলবার নয়।

নান্‌দের কথা আলাদা, তাঁরা সন্ন্যাসিনী, নেটিভদের তাঁরা ঘৃণা করেন না। সত্যি কথা বলতে কি নেটিভদের জন্যেই তাঁরা দেশ ছেড়ে, সংসার ছেড়ে, চুল ছেঁটে, কুৎসিত আপাদমস্তক ঢাকা সাদা কালো পোশাক পরে, এত দূরে এসেছেন। নেটিভদের একজনকেও যদি তাঁরা আলো দেখাতে পারেন তবেই তাঁদের সব কষ্ট সব ত্যাগ সার্থক হয়।

আমরা পড়ায় ভালো হলে তাঁরা খুশি হতেন; তাঁদের জন্য ফুল নিয়ে গেলে বলতেন, 'গির্জাঘরে গিয়ে যীশুর মাকে দিয়ে এসো।' যা কিছু সুন্দর, যা কিছু ভালো, সবই যীশুর মাকে দিতে হয়। নিজেরা কুৎসিত পোশাক পরেন আর সূক্ষ্ম সূঁচের কাজ করে গির্জাঘরের বেদীর ঢাকা তৈরি করেন। গির্জাঘরে ঢুকলে মনে হয় যেন অন্য জগতে এলাম। মন আপনা থেকে ভক্তিতে ভরে যায়; উঁচু ছাদ থেকে লম্বা সোনালি শিকল

Scanned by CamScanner

দিয়ে সুগন্ধ তেলের প্রদীপ দিনরাত জ্বলে, দিনরাত নীরবে ভগবানের নাম করা হয়, ফুলের আর দীপধূপের গন্ধে ঘরের বাতাস ভারি হয়ে থাকে। অর্গ্যান বাজে, গান হয়, ল্যাটিনে মন্ত্রপাঠ হয়, হাঁটু আপনা থেকেই বেঁকে যায়। মনে মনে দিদি আর আমি যীশুর আর যীশুর কুমারী মা'র দারুণ ভক্ত হয়ে উঠলাম।

সোনালি রূপোলি পাড়দেওয়া পবিত্র ছবি দিত মেয়েরা আমাদের; ছোট্ট যীশুর মূর্তি-সুদ্ধ পেতলের ক্রুশ দিত; চকচকে নিকেলের পদক দিত, তাতে যীশুর মার সুন্দর চেহারা আঁকা। ওরা সেগুলিকে চওড়া নীল রেশমী ফিতে দিয়ে গলায় ঝোলাত, তাতে নাকি পাপের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। আমাদেরো ইচ্ছা হত এমন চিত্তাকর্ষক উপায়ে পাপের হাত থেকে রক্ষা পাই, কিন্তু সাহসে কুলোত না, আমরা যে ব্রাহ্ম; চোখে দেখা যায় না যে ভগবান, তার উপাসনা করি; মূর্তি ক্রুশ মেডেল ইত্যাদি আমাদের জন্যে নয়।

তাছাড়া আরো অসুবিধাও ছিল, দাদা আর কল্যাণ সরকারি স্কুলে যেত, তাদের মনে যীশুপ্রেম আদৌ গজায় নি; টিটকিরির ভয়ে ক্রুশ মেডেল ছবি খালি সাবানের বাক্সে লুকিয়ে রাখতাম, একটু মিহি সুগন্ধ বাক্সের গা থেকে পবিত্র ছবিতে লেগে যেত, ভারি ভালো লাগত।

ক্লাসের মেয়েরা বলত, 'তোমরা রোমান ক্যাথলিক নও, ম'লে তোমাদের মুশকিল আছে; রোমান ক্যাথলিক ছাড়া আর কেউ স্বর্গে কেন পার্গেটরিতেও যেতে পায় না। তবে হ্যাঁ, যদি নিজের মনের পাপ স্বীকার করে আমাদের কিছু উপহার দাও, চুলবাঁধার রেশমী ফিতে, বেশ চওড়া হলেই ভালো, কিংবা ফুলকাটা রুমাল, কি একটা পুতুল, নিদেন কিছু চকলেট লজেঞ্চুস, তাহলে তোমাদের পাপের ভার কিছুটা কমবে। বাইবেলে এইরকম লেখা আছে।'

একটু সংশয় হত, কিন্তু মাকে বলতেই তাঁর মুখে একটু হাসি দেখতাম; মা যখন মজা পাচ্ছেন তখন আর কোনো ভয় নেই জানতাম। না হয় হেল্‌এই যাব সবাই মিলে। আজ অবধি তবু যীশু আর তাঁর দুঃখিনী মার জন্য বুকের মধ্যে একটা উষ্ম কোমল জায়গা করা আছে।

Scanned by CamScanner

ঐ ব্রাহ্ম হওয়া সম্বন্ধে তখন থেকেই সচেতন ছিলাম; পুজোর সময় আমরা নতুন জামা পরে হরিসভায় ঠাকুর দেখতে যাই না; কাঞ্জিলাল-বাবুদের রান্নাঘরে আমরা ঢুকি না, তাহলে ওঁদের খাবার নাকি নষ্ট হয়ে যাবে, খেলেই জাত যাবে। ব্রাহ্ম হওয়া কি চাট্টিখানিক কথা! তবু মনে মনে ইচ্ছে হত সবার সঙ্গে হরিসভায় যাই, কাঞ্জিলালবাবুদের রান্নাঘরে গিয়ে বসি ; কারো কাছ থেকে আলাদা হতে ইচ্ছা করত না, মনে হত কি একটি মহোৎসব থেকে বাদ পড়ে যাচ্ছি। আমরা ঘরে গেলেই কারো খাওয়া নষ্ট হয়ে যাবে ভাবলে কষ্ট হত।

অবিশ্যি ক্ষতিপূরণও একটু ছিল। শীতকালে লম্বা ছুটি, তখন মাঘোৎ-সব হত। একদিন বালকবালিকা সম্মেলন হত। অমলবাবু বলে একজন দাড়িওয়ালা ভদ্রলোক প্রত্যেক বছর আমাদের একই গল্প বলতেন, আমরা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতাম, কতকটা এই আশায় যে এবার হয়তো একটু অদল-বদল হবে।

গল্পটা আসলে খুব দুঃখের ; তাতে একজন লক্ষ্মী মেয়ে অনেক কষ্ট পেয়ে, শেষটা ডাকাতদের হাতে মরে গেল ; তারপর কিন্তু একজন ভালো সন্ন্যাসী তাকে আবার জ্যান্ত করে দিলেন এবং বইয়ের 'ভিলেন' একজন দুষ্টু ছেলে রোগে ভুগে মরে গেল, তাকে কেউ বাঁচাল না এবং আমরাও নিশ্চিন্ত হলাম।

উৎসব উপলক্ষে একদিন ঝরনার ধারে চড়িভাতি হত, তার একটু-খানি পুলক এখনো শরীরে লেগে আছে। পরীতলার ঠাণ্ডা কনকনে জলে বড়রা অনেকে স্নান করতেন, গান হত, উপাসনা হত, কত রকমের দৌড়-ঝাঁপ খেলা হত, বড় বড় হাঁড়ায় খিচুড়ি লাবড়া বাঁধাকপির ঘণ্ট রান্না হত। ঢালু জমির শুকনো ঘাসের উপর বসে কলাপাতায় খাওয়া হত। মাথার উপরে গাঢ় নীল আকাশ রোদে ভরে থাকত, সিরসিরে উত্তুরে হাওয়া দিত, ঢালু জমিতে আমাদের কলাপাতা থেকে গড়িয়ে পাতলা দই ঘাসের উপরে জমা হত। পরিবারের প্রত্যেকটি মানুষ যেত, সবাই সবাইকে চিনত, তাদের মধ্যে সবাই ব্রাহ্ম ছিলেন না। ঐ দিনটির জন্য মন কেমন করে।

Scanned by CamScanner

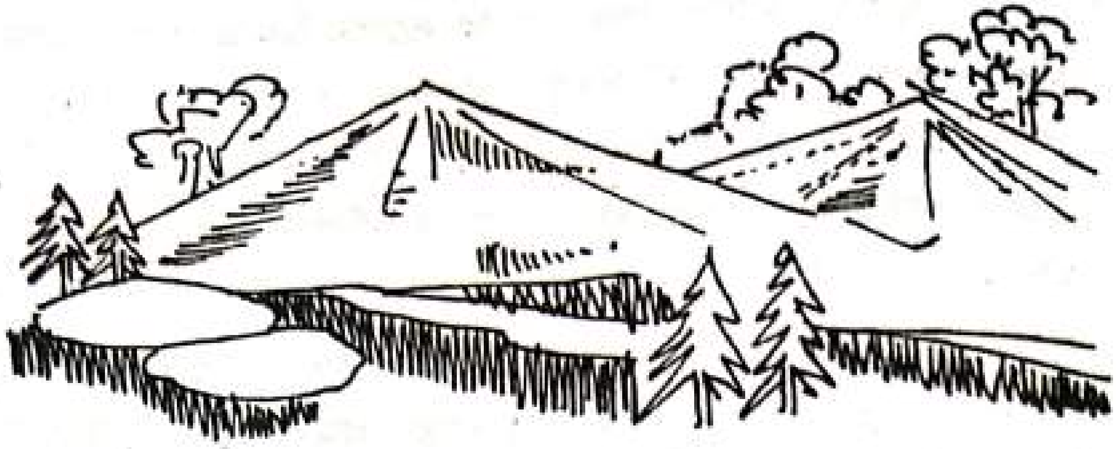

॥ তিন ॥

যত ছোটবেলার কথাই মনে করি না কেন, ঐ পাহাড়ে শহরটি ছাড়া আর অস্পষ্ট একটু কলকাতার কথা ছাড়া অন্য কোনো জায়গার কথা মনে হত না। ওখানকার সরলগাছের লম্বা পাতার মধ্যে দিয়ে বাতাস বয়ে যাবার অবিরাম শোঁ-শোঁ শব্দ শুনে কান অভ্যস্ত ছিল, পাহাড়ের গা বেয়ে উঁচুনিচু পথে হেঁটে পা অভ্যস্ত ছিল; ওখানকার পীচ্ প্লাম ন্যাস-পাতি কমলালেবু ছিল সব চাইতে চেনা ফল, আম জাম কাঁঠাল ছিল শোনা কথা, দেশের গল্পের, মা'র মুখের কলকাতার গল্পের সঙ্গে জড়ানো। বুঝতাম দিনরাত মা'র কলকাতার জন্য মন কেমন করে; সেইখানে তার ছোটবেলাকার অনেক স্মৃতি জমা হয়ে আছে। আমরাও একবার কল-কাতায় গিয়েছিলাম, আমার বয়স তখন পাঁচ বছর। বাইশ নম্বর সুকিয়া স্ট্রীটে আমার জ্যাঠামশাই উপেন্দ্রকিশোরের বাড়িতে কিছুদিন ছিলাম, সে ক'টি মাসের কথা স্বপ্নের মতো মনে পড়ত।

তার চেয়ে অনেক বেশি সত্যি ছিল নীল টিনের ছাদ দেওয়া আমাদের সেই লম্বা বাড়িটি, অনেক দূর বেড়িয়ে ক্লান্ত পায়ে ঘরে ফেরার সময় অন্ধকারের মধ্যে যে আমাদের এক সারি আলোকিত জানলার অভ্যর্থনা জানাত। তবু মনে হত এই সুখের জায়গায় আমাদের আসল বাড়ি নয়, বহু কথিত কলকাতাতেও নয়। ব্রহ্মপুত্রের ধারে আম জাম কাঁঠাল গাছে ছায়া করা মসূয়াতে আমাদের আসল বাসস্থান। এখান থেকে চলে গেলে এমনটি আর কখনো দেখব না একথা জানতাম। চড়িভাতি করতে গিয়ে দেখতাম বিশাল বিশাল ফার্ণগাছ পাহাড়ে নদীর উপর দুই তীর থেকে

Scanned by CamScanner

ঝুঁকে পড়েছে; মাঝখানের ছায়ায় ঢাকা সুড়ঙ্গপথ দিয়ে ছলছল করে নুড়ি পাথরের উপর দিয়ে জল বয়ে যাচ্ছে, এ শব্দ আর কোথাও শুনব না জানতাম।

বুঝতাম এ জায়গা আমাদের নিজেদের দেশের মতো নয়। এখানে শীতের শেষে শুকনো হাওয়া যেই বসন্তের আগমনের জানান দিত, অমনি চারদিকে একটা শিরশির সরসর সাড়া পড়ে যেত। খড়খড় শব্দ তুলে শুকনো পাতা উড়ে যেত, গাছের ডাল দুলে উঠত, দমকা হাওয়ায় কে যেন মাটি অবধি ঝোলা ঘাগরাটি তুলে ধরে দৌড় দিত। পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে দুরন্ত বাতাস গোঁ গোঁ করত, যেন কোনো বন্দী দৈত্য বাঁধন ছেঁড়ার চেষ্টা করছে। সে শব্দ আর শুনি নি।

চৈত্রমাসে সরলগাছের তেলে-ভরা শুকনো ডালে ডালে ঘষা লেগে দাবানল জ্বলে উঠত; মাইলের পর মাইল জ্বলে পুড়ে খাক্ হত; অনেক দিন ধরে গাছের ঝলসানো চেহারা সে কথা কাউকে ভুলতে দিত না। সরকারের বন-বিভাগ এ বিষয়ে অনেক যত্ন নিতেন। যেদিকে চোখ ফেরানো যেত, দেখতাম রিজার্ভড্ ফরেস্টের এলাকায় পাহাড়ের তলা থেকে উঁচু চুড়ো অবধি অনেকখানি জায়গা জুড়ে গাছ কেটে ফেলে ন্যাড়া ঘাসজমি করে রাখা হয়েছে। যাতে একদিকে আগুন লাগলে ঘাসজমি ডিঙিয়ে আগুন বেশি দূর ছড়াতে না পারে, লোকের বাড়ি-ঘরের ক্ষতি না করে।

মাঝে মাঝে রাতে শুনতাম পাহাড়ের উপরে কারা ডাকছে কু—উ—ই—ই—ই। বুক ঢিপ ঢিপ করত। ঐ ডাকের মানে জঙ্গলে আগুন লেগেছে; গাঁয়ের বড় বেশি কাছে আসার আগে সবাই মিলে আগুন নেবাবার চেষ্টা চলছে। দমকল নেই; ঝরনার জল থাকলেও পাম্প নেই; তাই জলের উপর কেউ নির্ভর করত না, গাছ থেকে কাঁচা সবুজ পাতা-সুদ্ধ ডাল ভেঙে নিয়ে তাই দিয়ে পিটিয়ে আগুন নেবাতে চেষ্টা করত। মাঝে মাঝে খানিকটা শুকনো ছাই, অস্বাভাবিক একটু মিটমিটে লালচে আলো আমাদের নিরাপদ বাড়ির দাওয়ায় এসে পড়ত। চেয়ে দেখতাম পাহাড়ের মাথায় অনেকখানি আকাশ লাল হয়ে রয়েছে, গাছের মাথার উপরে আগুনের শিখা দেখা যাচ্ছে। তবু মনে হত এ দাবানলের সঙ্গে

Scanned by CamScanner

আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই।

আসলে বাইরে থেকে ভারি নিরাপদ মনে হত শহরটাকে, তবু মাঝে মাঝে নানান গুজব রটত। একবার শুনলাম কোন চা-বাগানের মেম-সাহেব তার মুর্গির ঘরে বাঘের বাচ্চা ধরে কলকাতার চিড়িয়াখানায় চালান দিয়েছে। তার দুদিন পরেই শোনা গেল বাচ্চার খোঁজে বাঘিনী এসে শহরময় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। কেউ বাঘিনীকে চোখে দেখেছে বলে শোনা যায় নি, কিন্তু সন্ধ্যার আগেই কিছুদিন ধরে সবাই বাড়ি ফিরতে চাইত; কেউ বেরুলে বাড়ির লোক ব্যস্ত হয়ে পড়ত। কিছুদিন বাদে শশীবাবুর দোকান থেকে ফিরে যামিনীদা বলল, আর ভয় নেই, সেই মুর্গির ঘরেই বাঘিনীও ধরা পড়েছে এবং তাকেও কলকাতার চিড়িয়াখানায় চালান দেওয়া গেছে। শুনে কি যে আরাম বোধ হল। আহা বেচারি এতদিন পরে আবার ছানাদের ফিরে পেয়েছে!

এর পরেই একটা রবিবার সকালে কাঞ্জিলালবাবুর নাতি সতু এসে খবর দিল, 'নরেস্ক' বাড়িটাতে বাংলার বাঘ এসেছে!

বাঘের দেশের ছেলেমেয়ে আমরা, এ কথা শুনে আমাদের উৎসাহ দেখে কে, সতুর সঙ্গে চার-পাঁচজন তখুনি বেরিয়ে পড়লাম। পথে যে কোনো দুশ্চিন্তার কারণ নেই, তাও নয়। সামনেই ফিরিঙ্গি ছেলেমেয়েদের সরকারি বোর্ডিং স্কুল, তারা বড় বড় ছাইরঙের হাঁস পোষে। হাঁসগুলোর সঙ্গে আমাদের মোটে বনে না; আমরাও দূর থেকে কুটো ছুঁড়ে ওদের ভয় দেখাই আর ওরাও আমাদের দুচক্ষে দেখতে পারে না। শুধু আমাদের কেন, বেঁটে কাউকে দেখলেই গলা বাগিয়ে ফোঁস ফোঁস করতে করতে তেড়ে আসে, আমরা পালিয়ে যেতে পথ পাই না। ভোঁতা ঠোঁটের ঠোকর বড় সাংঘাতিক ব্যাপার।

বাঘ দেখার উৎসাহে হাঁসের সম্বন্ধে স্বাভাবিক সতর্কতা অবলম্বন না করেই বেরিয়ে পড়লাম। ফলে প্রায় আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই গোটা দুত্তিন হাঁসও 'নরেস্কে'র ফটকের কাছে উপস্থিত হল। গেটের আড়াল থেকে সতু আঙুল দেখিয়ে বলল, 'ঐ—ঐ যে বাংলার বাঘ, দাদু বলেছেন।'

চেয়ে দেখি রোদে জলচৌকি পেতে খালি গায়ে বসে একজন ঝুলো

গোঁফ মোটা ভদ্রলোক ; একজন চাকর তাঁর পিঠে তেল মাখাচ্ছে। ঐ নাকি বাংলার বাঘ! হতাশ হয়ে বাড়ির দিকে ফিরলাম; হাঁসগুলো শুধু আমাদের তাড়াই করল না, পায়ের গোড়ালিতে সবাইকে ঠুকরেও দিল। কিন্তু আমাদের মন খারাপ, তাই কিছু বললাম না। মা অবিশ্যি বাংলার বাঘের কথা শুনে একেবারে লাফিয়ে উঠলেন, তখুনি ফর্সা কাপড় পরে তাঁর পায়ের ধুলো নিতে চললেন। বললেন, 'ওঁর নাম আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ওঁর মুখ দেখতে পাওয়াও সৌভাগ্য।' এই আমাদের প্রথম বাঘ দেখা।

পশ্চিমে যেমন 'নরেস্ক', পুবে সিসল বেড়ার ওপারে কাউই সাহেবের বাড়ি। তার চারদিকে এত বড় বড় গাছ ছিল যে বাড়ির কিছুই দেখা যেত না, শুধু এক-এক দিন সন্ধে থেকে গাছের ফাঁক দিয়ে অনেক আলো দেখা যেত, বাগানের গাছে চীনেলণ্ঠন ঝুলত আর বাজনা শোনা যেত। অনেক রাত অবধি সেখানে পার্টি চলত, নাচ-গান খাওয়া-দাওয়া। পরদিন ওদের চাকররা রাশি রাশি রঙিন কাগজের মালা, জ্বলে যাওয়া চীনেলণ্ঠন আর ছোট ছোট শখের খেলনা বের করে ফেলে দিত।

কাউই সাহেবের পেয়ারের চাকরের সঙ্গে আমাদের ইল্‌বনের ভারি ভাব। আমরা ইল্‌বনের সঙ্গে বেড়াতে গেলেই একটু পরে সেও এসে জুটত। ইল্‌বন তাকে রুনার বলে ডাকত, রুনার মানে দুষ্টু। রুনার আমাদের ওবাড়ি থেকে রঙিন কাগজের টুকরো, ছেঁড়া মালা, সোনালি ফুল, এইসব দিত আর ওদের সম্বন্ধে কত যে রোমাঞ্চময় গল্প বলত তার ঠিক নেই। নাকি সাহেবের বাড়িতে নিত্য ভোজ, শহরের সব বড় সাহেব-মেমেরা আসে কিন্তু কাউই সাহেবের নিজের মেম আসে না। সে নাকি বদ্ধ পাগল, তাকে ঘরে বন্ধ করে রাখতে হয়, তার নার্স আছে, আয়া আছে। বাইরের কেউ তাকে দেখতে পায় না। অনেকে জানেও না যে কাউই সাহেবের মেম আছে। সাহেব ইংরেজ সরকারের বড় অফিসার।

মাঝে মাঝে দুপুর রাতে ওবাড়ি থেকে করুণ কান্না শোনা যেত, সকলের মন খারাপ লাগত। হঠাৎ একদিন সিসল গাছের বেড়া ডিঙিয়ে, সাদা লেস বসানো লম্বা রাতকামিজ পরা পরমাসুন্দরী মেম একমাথা কোঁকড়া সোনালি চুল নিয়ে এসে মাকে দেখে হাতছানি দিয়ে ডাকতে

Scanned by CamScanner

লাগল। সঙ্গে সঙ্গে ধর ধর করে নার্স, আয়া, বাবুর্চি, বেয়ারা ছুটে এসে তাকে নিয়ে গেল। তারপর মা অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন।

কাউই সাহেবের বড় বেড়ালের শখ, বাড়িতে একপাল হলুদসাদা ডোরাকাটা বিলিতি বেড়াল পোষেন। সেগুলো দেখতে ভারি সুন্দর কিন্তু নিষ্কর্মার একশেষ, নাকি ইঁদুরটিও ধরতে পারে না, টিনের মাছ খায়, গাছেটাছেও চড়ে না! তবে একদিন নদীপারের ছাইরঙের হুলো ওদের এমনি তাড়া করেছিল যে যেদিকে পারে ছট্‌কে পালাল, একটা গিয়ে সরলগাছে চড়ল। হুলোকে তাড়ানো হল, কিন্তু সাহেবের বেড়াল আর গাছ থেকে নামতে পারে না! শেষ পর্যন্ত ইল্‌বন গিয়ে রুনারকে ডেকে আনল, মই লাগিয়ে বেড়াল পাড়া হল!

সাহেবের বড়মানুষির শেষ ছিল না। একবার তার কেরানিবাবুর উপর খুশি হয়ে তাকে একটা বেড়ালছানা উপহার দিল। বলল— 'বাবু, ও কিন্তু ভালো মাছ ছাড়া কিছু খায় না।' কেরানিবাবু হাত জোড় করে বলল—'সাহেব, আমার ছটি ছেলে তারাই মাছ পায় না, বেড়ালকে খাওয়াব কি?' সাহেব বললে—'সে ব্যবস্থা আমার।' পরদিন কেরানি-বাবুর বাড়িতে বেড়ালছানাসহ বারো টিন বিলিতি সার্ডিন মাছ গিয়ে পৌঁছল। বেয়ারা বলল—'সাহেব বলেছে, সাবধান, মাছ যেন বেড়ালের বদলে তোমার ছেলেদের পেটে না যায়।'

কেরানিবাবু হাত জোড় করে মাপ চেয়ে বেড়াল ও মাছ দুই-ই ফেরত দিল।

লোকের মুখে মুখে এসব গল্প ফিরত। বড়লোকের কাণ্ডকারখানা শুনতে বড়ই ভালো লাগত। চারদিকে দেখতাম বেজায় গরীব এরা, পুরুষরা ছিল কুঁড়ে আর মেয়েরা অবিরাম খাটত। স্কুল থেকে আসা যাওয়ার পথে দেখতাম, পাথর কেটে নতুন রাস্তা তৈরি হচ্ছে, হাতুড়ি বাটালি দিয়ে মেয়েরা পাথর ভাঙছে। তারা বুজি পেত চার আনা করে, পুরুষরা ছ'আনা। চটা ওঠা কলাই-করা বাটি ভরে মোটা লাল চালের ভাত আর তারি এক কোণে একটুখানি রগরগে ঝাল নুনে পোড়া শুঁটকি মাছের চচ্চড়ি নিয়ে আসত ওরা। পিঠে ছোট ছেলে বাঁধা থাকত, কাঁধ

Scanned by CamScanner

থেকে বটুয়া ঝুলত, তাতে চুন, পান আর কাঁচা সুপুরি থাকত। গাছের ডালে গায়ের চাদর দিয়ে দোলনা বেঁধে ছেলেকে শুইয়ে, ন্যাকড়া দিয়ে বাঁধা ভাতের পাত্রটিও ঝুলিয়ে, সারাদিন ওরা পাথর ভাঙত। দুপুরে এক সময় ছোট নদীতে হাত-পা ধুয়ে ভাতটুকু খেয়ে আবার কাজে লাগত। বড় কষ্টে দিন কাটত ওদের তবু এক পয়সা ভিক্ষা নিত না, পুরনো কাপড় নিত না। মিশনারিদের কাছ থেকে যারা দয়া পেত, তাদের সঙ্গে এরা মিশত না।

মিশনারিরা গরীব মানুষদের কাউকে কাউকে ভালো খাওয়া-পরা, লেখাপড়া শেখানো, চাকরি দেবার লোভ দেখিয়ে খ্রিস্টান করে নিচ্ছে বলে শোনা যেত। এই খ্রিস্টান মেয়েরা সাদা ধবধবে মিহি সুতির পোশাক পরত। গাঁয়ের মেয়েরা সাদা কাপড় ছুঁত না, বলত—'ওসব উদখারের কাপড়, আমাদের পরতে নেই।' ওদের মধ্যে যাদের অবস্থা ভালো ছিল, তারা কোথাও যেতে হলে মুগার কাপড় পরত আর গলায় ঝোলাত প্রকাণ্ড বড় সোনা আর পলার দানার মালা। কানে কাঁচা সোনার ফুল গুঁজত, সেগুলির গড়নটিও বিশেষ রকমের।

আলাদা থাকতেই চাইত ওরা, ঝগড়া করত না, প্রাণপণ খেটে ন্যায্য মাইনেটুকু নিত, দয়া দাক্ষিণ্য ওদের কাছে অসহ্য ছিল। আমরা ওদের সব আদরটুকু সেবাটুকু পেতাম কিন্তু এতটুকু কারণে মতভেদ হলেই এক কথায় দশ বছরের চাকরি ছেড়ে চলে যেত, ফিরেও তাকাত না। মনে হত আমাদের উপর এতটুকু টান নেই ওদের। ওদের সঙ্গে মনের যোগ হওয়া বড় শক্ত ছিল।

মনের যোগ আমাদের ছিল না-দেখা দেশের সঙ্গে, বাবার গল্পে গল্পে যে দেশ আমাদের হৃদয়ের বড় কাছে ছিল। আর ছিল কলকাতার সঙ্গে, সেখানে আমাদের জ্যাঠামশাইরা, পিসিমারা, মাসিরা থাকতেন। মাঝে মাঝে আমাদের জন্য নানারকম মনোহর উপহার নিয়ে যাঁরা বেড়াতে আসতেন, মাসখানেক থেকে যেতেন। সবচাইতে আদরের পাঠ্য ছিল জ্যাঠামশাইয়ের কাগজ 'সন্দেশ', মাসের গোড়ায় কখন 'সন্দেশ' আসবে বলে পিওনের পথ চেয়ে থাকতাম। প্রত্যেকটি গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ,

Scanned by CamScanner

ধাঁধা ও বিজ্ঞাপন পড়তাম, পড়ে পড়ে মুখস্থ করে ফেলতাম। বাকসের সিরাপের, জবাকুসুম তেলের বিজ্ঞাপনের ছবিগুলি আজও স্পষ্ট মনে পড়ে।

স্কুলে বাংলা পড়ানো হত না ; অজস্র ইংরিজি বই পড়তাম, বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে চেয়ে এনে হ্যান্স অ্যান্ডারসনের, গ্রিমদের যত পরীদের গল্প, অ্যালিস্-ইন-ওয়ান্ডারল্যান্ড, ওয়াটার বেবিজ, পড়ে পড়ে মলাট আলাদা করে ফেলতাম। বাংলা পড়া হত বাড়িতে, জ্যাঠামশাইদের লেখা, যোগীন্দ্রনাথ সরকারের লেখা, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের লেখা সেসব বই মনের উপর এমন গভীর ছাপ এঁকে দিয়েছে, আজও তা বুঝতে পারি। উপেন্দ্রকিশোরের টুনটুনির বই, ছেলেদের মহাভারত, ছোটদের রামায়ণ আর বড় মধুর ছড়ায় লেখা ছোট্ট রামায়ণ ; কুলদারঞ্জনের রবিন হুড, ওডিসিয়ুস, ইলিয়াডের গল্প। প্রিয়ম্বদা দেবী 'পার্বণী' বলে একটি ছোটদের পূজা বার্ষিক সম্পাদনা করলেন। সেই আমার পূজা বার্ষিকের সঙ্গে প্রথম পরিচয় ; এত ভালো পূজা বার্ষিক আর কখনো বেরিয়েছে কিনা সন্দেহ।

ছোট্ট রামায়ণ পড়েই বোধ করি বাংলা ভাষার মিষ্টি সুর সম্পর্কে কান সচেতন হয়ে উঠেছিল। দিনরাত আমরা পরস্পরের কানে কানে বলতাম—

"সরযূ নদীর তীরে অযোধ্যা নগর।
দেবতার পুরী হেন পরম সুন্দর।
সোনা মণি মুকুতায় করে ঝলমল,
ছায়া লয়ে খেলে তার সরযূর জল।"

বই-এর গোড়াটিই বা কি মধুর।

"বাল্মীকির তপোবন তমসার তীরে,
ছায়া তার মধুময়, বায়ু বহে ধীরে,
সুখে পাখি গায় গান, ফোটে কত ফুল,
কিবা জল নিরমল, চলে কুল কুল।"

দেখতে দেখতে চোখের সামনের এই শ্যামল পাহাড় ঘেরা ঝরনার

Scanned by CamScanner

জলের কলধ্বনিতে ভরা, প্রজাপতি আর ফুলে ফুলে রঙিন দেশটার পিছনে আরেকটি আরো বিস্ময়কর রোমাঞ্চময় দেশ আত্মপ্রকাশ করতে লাগল। "ঠাকুরমার ঝুলি" প্রথম পড়ার সেই রুদ্ধশ্বাস রোমাঞ্চ কে ভুলতে পারে। বনের মধ্যে নির্জন গাছতলা থেকে চোখের জলে ভাসা অপরূপ সুন্দরীকে ঘোড়ার পিঠে তুলে এনে, রাজা তাঁর রানী করলেন, দেখে সবার চোখ জুড়ুল। তারপর থেকেই রোজ রাতে হাতিশালা থেকে হাতি যায়, ঘোড়াশালা থেকে ঘোড়া যায়, মানুষ উধাও হয়! কেউ ধরতে পারে না। তারপর একদিন এক গরীব ছেলে উঁচু গাছে লুকিয়ে থেকে দেখে কিনা রানীর মহল থেকে বেরিয়ে আসছে জিব লক্‌লক্ এ কোন্ বিকট মূর্তি!! জিব লক্‌লকের চেহারাটিও আমার মনে আঁকা হয়ে আছে। সব কটি রসের এমন অপূর্ব সমাবেশের কথা কে ভাবতে পেরেছিল!

'সন্দেশে' বাবার লেখা বেরুত। বাবার মুখে শোনা গল্পগুলি 'বনের খবর' নাম নিয়ে 'সন্দেশে'র পাতায় দেখা দিচ্ছে, এর রোমাঞ্চও ভুলবার নয়। 'সন্দেশে'র পাতায় বড়দার সঙ্গে চেনা হল, সুকুমার রায়ের অদ্ভুত কবিতা যে মাসে বেরুত না, আমরা হতাশ হতাম। পাঁচ বছর বয়সে যখন কলকাতায় গিয়েছিলাম, বড়দা তখন বিলেতে, তাকে দেখা হয় নি। ১৯১৩ সালে 'সন্দেশ' প্রথম বেরুল যেদিন, জ্যাঠামশাই এক কপি হাতে করে বাইশ নম্বর সুকিয়া স্ট্রীটের বাড়ির দোতলায় উঠে এলেন, অমনি পরিবারের মধ্যে একটা আনন্দ কোলাহল পড়ে গেল, সে কথা আমার বেশ মনে আছে। রবীন্দ্রনাথের গুণ চিনতে আমাদের অনেক সময় লেগেছিল, কিন্তু 'সন্দেশে' যাঁদের লেখা বেরুত তাঁদের চিনতে শিখতে হত না। একবার পড়ামাত্র মন জুড়ে বসতেন তাঁরা এ কথা স্বীকার না করে পারলাম না।

Scanned by CamScanner

॥ চার ॥

অনেকদিন আগের কথার কোন্‌টা সত্যি মনে আছে আর কোন্‌টা শুনে শুনে স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে গেছে আলাদা করে ভাবতে পারি না। পাঁচ বছর বয়সে সেই যে কলকাতায় যাওয়া, জ্যাঠামশাইয়ের বাড়িতে ২২নং সুকিয়া স্ট্রীটে থাকা, সেখানকার একতলার ছাপাখানার ঘুমপাড়ানি শব্দ, কালির আর রঙের গন্ধ, এখানে ওখানে পড়ে থাকা চক্‌চকে কাগজে নানান রঙে ছাপা একই ছবি কুড়োনো, সন্ধেবেলায় জ্যাঠামশাইয়ের বেহালা বাজানো শোনা, ছায়া ছায়া সব মনে পড়ে। উপেন্দ্রকিশোর আমার বাবার চাইতে অনেক বড়, বাবার কাঁধে হাত রেখে আমাকে একদিন বললেন, 'জানো, আমি তোমাদের বাবার দাদা, ইচ্ছে করলে তাকে মারতে পারি, সে কিছু বলতে পারবে না।' শুনে আমাদের চক্ষু চড়কগাছ, বাবাকে পেটাবে, বলে কি! আমার ভাই কল্যাণ একবার জ্যাঠামশাইয়ের দাড়ি-শোভিত গোলগাল ফর্সা মুখ, দোহারা গড়নের দিকে তাকিয়ে একবার বাবার হকি-ক্রিকেট খেলা ঘোড়ায় চাপা পেটানো মজবুত শরীরের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল। বাবা হা হা করে হেসে উঠলেন, বাবার সেই হা-হা হাসি এখনো যেন শুনতে পাই।

২২নং সুকিয়া স্ট্রীটের বাড়িটা একটু অদ্ভুত ছিল, সবসময় যেন নড়ত-চড়ত-দুলত, সারাদিন ছবির প্রুফ, লেখার প্রুফ, হাতে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ছাপাখানার লোকরা ওঠানামা করত, দুই জ্যাঠামশাই উপেন্দ্রকিশোর আর কুলদারঞ্জন কলম হাতে লম্বা লম্বা ছাপা কাগজে মুখ গুঁজে বসে পড়তেন,

কিংবা নিজেলে ছবির সামনে দাঁড়িয়ে থাকতেন, তাঁদের কাছে কত লোক-জন আসত তার ঠিক নেই। সাধারণ লোকের মতো ছিলেন না তাঁরা। সেই প্রথম আমার বড়দি, সুখলতা রাওকে দেখেছিলাম, কাঁচি দিয়ে কাগজ কেটে ছবি বানিয়ে দিয়েছিলেন, বাক্স ভরে চকোলেট বিস্কুট দিয়েছিলেন। আমার পিসেমশাই এইচ্ বোসকেও দেখেছিলাম, হাসিমুখে সৌম্যদর্শন মানুষ, রাশি রাশি কুন্তলীন দেলখোস উপহার দিতেন আমাদের, আমার জন্মদিনে নিজের বাড়িতে ফিল্ম দেখাবার ব্যবস্থা করেছিলেন, চার্লি চ্যাপলিনের ফিল্ম, তখনো সবাক্-চিত্রের যুগ শুরু হয় নি। সিনেমাকে সবাই বায়োস্কোপ বলত, কিন্তু এখনকার ফিল্মের চেয়ে কিছু কম উপভোগ করত না। এ সবই সেই পাহাড়ে শহরে বসে মনে পড়ত আর কানে আসত পাহাড়ের নিজস্ব শব্দগুলি, গাছের পাতার নিরন্তর সোঁ-সোঁ ঝরনার জল পড়ার ঝর-ঝর বনের মধ্যে কু-কু পাখির ডাক। পাহাড়ের পরিষ্কার বাতাসে অনেক দূর থেকে শব্দ ভেসে আসত। শুনতে পেতাম লুমপারিঙের পাহাড়ি ছেলেরা ডাংগুলি খেলছে, ডাণ্ডা দিয়ে মাটি মাপছে—এলোয়া বেউড়ি তেলোয়া চউড়ি পঞ্চে জেদ সুদে—চেষ্টা করলে ওদের দেখাও যেত। কলকাতার আবছায়া স্মৃতির চাইতে অনেক বেশি বাস্তব ছিল।

বড় বড় মার্বেল নিয়ে ছেলেরা খেলত, এখানে ওখানে গাব্বু খুঁড়ত, মার্বেল ফাটানোর আওয়াজ শুনতে পেতাম। আমার চার ভাইও মার্বেল খেলত, শুধু যতি বড় ছোট, মা'র কোলে কোলে ঘুরত, চকচকে চোখ করে মার্বেল খেলা দেখত। কাঁচের বড় মার্বেল বড় সুন্দর লাগত, ভাবতাম ওর মধ্যে পাকানো পাকানো রঙের সুতি কি করে হয়, একবার ভেঙেও দেখা হল, কিছু পাওয়া গেল না।

পুতুল খেলতে ভালবাসতাম দিদি আর আমি, পুতুলের ঘরকন্না সাজিয়ে বসতাম। বাবাকে বনে বনে ঘুরতে হত, ফেরবার সময় কলকাতা হয়ে আসতেন, আমাদের জন্য খেলনা কিনে আনতেন, কাঁচের পুতুল, সেলুলয়েডের পুতুল, রান্নাবাড়ার সরঞ্জাম, পুতুলের খাট আলমারি; ছেলেদের জন্য দস্তার তৈরি রঙ-করা নানান্ রেজিমেন্টের সেপাই, যার

যেমন ইউনিফর্ম পরা, খেলার কামান, দুর্গ : প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তখন। দৌড়ঝাঁপও যথেষ্ট হত, পাড়ায় যে কয় পরিবার বাঙালি ছিলেন, প্রায় সকলেই বাবার মতো সরকারি জরিপ বিভাগের কর্মী, তাঁদের বাড়ির ছেলেমেয়েরা আর আমরা সকলে মিলে দলটি নেহাৎ ছোট হত না। লুকো-চুরি, গাছে চড়া, ব্যাডমিন্টন; তার উপর আমাদের ছবি আঁকার শখ ছিল। এর মধ্যে ছোট্ট মেয়ে নিয়ে মাসি এসেছিলেন কলকাতা থেকে। অমনি আমাদের নিভৃত পাহাড়-জীবনে নতুন একটা ঢেউ খেলে গেল। দিনরাত মাসির আর তাঁর মেয়ের মুখে কলকাতার গল্প সেখানকার সব কিছু রোমাঞ্চময় ছোটবেলার কলকাতাকে মনে পড়ত, কেমন একবার ২২নং সুকিয়া স্ট্রীটের দোরগোড়ায় মা দিদি আর আমি পালকি থেকে নেমেছিলাম, নেমেই দেখি একটা উঁচু টুলের উপর একটা ড্রামের মতো গোল যন্ত্র নিয়ে একটা লোক। সে বললে, 'রাক্ষস দেখবে দিদি তো একটা আধলা আমার হাতে দিয়ে, এইখানে চোখ লাগাও।' মা তাকে দুটি আধলা দিয়েছিলেন, চোখ লাগিয়ে দেখি ড্রামটা যেমন ঘুরছে, ভিতরে রাক্ষসদের শোভাযাত্রা, মারামারি কাটাকাটি, প্রাণ আই-ঢাই, যেই চোখ সরালাম, অমনি চেনাজানার রাজ্য। মাসিদের গল্প শুনেই প্রাণটা তেমনি আকুল হয়ে উঠত।

মাসির মেয়ে তো আর পাঁচটা মেয়ের মতো নয়, রূপের ডালি। অমন রূপসী মেয়ে কম দেখা যায়, যেমন কাটা কাটা নাকমুখ, তেমনি সোনার মতো রঙ, মাথাভরা থোপা থোপা আঙুরের মতো কালো কোঁকড়া চুল। আমার চেয়ে তিন বছরের ছোট, 'দিদি' বলে আমাদের কত আদর করে, নিজের ভাইবোন নেই, আমাদের পেয়ে আহ্লাদে আটখানা। বাক্স ভরা তার লেস বসানো রেশমী জামা, তার গলায় মুক্তো দিয়ে নক্সা তোলা; সেগুলি পরলে মেয়েকে দেখায় যেন পরীদের রানী। দেখে দেখে আশ মেটে না। মাসি মাকে থেকে থেকে দুঃখ করে বলেন, ওরে দুটো কালো মেয়ে নিয়ে শেষটা না মুশকিলে পড়িস্!—অমনি আমাদের নন্দনকাননে কিলবিল করে সাপ ঢুকল!

তাই তো, আমরা যে কালো, আমাদের মুক্তো দেওয়া রেশমী জামা

Scanned by CamScanner

নেই, রঙিন জুতো নেই, একথা তো আগে কেউ বলে নি। মনের মধ্যে ঈর্ষার একটা ছোট্ট কুঁড়ি ধরল, তার বড় জ্বালা। সুন্দর হবার স্বপ্ন দেখতাম, কিন্তু কি করে সুন্দর হওয়া যায়? মাকে কেঁদে বলতাম, 'তুমি না বল ভগবান সব পারেন, তিনি বড় দয়ালু, তবে আমাদের ফর্সা করেন নি কেন? নিশ্চয় পারেন না, নয় তো নিষ্ঠুর, ইচ্ছা করে করেন নি।'

মার কোলে ছোট্ট যতি, তাকে দেখিয়ে মা বলতেন,'যতি সুন্দর, চেয়ে দ্যাখ্ কত সুন্দর!' সত্যি যতি বড় সুন্দর, একছড়া সাদা ফুলের মতো, যতির হাত-পা'র গড়ন ফুলের মতো, কান দুটো যেন শাঁখ। মা বলতেন, 'সুন্দর হওয়াতে আবার বাহাদুরি কোথায়? ভগবান যাকে সুন্দর করেন সে-ই সুন্দর হয়।' আবার বলতেন, 'তোরা কালো হলেও আমার চোখে সুন্দর।' আহ্লাদে গলে যেতাম, আমাদের মাও তো খুব ফর্সা। জাঁক করে আমার ছোট মেসোমশাইয়ের ফর্সা ছেলে অমলদাকে একদিন বললাম, 'জানো, আমাদের বাবা এই শহরের মধ্যে সব চেয়ে ফর্সা!' শুনে অমলদা তো অবাক।

মেয়ে যা চায়, মাসি তাকে তাই দেন। আমাদেরো প্রায়ই এটা ওটা ভালো জিনিস দেন, কিন্তু মেয়ের সমান করে নয়। মাথা গুনলে আমরা আধ ডজনেরো বেশি, তাইতে আমাদের গর্ব কত, কিন্তু কেউ মিষ্টি পাঠালে ছুরি দিয়ে কেটে ভাগ করতে হয়, আঙুর পাঠালে মাথা পিছু দু-চারটে জোটে, মাসকাবারে হাতখরচ চার আনা করে বরাদ্দ। তাই দিয়ে বাক্সওয়ালার কাছে মনের মতো জিনিস কিনতে হলে এক মাসের পয়সায় কুলোত না, দু-তিন মাস ধরে জমাতে হত। মাসির মেয়ে মাসে মাসে পেত এক টাকা করে। কিন্তু মাসি বলেন খাওয়া-দাওয়ায় মেয়ের রুচি নেই, সে নাকি বড্ড একা! শুনে আমরা আশ্চর্য হয়ে গেলাম, একা আবার কাকে বলে? আমাদের বাড়িতে কারো একা হবার জো নেই। অভিমান করবার জো নেই, অমনি আর পাঁচজন তাকে জোর করে টেনে বের করে আনত, কি হল, কে কি বলল, তারো পত্রপাঠ একটা ব্যবস্থা করে ফেলা হত, রাগ দুঃখ মনখারাপের কোনো জায়গাই রাখা হত না। তবে দিদি আমার কথামতো না চললে মাঝে মাঝে ওকে পেটাতাম।

Scanned by CamScanner

ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কান্না জুড়ত, সবাই এসে আমাকে মহা শাসন করত, ওকেও বকা হত, 'তোর চেয়ে এক বছরের ছোট, চার ইঞ্চি বেঁটে, ওর কাছে পিট্টি খাস্‌ কি বলে?' দিদি কেঁদে বলত, 'হঠাৎ মারে, টের পাই না!' নিজে থেকে কখনো নালিশ করত না, প্রতিশোধ নিত না, কতকটা দিদি বড় ভালো বলে আর কতকটা আমার ভয়ে।

একদিন মাসিমা বললেন—'ওরে, বলতে ভুলে গেছি, কলকাতায় শুনে এসেছি, রবীন্দ্রনাথ এখানে বেড়াতে আসছেন, তাঁর জন্য ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় বাড়ি নেওয়া হয়েছে।' শুনে মা'র মুখে কথা সরে না, ওঁরা সবাই রবীন্দ্রনাথের বড় ভক্ত; তাঁর সঙ্গে আমার মেজ জ্যাঠামশাই উপেন্দ্রকিশোরের বড় ভাব ; জোড়াসাঁকোতে সুকিয়া স্ট্রীটে যাওয়া-আসা ছিল, জোড়াসাঁকোর কোনো উৎসবে জ্যাঠামশাই গিয়ে বেহালায় ছড়ি না লাগালে সম্পূর্ণ হত না। মা'র বইয়ের তাকে রবীন্দ্রনাথের কত বই। একবার 'খেয়া' বলে একটা দুর্বোধ্য বই থেকে মাত্র একটা পাতা ছিঁড়ে তেঁতুলের আচার মুছেছিলাম বলে আমার লাঞ্ছনার শেষ ছিল না। সেই রবীন্দ্রনাথ আমাদের শহরে আসছেন। অবিশ্যি সত্যি বলতে কি, তার চেয়ে আমাদের শিশুপাঠ্য গ্রন্থাবলীর 'জাম্বোদেশের সাম্বো' ও 'হৃষ্টপুষ্ট কেলে-কেষ্ট চারিটি তার ছেলে'র কথা যিনি লিখেছিলেন তিনি এলে, ঢের ঢের বেশি খুশি হতাম, সে কথা বলাই বাহুল্য। সেই সময় আমাদের বাড়িতে কয়েকদিনের জন্য একজন লম্বা সুন্দর মানুষ এসেছিলেন, তাঁর নাম প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ। সবে কেম্ব্রিজ থেকে ফিরেছেন, সেখানে একদিন ভোরে কেমন বাজি ধরে ধুতি পরে পথে বেরিয়ে, স্থানীয় লোকদের অবাক করে দিয়েছিলেন, তার রোমাঞ্চময় গল্প বলে আমাদেরো অবাক করে দিলেন। আচার মুছবার জন্য 'খেয়া'র পাতা ছেঁড়ার কথা শুনে তিনিও ভারি দুঃখিত, বললেন—'অমন মানুষ পৃথিবীতে আর নেই, বড় হয়ে ঐ বই ছেঁড়ার জন্য তোমাদের কত অনুতাপ হবে।'

সন্ধ্যাবেলা আমাদের তিনি বসবার ঘরে ডাকলেন। দেখি বড় ল্যাম্প নিবিয়ে চারটে মোমবাতি জ্বালা হয়েছে, হাতে একখানি বই নিয়ে প্রশান্তদা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। তারপর শুরু হল জলদ-

Scanned by CamScanner

গম্ভীর স্বরে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়া, সে পড়া শুনে আমরা মুগ্ধ, যদিও কাব্যরস বিন্দুমাত্র উপলব্ধি হত না, ওদিকে খাবার সময় উৎরে যায়। সেই রবীন্দ্রনাথকে এতকাল বাদে হাতের কাছে পাচ্ছি, আমাদের উৎসাহও কিছু কম ছিল না।

বনভূমির মাঝখানে ছোট্ট নদী, ঝোপে-ঝাপে ঢাকা, আছে কি নেই বোঝা যায় না। অল্প একটু স্রোত, তার কল্লোল নেই, চারিধারে শৌখিন বাড়ি। বাড়ির নাম ব্রুক্‌সাইড্‌, সেখানে রবীন্দ্রনাথ এলেন। সালটা ১৩২৬। গিয়ে দেখি ঝোলা-ঝালা লম্বা পোশাক, রাজারাজড়াদের মতো, পায়ে নকশা করা নাকতোলা চটি, লম্বা কোঁকড়া চুলদাড়ি, ফর্সা রঙ বার বার চেয়ে দেখতে ইচ্ছা করে, আবার লজ্জাও করে। তাঁদের বাড়িতে একদিন চা-পার্টি হল। তখনকার দিনের বড় লোকেরা গার্ডেন পার্টি দিতেন। বাগানে বসে স্যান্ডউইচ, প্যাটিস, কেক, বরফি ইত্যাদি উপাদেয় দ্রব্যাদি খাওয়া হত, গান হত, নানারকম খেলা হত। রবীন্দ্রনাথ সেদিন কবিতা পড়েছিলেন, 'কেস্টা বেটাই চোর' ছাড়া আর কিছু মনে পড়ে না। যাঁকে দেখে আমরা সব চেয়ে আকৃস্ট হয়েছিলাম, তিনি কবি নন, তাঁর দাদার নাতি দিনেন্দ্রনাথ। মাসিদের সঙ্গে অনেক দিনের পরিচয়, তাই কাছে যেতে পেরেছিলাম। অমন হাসি, অমন গান আর সব চেয়ে বিস্ময়কর অমন মোটা লোক আগে কখনো শুনিও নি, দেখিও নি। এর ষোল বছর পরে শান্তিনিকেতনে গিয়ে, এই মানুষটি যে কত অসাধারণ ছিলেন তার অনেক পরিচয় পেয়েছিলাম।

যে সময়ের কথা বলছি তখন সাহেবদের খুব বোলবোলা আর বাঙালি সাহেবদের তো কথাই নেই। এর আগেই দেশে স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে, অনেক রক্তও বয়ে গেছে, কিন্তু আমাদের নিরাপদ নীড়ে তার প্রতিধ্বনিটুকুও পৌঁছায় নি। ফ্যাশানেব্‌ল্‌ লোকেরা দেশি জিনিসকে ঘেন্না করত, তাদের ছেলেমেয়েরা বাংলা শিখত না, আয়া বেয়ারাদের কাছ থেকে অশুদ্ধ হিন্দি বুলি সংগ্রহ করত, বাপ-মায়ের সঙ্গে ইংরিজি বলত। এমন কি বিকৃত বাংলা বলাতে সেকালে একরকম আভিজাত্যের প্রমাণ পাওয়া যেত একথা বলা চলে। আমাদের কোনো

Scanned by CamScanner

উপায় ছিল না। গোড়াতেই গলদ, বাড়ি ময়মনসিংহে, বাবা সরকারি অফিসে বড় চাকরি করেন বটে, কিন্তু বাড়িতে চটি পায়ে, গেঞ্জি গায়ে, ধুতিটাকে লুঙ্গির মতো করে পরে ঘুরে বেড়ান, দুপুরে খাবার পর পান চিবোন। মা সেকালের বেথুন কলেজের বি-এ পড়া মেয়ে হয়েও মেমদের সঙ্গে ছাড়া ইংরিজি বলেন না।

আমাদের স্কুলে বাংলা পড়ানো হত না, ভারতের ইতিহাস এক বর্ণ শেখানো হয় না, ভূগোলটা তবু কিছুটা হত। বাড়িতে আমাদের আখ্যানমঞ্জরী পড়তে হত, কিন্তু পরিবেশের প্রভাব একেবারে কাটানো বড় শক্ত, দিদি আমি নিজেদের মধ্যে ইংরিজিতে কথা বলতাম অনেক সময়।

আরেকটা দিকও ছিল। বাপ-জ্যাঠারা ছোটদের জন্য গল্প-প্রবন্ধ লেখেন, পত্রিকা প্রকাশ করেন, বই লেখেন, তার জন্য আমাদের অসীম গর্বও ছিল। ছোট একটা খাতা করেছিলাম, তার মধ্যে গল্প লিখতে শুরু করে দিলাম, অবিশ্যি প্রথম প্রথম ইংরিজিতে। খাতার কথা যথাসম্ভব গোপন রাখা হত, ভাইবোনদের হাতে হাতে ফিরত, তারা ছিল ভক্ত ও ভাগিদার, সমালোচক, উপভোক্তা, একাধারে সব কিছু। মাসির মেয়ে জানল, ক্রমে মাসি জানলেন, এবং একটা দুঃখের দিনে চায়ের টেবিলে, বাইরের লোকের সামনে হাসতে হাসতে প্রকাশ করে দিলেন। বড়রা সবাই খাতা কই, খাতা কই বলে চ্যাঁচাতে লাগলেন। আনন্দ আর বিদ্রুপের তফাৎ চিনতে ছোটদের বেশি সময় লাগে না। কান দুটো গরম হয়ে উঠল, খাতাখানি কুচিকুচি করে ছিঁড়ে ফেলে দিলাম। নিজের বুকে সত্যি করে ব্যথা করছিল, ভাইবোনদের মহা দুঃখ, মাসিও বড়ই অনুতপ্ত।

আমাদের আরেক মাসিও ছিলেন, ফুলের মতো সুন্দর ছোটমাসি, আমি তাঁকে জড়িয়ে ধরে বলতাম, 'মন্না, আমি তোমার চশমা হব।' ছোটবেলার কত কথাই ভুলে গেছি, আমার সেই সুন্দর মাসিও স্বর্গে গেছেন প্রায় চল্লিশ বছর হতে চলল, তবু ঐ আদরের কথা কটি আমার মুখে এখনো লেগে আছে। যা বলেছি, যা করেছি সব কিছুতে উৎসাহ দিয়েছেন, আদর ছাড়া কিছু পাই নি তাঁর কাছে।

Scanned by CamScanner

একেকটা দিনকে যেন নিটোল একটি মুক্তোর মতো চিরদিনের জন্য মুঠোর মধ্যে পেয়েছি। রাগারাগি করে একদিন ভাইবোনদের সঙ্গে বিকেলে বেড়াতে যাই নি, পেটিকোট গায়ে দিয়ে বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে আছি, এমন সময় বাবা বাড়ি এলেন। অমনি গিয়ে আলমারির কোণে লুকোলাম, বাবার বড় কড়া মেজাজ, কে জানে আমার মিছিমিছি রাগা-রাগির কথা শুনলে হয়তো চড়চাপড়টা বাদ যাবে না। হল ঠিক তার উল্টো, আলমারির খাঁজে মুখ গোঁজা, বাকি সবটা প্রকট, বাবা দেখে অবাক।

সংক্ষিপ্ত বিবরণী মা একটা দিলেন, বাবা বললেন, 'আমরা পাহাড়ে পাইন বনে যাচ্ছি, যাবি তো চল্।' আর আমাকে পায় কে, পাঁচ মিনিটে জামা গায়ে, ছোট্ট নতুন সবুজ ছাতা হাতে যাবার জন্য তৈরি। যারা গভীর বনে কখনো যায় নি, তারা সেখানকার চেহারা কল্পনা করতে পারবে না। বাইরে তখনো বিকেলের মিষ্টি রোদ; পাকদণ্ডী বেয়ে কিছু-দূর ওঠা সরলগাছের গোড়ায় থোপা থোপা গোলাপী বনফুল, গাছের গায়ে হানিসাক্‌ল্ লতা, গন্ধে চারদিক ভুরভুর করছে। পথের ধারে পাথরের ছায়ায় গোছা গোছা সিলভার ফার্ণ, ওপরটা গাঢ় সবুজ, তলায় সাদা রঙ লাগা, হাতের উপর চেপে ধরলে ফার্ণের সাদা নকশা উঠে আসে।

শিকড়সুদ্ধ ফার্ণ উপড়ে আনি, বাড়ি গিয়ে লাগাব। এক থোপা শিকড় আগায় ঘন লোম, স্কুলে শুনেছি তাই দিয়ে শক্ত মাটি থেকে জল শুষতে সুবিধা হয়, শিকড়ের কচি আগায় ছোট্ট টুপি পরানো, যাতে ব্যথা না লাগে! বাবা বললেন, 'এখন তুললি কেন, পাহাড়ে চড়তে হবে যে, গাছের গোড়ায় রেখে যা, ফেরার সময় তুলে নিস্।' রাস্তার পাশে লোহার থামের উপর, প্রকাণ্ড জলের ট্যাঙ্ক, গোটা শহরের জল সরবরাহ হয় এখান থেকে। সে জলের কৃত্রিম উপায়ে পরিশোধন হত না, উৎসের মুখ থেকে পাইপে ধরা হত। আমরা সেদিন তাই দেখতেই গিয়েছিলাম।

জলের ট্যাঙ্কের পাশ দিয়ে যেই বনের মধ্যে ঢুকলাম অমনি চারদিক ছায়াময় হয়ে উঠল। বাইরের শব্দ সেখানে পৌঁছয় না, শুধু ঝোপের

Scanned by CamScanner

আড়ালে নিরন্তর ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক ঝির-ঝির জল পড়ার শব্দ আর পাইন বনের মধ্যে বাতাসের দীর্ঘশ্বাস। পাখিরা বাসায় ফিরছে, তাদের খানিক ডাকাডাকি আর ডানা ঝাপটানি। এখানকার সঙ্গে চেনা পৃথিবীর সাদৃশ্য নেই। এখানে সব রঙ মিলে গিয়ে অপূর্ব শ্যামল রূপ ধরেছে। কত রকম সবুজ, দিনের আলো যেটুকু পৌঁছচ্ছে সেও সবুজ ; সরলগাছের গায়ে ছাই মেশানো সবুজ পরগাছা ঝুলছে, তাদের 'লাইকেন' বলে, কত রকম চেহারা তাদের, হাত দিলে শক্ত কর্কশ। হঠাৎ নাকে আসে অপূর্ব সৌরভ, চারদিকে চেয়ে দেখি, উঁচু ডালে অর্কিডের ফুল ফুটেছে। মোটা মোটা রসাল শিকড় বাতাসে মেলে ধরা, কোথাও সোনালি ফুলের ছড়া, তাদের বুকের ভেতরটা গাঢ় লাল, কোথাও যেন মোমের তৈরি সাদা ফুলে বেগ্‌নির ছটা।

আগাছার মধ্যে দিয়ে হঠাৎ সরসর করে কি চলে যায়, ভয়ে ভয়ে চেয়ে থাকি, এই বুঝি দেখব চ্যাটালো মাথা, চকচকে চোখ আর চেরা জিব! গাছের নিচে নিচে পায়ে চলা পথ, পায়ের তলায় ভিজে স্যাৎ-সেঁতে; আপনা থেকেই আমাদের গলার স্বর নিচু হয়ে আসে, এখানে উঁচু গলায় কথা বলতে ইচ্ছে করে না। এখানে পৃথিবীর বুকের জমানো জল দিনের আলোতে বেরিয়ে আসছে, তাই দিয়ে শহরসুদ্ধ লোকের তৃষ্ণা নিবারণ হচ্ছে।

পথ ছেড়ে পাথরের উপরে চড়ে দেখি অনেকগুলো উৎস, কয়েকটা উপরে, কয়েকটা নিচে। তাদের মাথার উপর বন বিভাগের আফিস থেকে ঘর বেঁধে দিয়েছে, যাতে কেউ জল নষ্ট না করে। টিনের চাল, পাথরের দেয়াল, জালে মোড়া খানিকটা ফাঁক, সেখান দিয়ে বাতাস চলাচল করে। জালে চোখ লাগিয়ে দেখলাম পাথরের মাঝখানে মাটিতে তিন-চারটে গোল ফাটল, তার মধ্যে থেকে বুড়বুড় করে অনবরত জল বেরুচ্ছে, স্বচ্ছ স্ফটিকের মতো জল, একটু বয়ে গিয়ে পাইপের মুখে ঢুকছে। সেই বিকেল, সেই পাইন বন, সেই স্ফটিক জলের উৎস চিরদিনের মতো আমার মনের পটে আঁকা হয়ে রইল।

Scanned by CamScanner

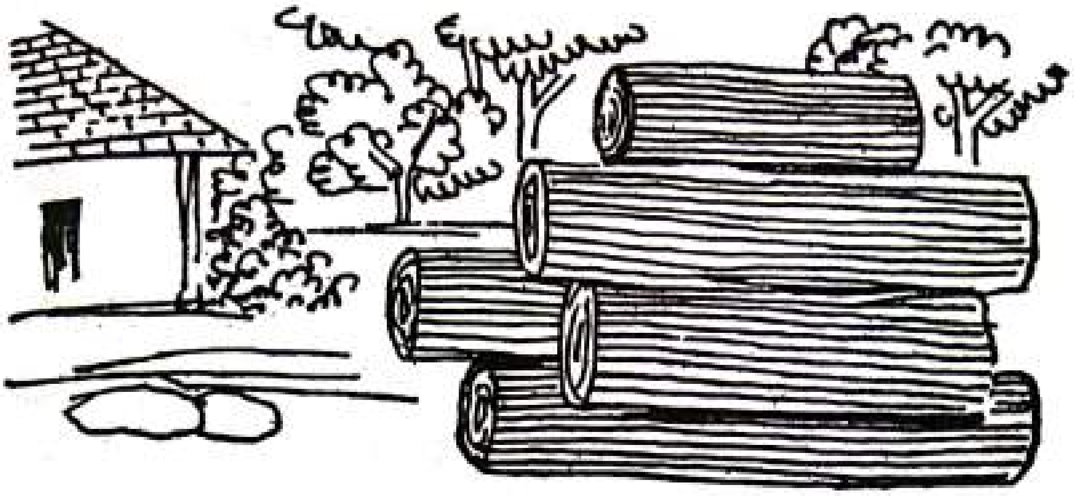

॥ পাঁচ ॥

একটা চৈত্রের শেষে একদিন ভোর না হতেই কাঞ্জিলালবাবুর স্ত্রী আমাদের বাড়িতে এসে সকালবেলায় চায়ের আসরের একটি কোণে বসলেন। চা বলতে আমাদের ভাগে পেয়ালাভরা দুধে চা ঢেলে একটু রঙ করে নেওয়া। পাঁউরুটির সংস্রব থেকে যথাসাধ্য নিজেকে বাঁচিয়ে, কাঞ্জিলালবাবুর স্ত্রী আমাদের বললেন, 'তোমাদের বাড়ির হাওয়া গায়ে লাগাতে এলাম; আমার এ বৌমার খালি মেয়ে হয়, তোমার মায়ের পর পর চারটে ছেলে, দেখি, এবার যদি কপাল ফেরানো যায়!' কথাটা শেষ হতে না হতেই ভিতরের ঘর থেকে লেডি ডাক্তার বেরিয়ে এসে এক-গাল হেসে দিদিকে আর আমাকে বললেন—'তোমরা নিশ্চয় খুব খুশি হবে। তোমাদের একটি বোন হয়েছে।' আর অপেক্ষা নয়, এক সঙ্গে সবাই হুড়মুড় করে উঠে পড়ে বোন দেখতে চললাম, কাঞ্জিলালবাবুর স্ত্রীও এক মুহূর্তও অপেক্ষা না করে বাড়ির দিকে রওনা দিলেন। শেষটা না কিসের থেকে কি হয়ে যায়!

দর্শকের আসন থেকে সেই প্রথম নেমে ছোট শিশু কোলে নিলাম। তাকে স্নান করানো, তাকে খাওয়ানো, তাকে ঘুম পাড়ানো, তার জামা বদলানো এ সবের মধ্যে কি যে অপূর্ব আনন্দ লুকিয়ে থাকে, এর আগে জানতাম না। যতদূর মনে পড়ে বাবা তখন বাইরে ছিলেন, মা'র বোধ হয় শরীর ভালো ছিল না। তখন আমার দশ বছর বয়স। ছোট মেয়েটার চোখের তারায় একটু নীলের আভাস, ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে সব কিছু চেয়ে

Scanned by CamScanner

চেয়ে দেখে। মার প্রবল আপত্তি কেউ শুনলাম না, মেয়ের ডাকনাম রাখা হল 'হাবু'। একটু চলতে ফিরতে শিখলেই সে হয়ে উঠল যতির নিত্যসঙ্গিনী। তাদের দুজনের খেলাধুলো, ঝগড়াঝাঁটির তদারক করেই কত সময় কেটে যেত। তবে তারা সর্বদা আমাদের থেকে একটা আলাদা জগতে থাকত।

এদিকে আমাদের অলক্ষ্যে আমাদের শৈলবাস ক্রমে শেষ হয়ে আসছিল, কিন্তু তখনো প্রতিটি দিনের প্রতিটি মুহূর্ত কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে থাকত। বাবা-মা'র সঙ্গে মাঝে মাঝে পাহাড়ের চূড়ায় বেড়াতে যেতাম; যতদূর চোখ যায়, পাহাড়ের সারির পিছনে শুধু পাহাড়ের সারি; শেষে দিগন্তে পৌঁছে, কোনটা নীল আকাশ আর কোনটা নীল পাহাড় চেনা যায় না। এখানে সবুজ পায়রা চরতে আসে, বনবিভাগের কাঠগুদামে সারাদিন ঠক ঠক কাঠ কাটার শব্দ শোনা যায়। সেখানে গিয়ে দেখেছিলাম গোছা করে পাইন কাঠের তক্তা বেঁধে, কপিকলের সাহায্যে দড়িতে করে পাহাড়ের নিচে নামানো হচ্ছে। সেই প্রথম রোপ-ওয়ে দেখা।

কাঠগুদোমের লোকেরা বড় নির্জন জীবন কাটায়, ওদের আস্তানার কাছে এলেই ধূপের গন্ধ নাকে আসে, সরলগাছের গোড়ার দিক থেকে তেলতেলা কাঠ কেটে নেওয়া হয়, জ্বালানির কাজের জন্য। তাই দিয়ে ওখানকার লোকে উনুন ধরাত, ধূপকাঠের অন্য ব্যবহারের কথা তখনো জানি না।

পোলো খেলার মস্ত মাঠটি পাহাড়ে ঘেরা, মাঝখান দিয়ে এঁকেবেঁকে একটি পাহাড়ে নদী চলেছে। স্কুল থেকে মাঝে মাঝে বড় মেয়েরা ঐদিকে অনেক দূরে বেড়াতে যেত আর কোনো একটা নদীর জল থেকে শিশিতে করে পারা সংগ্রহ করে আনত। চারিদিকে বিস্ময়ের অবধি নেই।

আশেপাশে কত না জলপ্রপাত; সেখানে পিকনিক করতে ভারি মজা। সকালে যাওয়া হয়। সবাই হেঁটে যায়। শুধু যতি আর হাবুকে কাকমি মেডিলা আর তার বোন কাকমি ডোরেন পিঠে বেঁধে নিয়ে চলে। ঝরনার ধারে পাথরের উনুনে রাঁধাবাড়া হয়, খাওয়াদাওয়া হয়, সারাদিন ঘুরে বেড়ানো, জলে পা ডোবানো, গল্প, নদীর ধারে নরম ঘাসে শুয়ে থাকা, কানের এত কাছে নদীর জলের ছলছল শব্দ কেমন অদ্ভুত

Scanned by CamScanner

শোনায়। চমকে চারিদিকে চেয়ে দেখি, পাহাড়ের পাথুরে গায়ে দুটি বুনো ছাগল গুঁতোগুঁতি করছে, একটা শিং পেতে তৈরি থাকে, অন্যটা শিং বাগিয়ে লাফিয়ে পড়ে, খটাস্ করে জোরে শব্দ হয়, চারদিকে প্রতিধ্বনি ওঠে। আমরাও উঠে পড়ি, পাহাড়ের দিকে মুখ করে চেঁচিয়ে বলি হা—হা—হা, পাহাড় নানান্ সুরে উত্তর দেয় হা—হা—হা—হা—হা—হা। ঝরনার কোলে যেই পাহাড়ের ছায়া ঢলে পড়ে, মা বলেন, 'আর দেরি নয়, বাড়ি পৌঁছতে অন্ধকার হয়ে যাবে।'

অমনি ওঠ্ ওঠ্ তোল্ তোল্, পনেরো মিনিটের মধ্যে রওনা হয়ে পড়ি। ফেরার পথটাকে যেন বড় বেশি লম্বা মনে হয়। সূর্যের শেষ আলোটা বড় মিষ্টি, বড় সুন্দর লাগে। ক্রমে তাও মিলিয়ে যায়, চারদিকে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে, কিন্তু ততক্ষণে আমাদের নিজেদের এলাকায় পৌঁছে গেছি, গলফ খেলার আবছা মাঠের ধার দিয়ে ক্লান্ত পায়ে বাড়ির দিকে চলেছি, কাঞ্জিলালবাবুদের বাড়ি পেরিয়ে, হরিচরণের বাড়ি পেরিয়ে—ঐ বাড়িতেই বাংলার বাঘ দেখেছিলাম—সরকারি স্কুলের মেম টিচারদের বাড়ি পেরিয়ে দেখি ঐ যে আমাদের একান্ত নিজেদের লম্বা বাড়িটি সারি সারি কাঁচের দরজা জানলার পিছনে আলো জ্বেলে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

যামিনীদা আমাদের জন্য মাংসের ঝোল ভাত রেঁধেছে, হাত-পা ধোবার জন্য জল গরম করে রেখেছে। তারপর খাওয়াদাওয়া হলে, লেপ গায়ে দিয়ে গরম বিছানায় শোয়া; এর চাইতে বেশি নিশ্চিন্ত সুখ আজ পর্যন্ত কল্পনা করতে পারি না। কাকমি মেডিলা কাকমি ডোরেন আজ রাতে বাড়ি যাবে না, ওদের ছেলেপুলেদের ওদের বুড়ি মা আগলাবে। সকালবেলায় পুঁটলি করে রাঁধা ভাত এনেছিল, তাই খুলে এখন খাওয়া-দাওয়া করল, যামিনীদার রান্না তারা খাবে না। দুপুরে তো মার সঙ্গে নিজেরাই খিচুড়ি রেঁধেছিল, সেটি খেতে আপত্তির কারণ ছিল না। রাত বাড়তে থাকে, কাজকর্মের আওয়াজ আস্তে আস্তে থেমে যায়, কাকমি মেডিলা কাকমি ডোরেন গুটি গুটি এসে আমাদের শোবার ঘরের কোণায় ম্যাটিং দিয়ে মোড়া মেজের উপর বিছানা পেতে শুয়ে পড়ে। পরিপূর্ণ

Scanned by CamScanner

একটি দিনের অবসান হয়।

কাউই সাহেবদের সিসলের বেড়ার কাছে আমাদের প্রত্যেকের নিজেদের একটি করে ছোট্ট বাগান। সেখানে আমরা নিজেদের হাতে মাটি কোপাই, চারা পুঁতি, বিচি পুঁতি, কাঠি দিয়ে বেড়া বানাই, ঝারি করে জল দিই। কলকাতা থেকে মা বিলিতি সিমের বিচি আনালেন, আমাদের হাতেও একটি করে গাঢ় লাল লম্বা বিচি দিলেন, তাতে কুচকুচে কালো একটি করে চোখ, তার পাশে সাদা একটু দাগ, সত্যিকার বিচি বলে মনে হয় না, যেন চকচকে রঙ করা হাতে গড়া খেলনা।

মালির কথা মতো এক রাত ভিজে তুলোয় রেখে, সার দেওয়া জমিতে বিচি পোঁতা হল, নিয়মিত জল দেওয়া হতে থাকল, দিনের মধ্যে দশবার গিয়ে দেখা হল। কয়েক দিনের মধ্যেই প্রত্যেকের বাগানে সিমের বিচি থেকে একটি করে বাঁকা অঙ্কুর দেখা দিল, শুধু আমার বাগানে কিছু হল না। আরো দুদিন গেল প্রত্যেকের অঙ্কুরটি একমাথা মাটির অবলম্বন ছেড়ে, শুকনো সিম বিচির দুটি অর্ধেকের মাঝখানে নরম কচি ফিকে হলুদ একজোড়া ছোট্ট পাতা নিয়ে, সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল। শুধু আমার বাগানে কিছু হল না। সারাদিন অপেক্ষা করে, রাগে দুঃখে চোখ-ভরা জল নিয়ে, বিকেলে খুরপি দিয়ে লাগালাম পেল্লায় এক কোপ! খুরপির মাথায় উঠে এল একটু কচি শিকড় আর বাঁকা অঙ্কুরের মাথায় সিম বিচির দুটি আধখানার মাঝখানে এক জোড়া কচি পাতা; কিন্তু মাঝখানে ভেঙে দু-টুকরো হয়ে। খুরপি ফেলে দিয়ে দুই হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে পড়লাম। ব্যাপার দেখে মা এসে আমার হাতে আরেকটি গাঢ় লাল লম্বা সিম বিচি গুঁজে দিলেন। চোখে জল, হাতে বিচি নিয়ে মা'র মুখের দিকে চাইলাম, মা আঁচলের কোণা দিয়ে চোখ মুছিয়ে বললেন, 'সময় হলেই সব হয়; জোর করে কিছু হয় না, মা।'

এরই মধ্যে একদিন স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে দেখি কাদের বাড়ির ঝোপের বেড়ার উপর থোপা থোপা লতানে লাল গোলাপ আর সাদা মেফ্লাওয়ারের ছড়া একাকার হয়ে আছে। দুই হাত ভরে বাড়ি নিয়ে গেলাম; বাবার আপিসের চাপরাশির হেপাজতে যাওয়া আসা করি,

পরের বাড়ির ফল ছেঁড়াতে তার মহা আপত্তি। এমনিতেই তার সঙ্গে আমার বিশেষ বনে না। সারাদিন ক্লাসে বন্ধ থাকার পর পথ ছেড়ে একটুখানি পাহাড়ের গা বেয়ে উঠেছি কি অমনি হাত ধরে টেনে নামিয়ে দেবে। দিদি কোনো রকম গোলযোগ করে না, তার উপর চাপরাশি ভারি খুশি। একদিন চাপরাশির বকুনি খেয়ে হাঁড়িমুখ করে পিছন পিছন চলেছি, হঠাৎ খেয়াল হল চাপরাশির নাগরা পরা জুতোর উপরে পায়ের কব্জি দুটো বেজায় সরু, ঠিক আমার ছাতাটির বাঁকা হাতলের মাপ। যেই না মনে হওয়া, অমনি ছাতাটাকে উল্টে ধরে বাঁকা বাঁট দিয়ে সরু পায়ের কব্জিতে দিয়েছি এক টান, পড়তে পড়তে অনেক কষ্টে নিজেকে বাঁচিয়ে নিল ব্যাটা। আমার কি দুঃখ!

ব্যাপারটা ঘটেছিল টিলার উপর বাবার আপিসের ঠিক নিচেকার পথে। বিকেলে বাড়ি ফিরে চা খেতে খেতে বাবা হঠাৎ আমার দিকে ফিরে বললেন, 'লোকটা তো ভারি দুষ্টু, কিছুতেই পড়ল না!' আমি ভয়ে কাঠ। বাবার যে কড়া মেজাজ, যমের মতো ভয় করি তাঁকে। দেখি তাঁর ঠোঁটের কোণে মুচকি হাসি। হয়তো নিজের ছোটবেলাকার কথা মনে পড়েছিল ; শুনেছিলাম দেশে ওঁদের ছোটকালে, দোলের সময়ে বাবা আর আমার ছোট জ্যাঠামশাই কুলদারঞ্জন রঙের পিচকারি নিয়ে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে তাড়িয়ে বেড়াতেন। বাবা নাকি এমনি দুষ্টু ছিলেন যে ঠাকুমাকে বাধ্য হয়ে একজন গুন্ডা মতো লোক রাখতে হয়েছিল; সাধারণ লোক তাঁর সঙ্গে পারবে কেন। পাড়ার লোকে রায়দের বাড়ির শম্ভুকে দস্তুরমতো ভয় করে চলত। তাই বলে যে আমাদের অপরাধগুলো সেই শম্ভু সব সময় ক্ষমা করত, তা যেন কেউ না ভাবে!

চাপরাশির হাত এড়িয়ে ফুলগুলো মার কোলে ঢিপি করে ফেললাম; মা ফুলের রাশির উপর দিয়ে হাসিমুখে বললেন, 'ওরে তাতা আসছে, টুলু আসছে।' শুনে আমরাও আনন্দ রাখার জায়গা পাই নে। বড়দা আসছে! বড়দাকে দেখি নি কখনো, ছোটবেলায় যখন কলকাতায় গিয়েছিলাম বড়দা তখন বিলেতে, বি. এস. সি. পাস করার পর ফটোগ্রাফি ইত্যাদিতে উচ্চশিক্ষা নিতে গেছে। কিন্তু বড়দা যে অন্য সবার চেয়ে আলাদা একজন

Scanned by CamScanner

বিশেষ লোক সেটুকু আমরা সবাই জানতাম। 'তাতা' বললেই মা'র মুখখানি কোমল উজ্জ্বল হয়ে উঠত। আমার জ্যাঠামশাই উপেন্দ্রকিশোরের বাড়িতে মা মানুষ হয়েছিলেন ; জ্যাঠামশাইয়ের প্রথম সন্তান আমার বড়দি সুখলতা রাও, মা'র চাইতে দু'বছরের ছোট, বড়দা হয়তো আরো বছর দুইয়ের ছোট। এদের কথা বলতে গেলে মা অন্য রকম হয়ে যেতেন। সেই তাতা নাকি তার নতুন বৌ নিয়ে আমাদের বাড়িতে বেড়াতে আসছে! এত সুখ কল্পনা করা যায় না।

বড়দার নাম সুকুমার, বৌঠানের নাম সুপ্রভা। তাদের জন্য ঘর সাজানো হতে লাগল, বাড়ির সমস্ত ব্যবস্থা উল্টেপাল্টে গেল, পড়াশুনো আমাদের মাথায় উঠল। ওদের সঙ্গে বড়দার সবার ছোট ভাই, নানকু-দাও আসছে, তবে নানকুদাকে আমরা ততটা আমল দিতাম না। সে এর আগেও দু-একবার এসেছে, আমাদের চেয়ে মাত্র বছর দশেকের বড়, তাছাড়া সে আমাদের খেলার এবং গল্পের একজন অংশীদার, তাকে খুব বেশি সমীহ করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু মানুষটা যে খুবই ইন্টা-রেস্টিং সে বিষয়েও সন্দেহ নেই। গল্প বলার লোভ দেখিয়ে আমাদের দিয়ে নিজের ঘাড়ে ঘন্টার পরে ঘণ্টা সুড়সুড়ি দিয়ে নিত এবং সেসব গল্পের তুলনা হয় না। তবে অধিকাংশই একটু লোমহর্ষণ গোছের, শুনতে শুনতে আমাদের গায়ে কাঁটা দিত, চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসত। আশ্চর্য রকম রসবোধ তার, কিসের থেকে যে রস পায় না তাই ভেবে ওঠা দায়। ওর ডায়েরি লেখার অভ্যাস, তার মধ্যে যাবতীয় লোকজন, ছোট-বড়, চেনা-অচেনার বিষয় অকপট মন্তব্য লেখা থাকে; তখনো থাকত, এখন তার আটষট্টি বছর বয়স, এখনো থাকে। যার বিষয়ে মন্তব্য সে ততটা খুশি না হলেও, অন্যদের কাছে মন্তব্যগুলো যে অতিশয় উপভোগ্য তাতে সন্দেহ নেই।

নানকুদার ভালো নাম সুবিমল, ফর্সা রোগা মানুষটি, মুখখানি ভারি সুন্দর, উপেন্দ্রকিশোরের ছবির সঙ্গে খুব সাদৃশ্য, কিন্তু স্বাস্থ্যটা সব সময় ভালো থাকে না আর সম্ভবত সেই জন্যই ওর মনোরাজ্যের এত উপকর্ষ।

Scanned by CamScanner

এ মানুষটাকে অনেকেই চেনে না : এমন রসোজ্জ্বল স্নেহশীল কোমল হৃদয় মানুষ কম দেখা যায়। তবে যখনকার কথা বলছি তখনো ওর কোমল হৃদয়ের পরিচয় পাবার সুযোগ বা সময় আসে নি। আর তখন ওর মোটে কুড়ি বছর বয়স, হৃদয়টা সত্যিই হয়তো ততটা কোমল ছিলও না। যাই হোক, ওকে আমল না দেবার আসল কারণ হল স্রেফ হিংসে। মাকে ও বড্ড ভালোবাসত, মান্তু বলে ডাকত, আর মা'র মনেও যে ওর জন্য একটা নরম জায়গা সর্বদা রাখা থাকত, সে আর আমাদের বলে দিতে হত না।

এসবে অবিশ্যি আমাদের গল্প শোনার আনন্দ বিন্দুমাত্র কমত না। নিজের দেশের কথা, সাধুসজ্জনদের কথা, আত্মীয়স্বজনদের সম্বন্ধে অনেক গোপন অথচ চিত্তাকর্ষক তথ্য সে আমাদের কাছে অনর্গল বকে যেত। থেকে থেকে গল্প থামিয়ে চোখ পাকিয়ে বলত—'পিসিমার বিষয়ে ঐ গল্পটা খবরদার যেন মান্তু জানতে না পারে; মান্তুর কানে গেলে কিন্তু তোমাদের অনুতাপ করতে হবে।' শুনে শিউরে উঠতাম— 'না, না, মাকে কক্ষনো বলব না, তাপ্পর বল সেই অহঙ্কারী বুড়ো ভদ্রলোককে তুমি ইংরিজিতে কি লিখেছিলে?'

নানকুদা গম্ভীর মুখে বলত, 'লিখেছিলাম—The iron hand of discipline will descend upon your shoulder with hellish vigour and shatter the citadel of your garnered idiocy'. উত্তেজনায় আমাদের বাক্যস্ফূর্তি হত না।

সত্যি কথা বলতে কি, নানকুদার চমৎকারিত্ব বুঝতে আমাদের প্রায় সারা জীবন লেগেছে, কিন্তু ওর উদ্ভট তত্ত্ব তখনি উপলব্ধি হয়েছিল। কত রকম বই যে ঘাঁটত তার ঠিক নেই, কত রকম জ্ঞানই না আমাদের দিত। বলত—'সাদা সিমুল দেখলেই তার শিকড় তুলে রাখবি; ঐ দিয়ে ওষুধ করে যে সব বুড়োদের দাঁত পড়ে গেছে, তাদের আবার দাঁত গজানো যায়!' দুঃখের বিষয় আজ পর্যন্ত এটা পরীক্ষা করার সুবিধা হয় নি, সাদা সিমুল চোখে দেখলাম না।

তা না দেখলেও নানকুদার গল্পগুলো আমার মনের মধ্যে দানা

Scanned by CamScanner

বাঁধতে আরম্ভ করল। নানকুদার অনুপস্থিতিতে, আমিও ভাইবোনদের বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলা ধরলাম। সে সব গল্পে সম্ভব-অসম্ভবের কোনো সীমা ধরা ছিল না। ভাইবোনদের আস্কারা পেয়ে মাঝে মাঝে বড়দের কাছেও বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলতে শুরু করলাম, তবে খুব সাবধানে এবং বাড়ির বড়দের কাছে নয়। মা আমাকে কেবলি বলতেন—'ওরে বানিয়ে গল্প বলার মুশকিল হচ্ছে লোকে হয়তো সত্যি বলে ধরে নেবে; তারপর তোকে মিথ্যাবাদী বলবে।' কিন্তু বানানো গল্পের নেশা যাকে একবার পেয়ে বসে, তথ্যগত সত্যমিথ্যা তার কাছে অকিঞ্চিৎকর হয়ে যায়; সত্যই বা কি আর মিথ্যাই বা কি, গল্পের মধ্যে সব একাকার; এত কথা মাকে বোঝাবার মতো বুদ্ধি ছিল না আমার। আমার মা কখনো ঠাট্টা করেও বানানো গল্প বলতেন না। মা বলতেন, 'বানানো হলে আগেই বলে দিতে হয় যে বানানো।' তা হয়তো হয়, কিন্তু হায়, তা হলে যে সবটুকু রসই মাঠে মারা যায়!

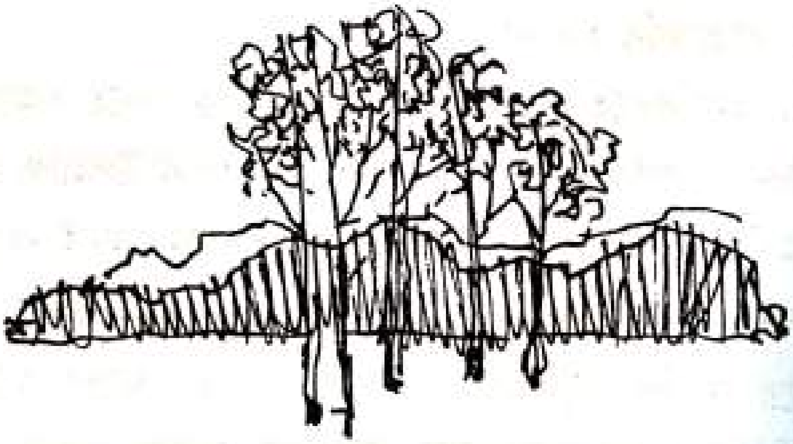

Scanned by CamScanner

॥ ছয় ॥

এ কথা ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে বড়দার পরিচয় দিতে হলে আজকাল বলতে হয় সত্যজিৎ রায়ের বাবা! তার মতো অনন্যসাধারণ মানুষকে যে লোকে এত সহজে ভুলে যেতে পারে, তাও বিশ্বাস হতে চায় না। গেছেও চলে বড়দা তেতাল্লিশ বছর আগে, সত্যজিতের তখন দু'বছর বয়স হয়েছে কিনা সন্দেহ। বাবার অসাধারণত্ব চোখে দেখার সুযোগ হয় নি তার। ঐ যে অত বড় ইউ-রায়-এন্ড-সন্সের ছাপাখানা আর পাবলিশিং কোম্পানি, যা দেখতে দূর থেকে লোকে আসত, বড়দা চোখ বোজার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সেও লাটে উঠল, জ্যাঠামশাইয়ের সারা জীবনের সাধনা অন্য লোকের হাতে চলে গেল, তার আর কোনো বৈশিষ্ট্যই বাকি রইল না।

আমি যখনকার কথা বলছি তখনো এসব দুঃখের কথা কালের খাতায় লেখা হতে বছর পাঁচেক দেরি ছিল, বড়দা তখনো যেখানেই যেত একটা আনন্দের তুফান সঙ্গে সঙ্গে যেত। বড়দা যেখানে থাকত, অন্য কারো দিকে লোকের চোখ পড়ত না। তাই বলে বড়দার কিছু কার্তিকের মতো চেহারা ছিল না। তবে চেহারার মধ্যে কি একটা যেন ছিল যার সঙ্গে মুখাবয়বের কোনো সম্পর্ক ছিল না, কিন্তু যা তার সর্বাঙ্গ থেকে আলোর মতো ঝরে পড়ত। এখন বুঝি সেটি তার ব্যক্তিত্ব।

লম্বা দোহারা মানুষটি, একমাথা কালো কোঁকড়া চুল, চোখ দুটি প্রায় সব সময় হাসত, কিন্তু গম্ভীর হলে এমনি গম্ভীর হত যে কাছে ঘেঁষতে

Scanned by CamScanner

ভয় পেতাম। বড়দা ছিল যেমনি আমুদে, তেমনি রাশভারি, অন্যায় সে কখনো সইত না। যতদূর মনে পড়ছে বড়দার গালে একটা বড় তিল ছিল, আমাদের সেটিকে ভারি পছন্দ ছিল।

ওদের বাড়িতেই মা মানুষ হয়েছিলেন, তাই সম্বন্ধটি বড় মজার দাঁড়িয়েছিল, খুড়ি হলেও বড় বোনের মতো। মা'র কাছে ছোটবেলার কত যে গল্প শুনেছি তার ঠিক নেই। মা বলতেন তাতা আর সুখলতার কাছে ছোট কিছু ঘেঁষতে পারত না। সুখলতা হল আমার বড়দি, ছোটবেলায় যেমনি ভালো তেমনি ভীতু ছিল। প্রাণ গেলেও মিথ্যা কথা বলবে না, কোনো অন্যায় কাজে যোগ দেবে না, ভারি মনের জোর। কিন্তু রাতে একলা উঠতে ভয় করে, একে ফুসলোয় ওকে ফুসলোয়। সেকালে ঠিকেগাড়ি করে লোকে যাতায়াত করত; চাকর যদি এক-ঘোড়ায় টানা গাড়ি আনত, বড়দি বলত, 'ঘোড়াটা পাগল নয় তো, তাই অন্য ঘোড়ার সঙ্গে জুততে ওরা সাহস পায় না?' আর যদি দু-ঘোড়ায় টানা গাড়ি আনত, বড়দি বলত—'অত বড় দুটো ঘোড়ায় অতটুকু গাড়ি টানলে উল্টে ফেলতে কতক্ষণ?' সব কিছুতে ভয় করত বড়দি, বাদুড়কে, লাল-চোখওয়ালা মানুষকে—মাতাল নয় তো!—আরসুলাকে।

বড়দা ছিল ঠিক তেমনি ডানপিটে আর সাহসী। সকলের সঙ্গে সর্বদা তার মস্করা। বড়দি হয়তো স্কুলে যাবার আগে, স্নানটান করে পিঁড়ি পেতে চাট্টি খেতে বসেছে, বড়দা একটু ইদিক-উদিক তাকিয়ে বলত—'ডুলির নিচে লালচে ওটা কি?' অমনি বড়দির খাওয়া মাথায় উঠত, 'অ্যাঁ! আরসুলা নয় তো?' এই বলে উঠে পড়ত।

ওদের কথা বলে বলে মা শেষ করতে পারতেন না। জাত-গোপ্নে ছিল নাকি বড়দা, ছোটবেলা থেকে মুখে মুখে মা'দের কত গল্পই যে বলত তার ঠিক নেই। কেমন করে একটা ছেলে অন্ধকারে বসে বইয়ের পাতা প্রায় মুখস্থ করে ফেলে পরদিন ক্লাসে কিছুই বলতে পারে না। ব্যাপার কি, না, অন্ধকারে ভুল করে বেচারা বইয়ের গোড়ার শূন্য পাতাটাকেই যত্ন করে মুখস্থ করে রেখেছে, তা পড়া বলবে কি?

বড়দা আসছে, সেই আনন্দে মার পুরনো গল্পগুলোকে আরেকবার

Scanned by CamScanner

মনে পড়ে গেল। আমরা তখনো বড়দাকে চোখে দেখি নি, একেবারে দেখি নি যে ঠিক তা নয়, কারণ ওদের বাইশ নম্বর সুকিয়া স্ট্রীটের ভাড়া বাড়িতেই আমাদের জন্ম, তবে জ্ঞানচক্ষু ফোটার আগেই অন্য জায়গায় চলে এসেছি। পাঁচ বছর বয়সে যখন একবার কলকাতায় গিয়েছিলাম বড়দা তখন বিলেতে একথা তো আগেই বলেছি, তবু যেন তাকে বড় চেনা মনে হত। প্রতি মাসের গোড়ায় 'সন্দেশ' পত্রিকার জন্য আগ্রহে আকুল হয়ে অপেক্ষা করতাম। 'সন্দেশ' এলেই আগেই শেষের দিকের পাতা-গুলো দেখতাম, এবার কি আবোল-তাবোল কবিতা লিখল বড়দা, কি অপরূপ ছবি আঁকল! বড়দাকে দেখি নি, একথা একবারও মনে হত না।

অবশেষে সেই বহু প্রত্যাশিত দিনটি এল। সকাল থেকে মার কাছে আরো কত গল্প শুনলাম। সেই আগের যুগের স্বদেশীয়ানার গল্প, তখনি লোকে বিলাতি জিনিস বর্জনের কথা ভাবছে। দিশি জিনিস কিনতে হবে, কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, দিশি জিনিস পাওয়া যাচ্ছে কোথায়? ভালো জিনিস তো নয়ই, মন্দ জিনিসও খুঁজে আনতে হয়। বড়দার মেজ ভাই মণিদা, যার ভালো নাম সুবিনয়, সে ছিল দিশি জিনিস খুঁজে বের করার পাণ্ডা!

কোত্থেকে সব খেরোর মতো মোটা খড়খড়ে কাপড়, ত্যাড়া-বাঁকা পেয়াল পিরিচ এনে দিত। পেয়ালাগুলোতে আবার চা ঢালার সঙ্গে সঙ্গে খেয়ে নিতে হত, নয়তো সোঁ সোঁ করে অর্ধেক চা-ই পেয়ালাতে শুষে নিত। বাড়িসুদ্ধ সবাই এইসব জিনিস ব্যবহার করত, বড়দাও করত, অবিশ্যি এই নিয়ে একটা গান না লিখেই বা সে করে কি! গানটিতে সুর দিয়ে মণিদার কানে কানে গাওয়া হত; সবটা আমার মনে নেই, এ গান তো আর কেউ ছাপে নি, যেটুকু মনে আছে সেটুকুই দিচ্ছি ঃ—

'আমরা দিশী পাগলার দল,
দেশের জন্য ভেবে ভেবে হয়েছি পাগল!'

তারপর এক জায়গায় দিশি জিনিসের কথা আছে,

'দেখতে খারাপ, টিকবে কম, দামটা একটু বেশি,
তা হোক্ না, তাতে দেশেরই মঙ্গল!
আমরা দিশী পাগলার দল!'

Scanned by CamScanner

ওদের আনতে আমরা বাড়িসুদ্ধ সবাই মোটর টার্মিনাসে গেলাম। ওদের সঙ্গে আরো কেউ কেউ ছিলেন, তাঁদের মধ্যে বড়দার ছোট শ্যালক টুটুদার কথা বেশ মনে পড়ে। ওখানে ওদের আরো কয়েকজন আত্মীয়-স্বজন থাকতেন। টুটুদা তার কাকার বাড়িতে রাতে শুত বটে, কিন্তু দিনের বেলায় যেদিন যার বাড়িতে ভালো মাছ আসত, তার বাড়িতে খেত। ওর বুদ্ধি দেখে আমরা মনে মনে ওর ভারি ভক্ত হয়ে উঠেছিলাম।

তখন বিকেলবেলা, পড়ন্ত রোদে, বৌঠানকে বড় সুন্দর লেগেছিল। পরনে ঢাকাই শাড়ি, গলায় লম্বা মটরমালা, শ্যামলা রঙের উপর অমন সুন্দর মুখ কখনো দেখেছি বলে মনে পড়ল না। মুগ্ধ হয়ে গেলাম আমরা দুই বোনে। এই ক'দিনে বাড়িটাকে মা আনন্দের আতিশয্যে উল্টে ফেলেছিলেন, কি খাওয়াবেন, কোথায় বসাবেন, কোথায় শোয়াবেন ভেবে কূল পান না। পুবের বড় শোবার ঘরে বড়দাদার জন্য জায়গা হল, বাড়ির সব চাইতে ভালো আসবাব সব সেখানে জমা করা হল। নানকুদাও ছিল, কিন্তু সে তো ঘরের লোক, ভাইদের সঙ্গে যা হয় একটা ব্যবস্থা হয়েই গেল।

মনে পড়ে বাড়ি পৌঁছে ওদের নিস্তার দিই নি, ওদের শোবার ঘরে ভিড় করেছিলাম, বকে-ঝকে আমাদের তাড়াতে হয়েছিল। পরে হাতমুখ ধুয়ে কাপড়চোপড় বদলে চা-জলখাবার খেয়ে বৌঠান আমাদের ঘরে ডাকলেন ; বাক্স খুলে সকলের জন্য নানারকম উপহার বের করলেন। ছবির বই, গল্পের বই, ছবি আঁকার সরঞ্জাম—সবাই অল্পবিস্তর ছবি আঁকি, দাদা তো খুব ভালোই আঁকে—খেলার রেলগাড়ি ; তাই লাইন, সিগ্‌নেল, স্টেশন, এ-বি-সি-শেখার খেলনা; দিদির জন্য নক্সা-তোলা নিকেল সিল-ভারের বাক্স, তাতে সত্যি করে চাবি দেওয়া যায়; আমার জন্য চ্যাপটা-কার্ডবোর্ডের বাক্সভরা কত রঙের কাঁচের পুঁতি-মুক্তো, ভোঁতা ছুঁচ, রঙিন সুতো—এমন জিনিস কেউ আমাকে কখনো দেয় নি। কত বছর যে যত্ন করে বাক্সটাকে রেখেছিলাম তার ঠিক নেই।

এক মাস ধরে আমাদের বাড়িতে মহোচ্ছব লেগে রইল। রোজ মাছ আসত; অথচ ওখানে সেকালে রোজ মাছ পাওয়া যেত না, সপ্তাহে দু'দিন

Scanned by CamScanner

হাট বসত, মাছ আসত, দু'দিন ধরে খাওয়া হত। এখন মোটর টার্মিনাসে বলে রোজ পাহাড়তলি থেকে মাছের ব্যবস্থা করা হয়েছে। রুই, কাতলা, কালবাউস, চিংড়ি। আমাদেরো পোয়াবারো!

বড়দা বৌঠানকে শহরসুদ্ধ লোকের সঙ্গে ভাগ করে নিতে হত। রোজই তাদের নেমন্তন্ন থাকত, তবু রাতে বাড়িতে শুত, দিনেও যখন তখন পাওয়া যেত, সেই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। বৌঠান ঢাকার মেয়ে, রন্ধনে দ্রৌপদী আর গানের গলাটি একবার শুনলে ভোলা যেত না, যেন রুপোর বাঁশিতে সুর কুলকুল করছে। যা করত, তাই ভালো করে করত; সেলাই-ফোঁড়াই সূক্ষ্ম কারুকার্য বৌঠানের মতো কম মেয়েই পারত। অন্য লোকেও দায়সারা কাজ দিয়ে বৌঠানের কাছে পার পেত না। অনেক দিন পরে এই গুণটির আরো ভালো পরিচয় পেয়েছিলাম।

তখন আমার বছর বারো বয়স, কলকাতায় এসেছি, একশো নম্বর গড়পারে ইউ. রায় এন্ড সন্সের বাড়িতে উঠেছি। জ্যাঠাইমা বিধবা মানুষ, বড় বৌঠান আর মেজ বৌঠান পালা করে নিরামিষ রাঁধে ঃ মা আমাকে একদিন রান্না শেখার জন্য বড় বৌঠানের সঙ্গে ভিড়িয়ে দিলেন; আধ ঘণ্টার মধ্যে ঘেমে নেয়ে উঠলাম; প্রত্যেকটি কাজ নিখুঁত হওয়া চাই; রান্না শেষ করে, বাসনপত্র যথাস্থানে বের করে দিয়ে খাবার জিনিসগুলি ঢাকা দিয়ে তুলে, তবে ছুটি। ভালো কাজের আদর জানত বড় বৌঠান।

স্যার কে জি গুপ্তর ভাগ্নী ছিল বড় বৌঠান, নামকরা রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়িকা কনক দাসের দিদি। সুখে দুঃখে অবিচলিত থাকতে দেখেছি তাকে, কর্তব্যের পথ থেকে এক পা বিচ্যুত হত না কখনো। অনেক দুঃখ দিয়েছিলেন ভগবান তাকে, অনেক সুখও দিয়েছিলেন; অসাধারণ স্বামীর স্ত্রী, অসাধারণ ছেলের মা, আমার বড় বৌঠান নিজেও কম অসাধারণ ছিল না।

অনেকদিন আগের কথা মনে করতে গেলে, সেসব স্মৃতির উপরে পরবর্তী ঘটনার ছায়া কেবলি পড়ে। তবু একেকটা উজ্জ্বল দিন মনের মধ্যে চিরকাল অম্লান হয়ে জমা থাকে। পরীতলায় একটা বড় চড়িভাতির

Scanned by CamScanner

কথা মনে পড়ে ; বড় বৌঠানের কোনো ধনী নিকট-আত্মীয়ের আয়োজন, সে এক এলাহি ব্যাপার।

আমাদের জীবনযাত্রা ছিল বড় সাদাসিধে, বাড়িতে মাংস হলে ছোট-খাটো আনন্দের ঢেউ উঠত, আর সাহেব দোকানের কেক-প্যাটিস হলে তো কথাই নেই। সেদিন পরীতলায় গিয়ে দেখি তার চেহারা গেছে বদলে। লম্বা লম্বা সরলগাছের নিচে বড় বড় গালচে পাতা। একটা খোলা জায়গায় নক্সাকাটা সামিয়ানা ; সাদা পোশাক পরা বেয়ারারা বিচিত্র জলখাবার দিচ্ছে, কত রকম সিঙ্গাড়া কচুরি মণ্ডা মেঠাই আর বিশাল একটা চকোলেট দিয়ে মোড়া কেক! এ হল সকালের জলখাবার, অন্য-ধারে বড় বড় হাঁড়িতে দুপুরের ভোজের আয়োজন হচ্ছে।

ব্যাপারটা যেন সত্যিকার নয়, 'স্বদেশে' পড়া কোন গল্প থেকে নেওয়া। জলযোগের পর গাছতলায় বসে বড়দা 'শব্দকল্পদ্রুম' পড়ল। যাঁরা সে নাটক পড়েন নি, তাঁরা একটা বড় আনন্দ থেকে নিজেদের বঞ্চিত করেছেন, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। পরীতলার সেই সুন্দর সকালটি, সেই গাছতলার শিরশিরে হাওয়া, সেই পাহাড়ে নদীর কুলকুল শব্দ আর একদল লোকের মাঝখানে বড়দার সেই অপূর্ব কণ্ঠে রসের নাটক পড়া, এর কোনো কিছুরই ক্ষয় নেই, লয় নেই। ওখানকার লোকে এমন জিনিস নিশ্চয় কখনো কল্পনাও করতে পারত না। আমাদের কথা তো ছেড়েই দিলাম, রচনার অর্ধেক রস তখন আমাদের মতো মুখ্যুদের বোঝার বাইরে, কিন্তু সে রস পরিবেশনের রসটি এখনো কানে লেগে আছে। যে ভূমিকা পড়ে বড়দা, তক্ষুনি যেন সেই চরিত্রটি বনে যায়; কিন্তু এত সহজ ভাবে এত স্বাভাবিক ভাবে যে একটুও অদ্ভুত লাগে না।

বড়দার সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত যথেষ্ট লেখাও হল না, বলাও হল না, তার একটা জীবনী পর্যন্ত রচিত হয় নি। তাকে যারা চোখে দেখেছিল, তার সঙ্গে মিশেছিল, কথা বলেছিল, তাদের সংখ্যাও ক্রমে কমে আসছে। লোকে যখন সত্যজিৎ রায়ের বাবা বলে তার পরিচয় দেয়, হাসিও পায় কান্নাও পায়। অমন বাপ নইলে কি আর অমন ছেলে হয়! যেমন গাছটি, তেমনি তার ফলটিও।

Scanned by CamScanner

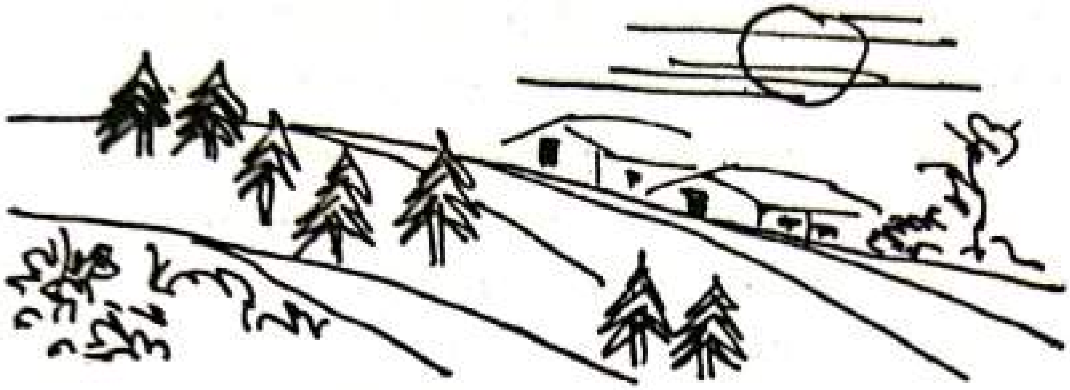

॥ সাত ॥

মা'র কাছে শুনেছি আমার দাদামশাই রাজকুমার বিদ্যারত্ন পরম পণ্ডিত হলেও, দিদিমা বিশেষ লেখাপড়া জানতেন না, বাংলা লিখতে পড়তে পারতেন, এইমাত্র। তাঁর নাম ছিল জ্ঞানদা দেবী, নাকি ভারি সুন্দরী ছিলেন, পাতলা ছিপছিপে গড়ন, দুধে-আলতা রঙ আর হাঁটু অবধি কালো ঢেউ খেলানো চুল। যখন তিনি মারা যান, বয়স সবে ছাব্বিশ হয়েছিল।

তাঁর মৃত্যুর পর যাঁরা বাড়িঘর খালি করে ছোট সংসারটিকে তুলে দিতে এসেছিলেন, তাঁরা আশ্চর্য হয়ে দেখেছিলেন, রান্নাঘরের দেয়ালে, বাসনমাজার জায়গায়, যেখানে সেখানে কাঠকয়লা দিয়ে দেয়ালে লেখা 'বয়সেতে বড় নয়, বড় হয় জ্ঞানে।' এ গল্প মা যে কতবার আমাদের কাছে বলেছিলেন তার ঠিক নেই। মা কেবল বলতেন—জমিজমা ধন-দৌলত কিছু নয়, জ্ঞানই সব। রূপও কিছু নয়, ভালো কাপড় গহনাও কিছু নয়, এক কণা বিদ্যার কাছে।

ওখানকার সাদাসিধে সমাজ ব্যবস্থার হিসাবে বাবাকে সবাই বড় সরকারি চাকরে বলত, অনেকের তুলনায় রোজগার ভালোই ছিল। জরিপ আপিসের কাছে যেখানে আমরা কয়টি পরিবার, নিতান্ত নিকট-আত্মীয়ের মতো পরস্পরের বড় কাছাকাছি থাকতাম, সেটা আসলে ছিল ওখানকার সাহেবপাড়ার মধ্যে। কালের গুণেই হোক কি যে কারণেই হোক, আমরা কিন্তু এসব বিষয়ে আদৌ সচেতন ছিলাম না। তখনকার দিনে অধিকাংশ সর্বোচ্চ পদ সাহেবরা অলঙ্কৃত করতেন; তাঁদের সঙ্গে আমাদের কোনো সামাজিক আদান-প্রদান ছিল না। আর ছিলেন কয়েক ঘর আই-সি-এস্, তাঁদের নিজেদের একটা আলাদা সমাজ ছিল। সেখানে

Scanned by CamScanner

প্রবেশ পেতে, বাঙালি হলে অন্তত আই-সি-এস্ হওয়া চাই, তবে সাহেব-দের কথা আলাদা, তারা জজের পেজের ভাই-ভেজ হলেও চলত।

আমার মা-বাবা এদের নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। মাকে কখনো সাজ-গোজ করতে দেখি নি, সর্বদা সাদা সুতির শাড়ি পরতেন, অবিশ্যি দু-তিনখানা গরদও যে ছিল না তা নয়। একটি ছিল লালপেড়ে, সেটি পরে মা মন্দিরে যেতেন। আমাদের চোখে তখন মাকে এত সুন্দর লাগত যে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতাম। আমার মেজ ভাই কল্যাণ মাঝে মাঝে মা'র কাপড়ে নাক ঘষত আর বলত, 'মা-মা গন্ধ পাই!'

আরেকখানি গরদ ছিল মা'র, সেটি ছাই রঙের, সেটি ওঁর পোশাকী কাপড়। যখন চীফ কমিশনারের বাড়িতে সরকারি অফিসারদের চায়ে নেমন্তন্ন হত, মা সর্বদা ঐ গরদটি পরে যেতেন। একবারও তাঁর মনে হত না যে লোকে ভাববে ঐ ছাড়া বুঝি ওঁর আর কাপড় নেই। মনে হলেও নিশ্চয় ওঁর একটু হাসি পেত, আর কিছু হত না।

মাকে তখন খুব সুন্দর দেখতে লাগত। ফুটফুটে ফরসা রং, রেশমের মতো নরম ঘন কালো চুল, ফুলের মতো হাত দুখানি। গয়নাগাঁটির বিশেষ বালাই ছিল না, কয়েকগাছি চুড়ি, আঙুলে প্লেন সোনার বিয়ের আংটি, গলায় একটা সরু দড়ির মতো চেন তাতে একটা ছোট্ট লকেট, দু কানে স্ক্রু দিয়ে আঁটা ছোট দুটি মুক্তো। ব্যস, মা চললেন লাটসাহেবের বাড়িতে, বাবার সঙ্গে পায়ে হেঁটে । অবিশ্যি পায়ে হেঁটে সবাই যেত, মেমরা হাতে নিত নানারকম শৌখিন ছাতা, লাল-নীল রেশমের, লেসের, রুপোর হাতল দেওয়া। মা'র ওসব কিছু ছিল না।

তবে মা'র বাক্সের মধ্যে কয়েকটা হীরের গয়নাও ছিল, বিয়ের সময় বাবা দিয়েছিলেন ; অনাথ মেয়েকে স্বামী ছাড়া আবার কে হীরের গয়না দেবে? বাবা নিজে নকশা করে হীরে-মুক্তোর সরু নেকলেস গড়িয়ে দিয়ে-ছিলেন, কানের জন্য ছোট দুটি হীরের ফুল, একটা হীরের আংটি। এসব মাকে বিশেষ পরতে দেখি নি। বোধ হয় আমাদের জন্য তুলে রাখতেন। দুঃখের বিষয় নেকলেসটি বাদে আর সব একদিন চুরি হয়ে গেল। দরজা খুলে ওখানে সবাই বেড়াতে বেরিয়ে যেত, টুপ করে এসে বাক্সসুদ্ধু

Scanned by CamScanner

নিয়ে গেলেই হত। গেল তো গেল, পাওয়া গেল না।

তার জন্য মা যে খুব কাতর হলেন তাও নয়। একটু দুঃখ করলেন যে ঐ সঙ্গে দিদির আমার ছোট ছোট ক'গাছি সোনার চুড়িও গেল বলে। ফ্যাশানেব্‌ল্‌ লোক ছাড়া সে-সময় বোধ হয় কেউই বেশি সাজত না। তারি মধ্যে আমাদের বন্ধু হরিচরণের মা একটু শৌখিন ছিলেন, দেখতেও ছিলেন একটি গোলাপ ফুলের মতো। দিদি আমি ওঁদের বাড়িতে গিয়ে ওঁর সুন্দর চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকতাম। ভারি ইচ্ছা হত মা-ও ঐরকম রঙিন রেশমি শাড়ি পরেন। মা'র বয়স তখন বত্রিশ-তেত্রিশ হবে, নিজেকে বেশ আধবয়সী মনে করতেন। ফ্যাশানেব্‌ল্‌ হব কোত্থেকে? একবার মনে আছে আমরা বাবার আপিসের প্রফুল্ল কাকাবাবুর বাড়িতে গিয়ে খুড়িমার সক্রিয় সহযোগিতার সঙ্গে মনের আনন্দে দু গালে ওটিন ক্রিম মেখেছিলাম। বাড়ি ফিরতেই বাবার নাকে বিজাতীয় গন্ধ গেল, অমনি আমাদের দু'জনকে সারি সারি দাঁড় করিয়ে ঠাস্‌ ঠাস্‌ চপেটাঘাত, এবং খুব আস্তেও নয়।

একবার চীফ কমিশনারের বাড়িতে চা-পার্টিতে গিয়ে বাবা অবাক হয়ে দেখেন টেবিল-উপরের রুপোর বাসন থেকে মা মাঝে মাঝেই একটা দুটি দামী চকোলেট তুলে নিচ্ছেন, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন সেগুলি না খেয়ে রুমালে জড়াচ্ছেন। বাবার তো চক্ষুস্থির! মা'র দিকে একটু গম্ভীর মুখে তাকাতেই মা লজ্জিত হয়ে চকোলেট সংগ্রহ করা থেকে বিরত হলেন। বাড়ি ফেরার সময় বাবা সোজা পথ না ধরে, একটু ঘুরে গেলেন। কোনো কথা না বলে সেদিন আমার রাগী কড়া বাবা ইটালিয়ান সাহেবের কেকের দোকানে গিয়ে, মা'র দু হাত ও নিজের দু'হাত ভরে কেকের ও দামী দামী চকোলেটের বাক্স কিনলেন। কেন যে মা প্রাণ গেলেও চকোলেট খেতে পাচ্ছিলেন না, কাদের জন্য যে সেগুলি সরাচ্ছিলেন, বাবার সেটা অজানা ছিল না।

এদিকে ঝি-চাকরদের কাছে আমরা তিন রকম গল্প শুনতাম, (১) ভূতের গল্প (২) খুনে-ডাকাতের গল্প (৩) হিংস্র জানোয়ারের গল্প—কাজেই রাতে কারো ফিরতে দেরি হলে ভাবনার অন্ত ছিল না। এক নম্বরের গল্প

Scanned by CamScanner

গাছ, এত প্রিয় নদী বন পাহাড়, সব কিছু ছেড়ে যাবার কথা ভেবেও আমরা বিয়োগ-ব্যথায় কাতর হলাম না। কি করে হব? মা তো সঙ্গে যাচ্ছেন। যেখানেই যাই না কেন, অন্য বাড়ি ভাড়া নিয়ে, ঠিক এমনি আরামে, এমনি নিরাপদে নিশ্চিন্তে মা'র সঙ্গে আমরা থাকব, তবে আবার ভাবনা কিসের? সেখানেও মা এমনি করে ফুলের গাছ লাগাবেন সন্দেহ নেই। তরকারির বাগান হবে, কালামানিকের আস্তাবল হবে। আমাদের ভুঁইচাপা গাছটিকে অবিশ্যি নিয়ে যেতে হবে। ও গাছ তো এ দেশে হয় না, বাবা শ্যামদেশের ঘোর জঙ্গলে জরিপের কাজ করতে করতে একদিন আশ্চর্য একটা সুগন্ধ পেলেন। খুঁজে দেখেন মস্ত একটা গাছের গোড়ায় একেবারে মাটির সঙ্গে লেগে রয়েছে যেন কতকগুলি মোমের ফুল, সাদা ধব্‌ধবে, তাতে একটু বেগ্‌নি দাগ কাটা, তারি গন্ধে চারদিক ভুরভুর করছে।

বাবা ফুলসুদ্ধ গাছের শিকড় তুলে আনলেন। আদার মতো কয়েকটা বাল্‌ব্‌, ডাঁটা বোঁটার বালাই নেই, শিকড় থেকেই ঠেলে উঠেছে ভুঁইচাপা ফুল। শীতের সময় মনে হয় মরে গেছে, মাটির ওপরে কিছু দেখা যায় না; বসন্তকালে আবার ফুলের কুঁড়ি মাটি ঠেলে বেরোয়। ভুঁইচাঁপা গাছটিকে ফেলে যাওয়া যায় না।

শেষ পর্যন্ত অবিশ্যি বাবার যুদ্ধে যাওয়া হলই না। কি বিরক্ত বাবা! মুখখানা হাঁড়ি করে চায়ের টেবিলে খবরটা দিলেন। মুখ দেখেই আমরা ভয়ে কাঠ! রেগেমেগে বলতে লাগলেন, 'বেয়াল্লিশ বছর বয়স হয়েছে তো কি হয়েছে? বেয়াল্লিশ বছর বয়সের লোকেরা যুদ্ধ করতে পারে না?'

'না হয় দুবার ঠ্যাং, একবার হাতের দুটো আঙুল, একবার কনুই, আর একবার কাঁধই ভেঙেছিল, তাই কি? যারা খেলাধুলো করে, ঘোড়ায় চড়ে, তাদের অমন একটু আধটু হবে না? একবার ক্রিকেট বল লেগে সামনের দুটো দাঁতই তো উড়ে গেল, তাতে কি এমন অসুবিধেটা হল শুনি?'

বলতে বলতে হঠাৎ বাবা হো হো করে হেসে উঠলেন। 'ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ফাইনেল ইয়ারে যখন কাঁধের হাড়টা ভাঙল, মেডিকেল

Scanned by CamScanner

কলেজের সাহেব সার্জন বলল, 'বাঃ, বছরে বছরে দেখছি নতুন নতুন খেল দেখাচ্ছ! বাকি আছে তো শুধু ঘাড়টা: আসছে বছর ঐটি মটকে শেষ করবে নাকি? অবিশ্যি সেটি হবার আগেই ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ছেড়ে সার্ভে অফ ইন্ডিয়াতে ঢুকে পড়লাম।'

তখুনি মেঘটা কেটে গেল, বাবাকে ছেঁকে ধরলাম, 'তোমার আর ছোট জ্যাঠামশাইয়ের ডানপিটেমির গল্প বল।'

বাবাও অমনি শুরু করলেন, 'ধনদা একবার একটা গোখরো সাপকে তাড়া করেছিল। সাপটা পালাবার পথ পায় না, কোনোমতে গিয়ে একটা গর্তে সেঁধোল আর ধনদাও লাফিয়ে পড়ে ল্যাজটা ধরে ফেলল। তারপর সে কি টান, কিছুতেই সাপটা কিন্তু বেরুল না, ল্যাজটার খানিকটা ছিড়ে এল।'

সাময়িক উত্তেজনা কেটে গিয়ে আবার সেই পুরনো আনন্দের সুরে জীবনযাত্রা বয়ে চলল। ছোট বোনটা ক্রমে হামা দিতে শুরু করল, ধরে ধরে উঠে দাঁড়াল, টলে টলে হাঁটতে লাগল, মুখে আধো আধো বুলি ফুটল। তার উপরে আমার ভারি ন্যাওটা হয়ে উঠল। সে আরেক জ্বালা: একেবারে ছাড়তে চাইত না। স্কুলে যাবার সময় লুকিয়ে পালিয়ে যেতে হত। ফিরবার সময় তাড়াতাড়ি পা চালাতাম, বাড়িতে যে দুটো নীল ছায়া লাগা চোখ আর দুটো নরম নরম বাহু আমার জন্যে অপেক্ষা করত। সেই দশ বছর বয়স থেকেই বুঝতে শুরু করলাম ভালোবাসার বড় জ্বালা!

ওর চেয়ে দু বছরের বড় যতি ছিল যেমনি সুন্দর তেমনি দুর্বল। একটা ঠাণ্ডা লাগলেই বুকে সর্দি বসত, ওর জন্য পথ্যি আসত, ডাক্তার আসত, ওষুধ আসত। স্টোভে গরম জলের কেতলি বসিয়ে, তাতে ইউক্যালিপটাসের তেল ঢেলে ওর মুখে তার ভাপ দেওয়া হত। সেকালের চিকিৎসার হাঙ্গামা ছিল যথেষ্ট, আবার ফলপ্রদও ছিল বেশি।

যতির চেয়ে তিন বছরের বড় সরোজকে নিয়ে নানারকম সমস্যা হত। একবার আমাদের পুতুলঘরের রান্নাবাড়ির মধ্যিখানে এসে বসে পড়ল, আর নড়ে না। দিদি আর আমি কতরকম লোভ দেখিয়ে, ভয় দেখিয়ে কিছুতেই আর তাড়াতে পারি না! এদিকে পুতুল বেচারীদের রান্নাখাওয়া

Scanned by CamScanner

বন্ধ, তাদের কষ্ট চোখে দেখা যায় না। অগত্যা সরোজকে কোলপাঁজা করে তুলে দেওয়া হল। রাগে ফোঁসফোঁস করতে করতে চলে গেল। একটু পরেই ফিরে এসে একটা ছোট্ট পাথরের কুচি দেখিয়ে আমাদের শাসাতে লাগল—'যদি পুতুলের ঘরে বসতে না দাও, থা'লে (সরোজ "তা হলে'কে বলত থা'লে", মাকড়সাকে বলত "বিকান্ত পোকা") এই পাথল্‌টাকে আমার নাকে ঢুকেও দেব।' শুনে আমরা চটে কাঁই।—'যা পালা, ঢোকা গে নাকে!'

খানিক বাদে আবার এসে বলল, 'ঢুকে দিয়েওছি।' আমরা পুতুলের সংসারে মশগুল, বললাম, 'বেশ করেছিস্, এখন পালা দেখি।'

সেদিন থেকে সরোজ আর ঘুমোয় না, রাতে মনে হয় বুকে কিসে চেপে ধরেছে, নিঃশ্বাস ফেলতে পারে না, গোঙাতে গোঙাতে উঠে বসে। তখন আমাদের পাথল্‌ ঢোকানোর কথা মনে পড়ল। তারপর ডাক্তার, সিভিল সার্জন, ক্লোরোফর্ম এবং অস্ত্র দিয়ে নাকের অনেক ভিতর থেকে রক্তমাখা পাথরের টুকরো বের করা!

কিন্তু ঐ ছোট মেয়েটা কারো কোনো অসুবিধে করত না, যা দেওয়া যেত খেয়ে নিত, যা বলতাম তাই করত, একটু আদর করলেই গলে জল হয়ে যেত। শুধু অসুবিধা ছিল যে আমার ফ্রকের কোণা শক্ত করে পাক্‌ড়ে ধরে; যেখানে যেতাম সঙ্গে যেত ; জোর করে ছাড়িয়ে নিলে দু'চোখ জলে ভরে যেত। সে এক মহা জ্বালা! কাছে গেলেই 'ছোদ্দি' বলে কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ত!

অবসর হলে সবাই মিলে জটলা পাকাতাম, বাইরের কারো অভাব টের পেতাম না। মাসি গেলেন চলে মেয়ে নিয়ে, রাতে আমার পা কামড়ালে কে টিপে দেয় তার ঠিক নেই ; বড়দারাও কলকাতায় চলে গেল; আরো আত্মীয়স্বজন আসত যেত; যতদিন থাকত খুব ভালো লাগত, কিন্তু চলে গেলে আর তাদের কথা মনে হত না। পুকুর থেকে এক ঘটি জল তুলে নিয়ে ফেলে দিলে যেমন তার অভাব টের পাওয়া যায় না, অমনি চার পাশ থেকে রাশি রাশি জল এসে ঘাটতিটুকু ভরে দেয়, এও যেন তাই।

Scanned by CamScanner

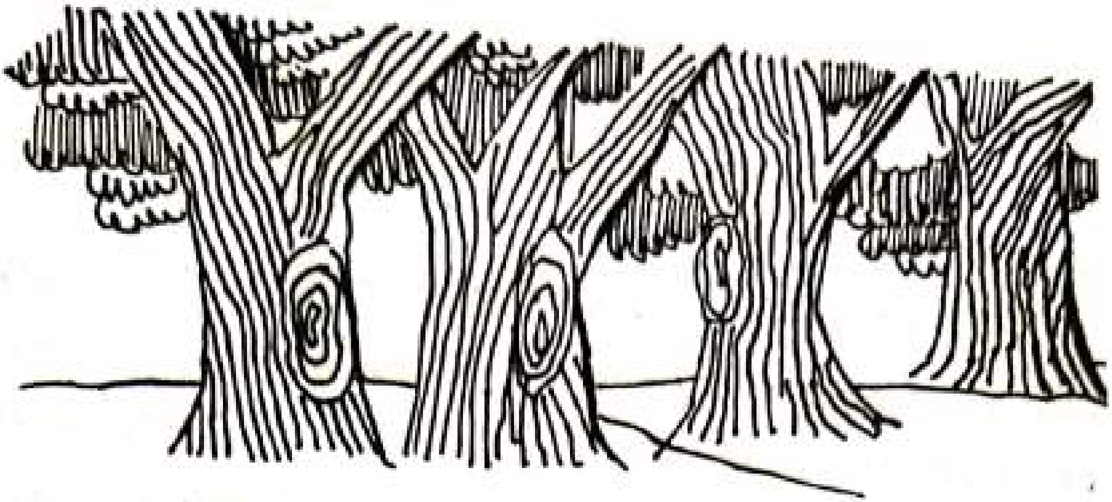

॥ আট ॥

চীনদেশে একটা পুরনো প্রবাদ আছে ঃ 'পূর্ণিমার ঠিক পরমুহূর্তেই চাঁদের ক্ষয় শুরু হয়।' আমাদের পাহাড়ের নিটোল সুন্দর জীবনেরও তাই হল। কোথাও একটু খাদ ছিল না, ফাঁক ছিল না। অমনি ভাঙন ধরল। ছোট ছোট কাজ দিয়ে, খেলা দিয়ে, অকারণ হাসিকান্না দিয়ে দিনগুলো ভরাট করা ছিল। ছুটির দিনে রান্না শিখতাম মা'র কাছে, দিদি আর আমি। বঁটি পেতে বসে নিজেরা তরকারি কুটতাম, আঙুল কাটলে মা বিনা আড়ম্বরে আইডিন লাগিয়ে দিতেন। সেসব বঁটি আজকাল দেখি না, মা'র বিয়ের সময়ে কেনা, ময়মনসিংয়ে গড়া, একটুকরো শক্ত পেটানো লোহা থেকে তার ফলা হয়েছে, চ্যাপটা গা হয়েছে, পায়া দুটি হয়েছে, কোথাও জোড়া নেই। তলায় কারিগরের নামের আদ্যক্ষর খোদাই করা থাকত। দু-তিন পুরুষ ধরে স্বচ্ছন্দে সে বঁটির ব্যবহার চলত। শুধু মাছ-মাংস রান্নাই শিখতাম না, তেতো ছেঁচকি ঘণ্ট কিছু বাদ যেত না।

একবার বড়ি দিয়ে ঝিঙের ঝোল রেঁধেছি, খেয়ে বাড়িসুদ্ধ সবাই বললে, থু-থু, বিষ তেতো! খালি আমার বাবা খেয়ে বললেন, 'ঝিঙে তেতো হলেও রান্না ভাল হয়েছে, দে তো আরেকটু।' সে কথা এখনো মনে আছে। কত সময় আমাদের সবজিবাগান থেকে তরকারি তুলে এনেছি, তখুনি রান্নাও হয়েছে। মালি অনেকখানি জায়গা জুড়ে আলুর চাষ করত। একটা করে বীজের আলুতে চারটে করে 'চোখ' বেরোত; মালিও আলুটাকে চার ভাগে কেটে চার জায়গায় লাগাত। দেখতে

Scanned by CamScanner

দেখতে চারটি নলনলে আলুগাছ বেরোত, গাছ বড় হত, আলু তৈরি হত, শেষে একদিন উপড়ে দেখি একেকটা গাছে কুড়ি-বাইশটা নিটোল আলু। দেখে অবাক হই, একটা আলু থেকে কি করে আশি-পঁচাশিটা আলু হয়।

পূজার ছুটি হত মাত্র সাত দিন। আমাদের বাড়ির পিছনের ছোট নদীর এক জায়গায় জল বেশ গভীর, সেইখানে দু'একটি ঠাকুরভাসান হত। আমরা কাঁটা তারের বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম। মাঝে মাঝে অত বড় ঠাকুর অতটুকু নদীতে কিছুতেই ডুবতে চাইত না, তখন তাকে চেপে ধরে জোর করে ডোবানো হত। আমাদের ভারি কষ্ট হত। কতদিন পরেও দেখতাম স্বচ্ছ জলের নিচে খড়ের হাত-পা মেলে ঠাকুর বেচারি পড়ে আছে, রঙ-রাংতা ধুয়ে গেছে, সোলার ফুল ভেসে গেছে।

কালামানিক ছিল আমাদের প্রাণের প্রাণ, তাকে ছেড়ে থাকার কথা ভাবতেও পারতাম না। সে করকচ নুন খেতে ভালবাসত। বাবা মাঝে মাঝে লাউপাতায় করে তাকে নুন খাওয়াতেন, আমরা ঘিরে দাঁড়িয়ে দেখতাম; ইচ্ছে হত আমরাও খাওয়াই, কিন্তু বলতে সাহস হত না, তা-ছাড়া বড় বড় চারকোণা দাঁতগুলো দেখে একটু ভয়ও করত। একদিন আমার মেজভাই কল্যাণ কেমন করে গুদোমঘর খোলা পেয়ে নিজের হাতে লেখার খাতার পাতায় করে একমুঠো করকচ নুন এনে হাজির করল। চুপি চুপি বলল, 'চল্ না ওকে খাইয়ে আসি।' যেমন বলা তেমনি কাজ। কল্যাণের হাত থেকে সোনাহেন মুখ করে কালামানিক নুনটুকু খেয়ে নিল। তার পরেই হল মুশকিল; কালামানিক কিছুতেই কাগজটি আর ছাড়ে না, শেষ পর্যন্ত সেটিকেও বাদ দিল না। আমরা দুজন সেখান থেকে হাওয়া; মনে মনে জানি কাজটা খুব ভালো হয় নি। কাজ যে ভালো হয় নি সেদিন বিকেলেই বোঝা গেল। বাবা আপিস থেকে আসতেই সহিস তাঁকে ডেকে নিয়ে গেল। ফিরে এসে বাবা মহা হাঁক-ডাক লাগালেন—কে কালামানিককে কাগজ খাইয়েছে, এখনো সেই কাগজ বেরুচ্ছে!! বলা বাহুল্য কল্যাণ আর আমি কালাবোবা! আসল ব্যাপার কেউ জানল না ; শেষ অবধি সাব্যস্ত হল, ও নিজেই ঘাসের

Scanned by CamScanner

সঙ্গো খেয়ে থাকবে!

এইরকম ছোট ছোট জিনিস দিয়ে জীবনটা ভরপুর হয়ে থাকত। তারি মধ্যে এর বাড়িতে ওর বাড়িতে বন্ধুবান্ধবদের জন্মদিনের উৎসব হত: সামান্য ব্যবস্থা, নতুন একটি জামা পরা, সবাই মিলে একসঙ্গো সাদাসিধে জলযোগ করা, আট-দশ আনার উপহার দেওয়া, কিন্তু তার আনন্দ কত!

তারই তলায় তলায় চিড় ধরেছে কে জানত? একদিন শুনলাম কাঞ্জিলালবাবুরা কলকাতায় চলে যাচ্ছেন, উনি পেন্‌সন্‌ নিয়েছেন। শুনে আমাদের চক্ষুস্থির। ওঁদের বাদ দিয়ে দিন কাটাচ্ছি, এ যে আমাদের চিন্তার বাইরে। ওঁদের দুই নাতি সতু আর দুখু যে আমাদের প্রাণের বন্ধু, ওঁদের বাড়িতে কথায় কথায় হরিরলুট হত ; ওঁদের বাড়ির প্রত্যেকটা ঘরের প্রত্যেকটা কোণ যে আমাদের বড় চেনা। বসবার ঘরের ভিতরের দরজায় নীল পুঁতির পর্দা ঝুলত। পুঁতির পর্দা আজকাল আর দেখা যায় না; দরজার ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত লম্বা লম্বা বড় বড় পুঁতির মালা ঝুলত, তাই দিয়ে পর্দা তৈরি হয়েছে। মাঝখান দিয়ে চলে গেলে টুং-টাং শব্দ করে মালাগুলো সরে যেত, মুখে গালে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা কাঁচের পুঁতির ছোঁয়া লাগত। সেরকম আর দেখি নি। মনে আছে দুখুর একবার গলায় পয়সা আটকেছিল, মুখ লাল হয়ে, চোখ ঠিকরে দুখু যায় আর কি! অমনি মিত্তিরখুড়িমা এসে ওর ঠ্যাং ধরে মাথাটা নিচের দিকে করে ঝুলিয়ে তুললেন, তারপর পশ্চাদভাগে সজোরে একটা চপেটাঘাট করতেই টুপ করে গলা থেকে পয়সাটা পড়ে গেল। সবাই হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। সেই কাঞ্জিলালবাবুরা চলে যাবেন আবার কি? কিন্তু সত্যি সত্যি একদিন গেলেন চলে তাঁরা। ও বাড়ির দিকে যেতে ইচ্ছে করত না ; বনবিভাগের কে একজন নতুন অফিসার এসে সেখানে উঠলেন।

ভাবতাম হয়তো ওঁরা আবার ফিরে আসবেন, আমাদের পাড়ার দলটি আবার সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে, যেমনি করে স্টিফেন সাহেবরা দেশে চলে গিয়ে আবার ফিরে এসেছিলেন। সেও এক মজার গল্প। বাঙালি পাড়ায় থাকতেন ওঁরা ; স্টিফেন সাহেব ছিলেন পাদ্রী, ঐখানে ছোট গির্জা ছিল,

ছোট ছেলেমেয়েদের স্কুল ছিল, বড় মেয়েরা হাতের কাজ শিখত, একটা ছোট ডিস্‌পেনসারিও ছিল, বিনি পয়সার সাহেব ওষুধ বিতরণ করতেন। সবাই তাঁদের বাপ-মা'র মতো ভালোবাসত ও শ্রদ্ধা করত। সারাজীবনই তাঁদের ঐখানে কেটেছিল ; দেশে ছেলেমেয়ে ছিল, তারাও ততদিন বড় হয়ে গেছে, সাহেব ও মেম বুড়ো হয়েছেন, এবার তাঁদের অবসর নেবার সময়। কিন্তু সারাজীবনের কর্মস্থল থেকে কি অবসর নিতে ইচ্ছা করে?

তবু শেষ পর্যন্ত সকলের পেড়াপিড়িতে রাজি হতে হল; বিলেতের গির্জা থেকে তাঁদের পেন্‌সনের ব্যবস্থা হয়ে গেল। জিনিসপত্র বিলিয়ে দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে একদিন তাঁরা চলে গেলেন। চলে গেলেন একেবারে বিলেতে। সবাই তাঁদের কথা বলত আর দুঃখ করত।

ওমা! বছর না ঘুরতে, দেশে টিঁকতে না পেরে স্টিফেন সাহেব আর তাঁর মেম আবার ফিরে এলেন। এসে ঐ বাড়িতেই আবার উঠলেন ; জিনিসপত্র বিলিয়ে দিয়েছিলেন; তাঁরা ফিরে আসতে আহ্লাদে আটখানা হয়ে, বন্ধুরা অনেকেই সেই সব জিনিস ফিরিয়ে এনে তাঁদের ঘরদোর সাজিয়ে দিলেন। জীবনের শেষ দিন অবধি তাঁরা ঐখানে সমানে কাজ করে গেছিলেন।

কিন্তু কাঞ্চিলালবাবুদের কাউকে আর কখনো দেখি নি। অনেক বছর পরে কে যেন একজন গোঁপওয়ালা ডাক্তারকে দেখিয়ে বলেছিল ঐ নাকি সতু, কিন্তু আমার বিশ্বাস হয় নি।

কাঞ্চিলালবাবুদের দিয়ে সব শুরু হল, তারপর শিউলি বেলিরা চলে গেল, একে একে আরো অনেকে গেল। দিদি আর আমি সে বছর পড়া নিয়ে মহাব্যস্ত, প্রিলিমিনারি কেম্ব্রিজ পরীক্ষা দিচ্ছি, পরীক্ষার কাগজ বিলেতে দেখা হবে ; অন্যদিকে মন দেবার অবকাশ নেই। তারি মধ্যে থেকে থেকে মনটা কেমন করত। হঠাৎ শুনলাম আমরাও ডিসেম্বর মাসে কলকাতা চলে যাব। বাবা কলকাতার হেড আপিসে বদলি হয়ে যাচ্ছেন। সত্যি কথা বলতে কি, খবরটা শুনে যত না দুঃখ হল, তার চেয়ে উৎসাহে উত্তেজনায় অধীর হয়ে উঠলাম ঢের বেশি। শীতকালে স্কুলের প্রায় তিন মাস ছুটি, কিন্তু বাবার ছুটি থাকত না ; তাছাড়া কলকাতায়

Scanned by CamScanner

এমন একটা আস্তানা ছিল না যেখানে আমরা দশজন মানুষ গিয়ে উঠি; আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে দশজন মিলে ওঠা যায় নাকি? বন্ধুরা অনেকে কুমিল্লা, ঢাকা, কক্সবাজার, কলকাতা যেত। ফিরে এসে এন্তার গল্প শোনাত; শুকনো কুল, বেত গোটা, পাটালি গুড় খাওয়াত। শুধু আমাদেরি যাওয়া হত না। সেই পাঁচ বছর বয়সে একবার গিয়েছিলাম, তাও মা'র অসুখ করেছিল বলে। কিন্তু—

ক্রমে ঐ কিন্তুটা বিশাল আকার নিতে লাগল। আমাদের চক্ষুস্থির। কলকাতায় যাব কি? তা হলে কাকমি মেডিলা, কাকমি ডোরেন ইত্যাদির কি হবে? তারা বললে, 'কেন আমরা কুলি-কাম করব। লোকের বাড়ি আর কাজ করব না।' ইল্‌বন আগেই এদের সঙ্গে ঝগড়া করে কাজ ছেড়ে চলে গেছিল। থুত্‌নি উঁচু করে গট্ গট্ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। আমরা বললাম, 'ও ইল্‌বন, হেড্রিক্সনের কাছে যেও। তারা খুশি হবে।' ইল্‌বন বলেছিল—'তারা আমাকে চেনে না, সেখানে যাব কেন? তোমাদের অত ভাবতে হবে না, আমার মতো কাজের লোককে সবাই খুশি হয়ে বেশি মাইনে দিয়ে লুফে নেবে।' এই বলে চলে গেল, একবারও ফিরে তাকাল না।

কিন্তু কালামানিক? মাকে আমরা বললাম, 'কালামানিক যাবে তো?'

মা তো অবাক! 'ও যাবে কি করে? কলকাতায় লোকের বাড়িতে এক হাতও জায়গা থাকে না। আমরা গিয়ে তোমাদের জ্যাঠামশায়ের বাড়িতে উঠে, নিজেদের একটা বাড়ি খুঁজে নেব। ঘোড়া নিয়ে কেউ যায় লোকের বাড়িতে?'

আমরা চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলাম। 'বাবা তো আমাদের পৌঁছে ফিরে আসবেন, তিন মাস পরে আবার যাবেন। তখন না হয় ও যাবে। আমাদের ভাড়াবাড়ির ছাদে থাকবে।' বললাম বটে, কিন্তু ভালো করেই জানতাম তা হবার নয়। শেষটা একদিন সত্যি সত্যি কালা-মানিককে অন্য লোকে কিনে নিল। স্কুল থেকে ফিরে দেখি, আস্তাবল খালি, সহিসও নেই!

শুনলাম কাঞ্জিলালবাবুদের বাড়িতে যাঁরা এসেছেন, তাঁরাই কালা-

Scanned by CamScanner

মানিককে কিনেছেন। যাবার আগে একদিন চুপি চুপি আমরা দেখতে গেলাম। মেদি গাছের বেড়ার ওপর দিয়ে কালামানিককে দেখতে পেলাম। সেও আমাদের দেখতে পেল। মনে হল যত্নেই আছে। কিন্তু মেদিগাছের ওপর দিয়ে এমন করে আমাদের দিকে চেয়ে রইল যে আমরা কাঁদতে কাঁদতে দে ছুট্!

স্কুলের পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল। বাড়িতেও বাঁধাছাঁদা শুরু হয়ে গেল। আসবাবপত্র কিছু নেওয়া হবে না, খাট-পালঙ্ক বেশির ভাগই বাড়ি-ওয়ালার সম্পত্তি; আমাদের যা, সে সবই বিলিয়ে দেওয়া হল। কাঁচের বাসন এ-ও চেয়ে নিয়ে গেল। কলকাতায় এলাম আমরা শুধু কাপড়-চোপড় বিছানাপত্র আর কিছু ভালো বাসন নিয়ে। শেষ মুহূর্তে ভুঁইচাঁপা গাছটিকেও তুলে আনা হল। ও আর কতটুকু জায়গা নেবে, টবে লাগালেও হবে। দুঃখের বিষয় কলকাতায় জ্যাঠামশাইয়ের বাড়িতে সেই বসন্তেই যা একবার ফুল হয়েছিল, দেখে সবাই মুগ্ধ! তারপর পাতা মরে গেল, শেষে একদিন ও-বাড়ির মালি কাউকে কিছু না বলে, বাল্বগুলিকে তুলে ডাস্টবিনে ফেলে দিয়েছিল। আর কখনো ভুঁইচাঁপা ফুল দেখি নি।

দল বেঁধে পুরনো প্রিয় জায়গাগুলিতে শেষবারের মতো চড়িভাতি করে আসা হল। বনজঙ্গলে শেষবারের মতো ঘুরলাম; ছোটবেলা থেকে যাদের নিতান্ত আপনার জন বলে জানতাম, তাদের বাড়িতে শেষবারের মতো দেখা করে এলাম। সবাই আদর করে বিদায় দিল; দু-একটি শেষ চিহ্ন কুড়িয়ে নিলাম,—বইয়ের পাতায় শুকনো ফুল, ঝাউগাছের সরল-গাছে কেঠো ফল, ফার্নগাছের রূপোলি বোঁটা! তাছাড়া মনের খাতার পাতায় যত্ন করে রাখা কতকগুলো স্মৃতি।

তারিখটি মনে আছে ২৩ শে ডিসেম্বর ১৯১৯ সাল। পাহাড় থেকে নামতে হয় মোটরগাড়িতে, রেলের লাইন নেই, এখনো নেই। ওখান থেকে চৌষট্টি মাইল গিয়ে তবে ট্রেন ধরতে হয়। গৌহাটিতে এক রাত থাকা হবে শুনলাম ; কটন কলেজের একজন অধ্যাপক বন্ধুর বাড়িতে। পরদিন সকালে ট্রেনে চড়ে কলকাতা যাত্রা। পাণ্ডুঘাটে জাহাজে করে ব্রহ্মপুত্র পার হতে হবে, ওপারে গিয়ে আবার ট্রেন। সান্তাহারে সে-গাড়ি

Scanned by CamScanner

থেকে নেমে তবে কলকাতার গাড়ি ধরতে হবে। এত উত্তেজনার মধ্যে বেদনার স্থান কোথায়? সে বেদনা বিন্দু বিন্দু করে সারাজীবন ধরে হৃদয়ের ঘটে জমা হতে থাকল, যতদিন না হঠাৎ দেখি জীবনটা সোনার বালার মতো পরিপূর্ণ হয়ে দুই মাথার মুখ দুটিকে পরস্পরের কাছাকাছি এনে ফেলেছে।

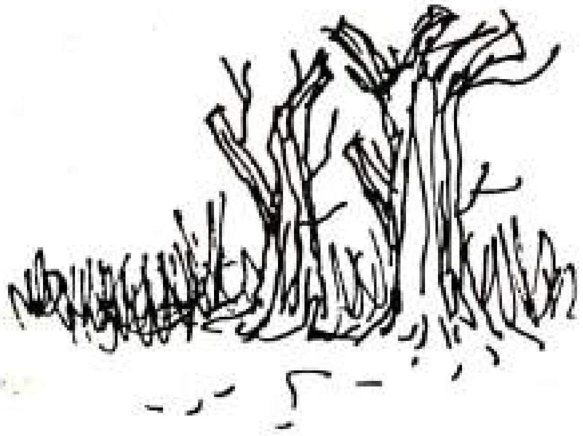

Scanned by CamScanner

॥ নয় ॥

সত্যি সত্যি চলে এলাম সেই পাহাড়ের দেশ ছেড়ে কলকাতায়। ১৯১৯ সালের ডিসেম্বর মাস। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের বছর, সমস্ত দেশটা তখনো রী-রী করছে, অথচ আমরা তার কিছুই জানি না। এখন ভাবতে অদ্ভুত লাগে, দাদার বয়স তেরো, দিদির বারো, আমার এগারো। তবে ব্যাপারটা কিছুই জটিল নয়। সে সময় ওখান থেকে কলকাতায় আসতে আড়াই দিন সময় লাগত; ওখানে কোনো খবরের কাগজ প্রকাশিত হত না, এখান থেকে খবর সরবরাহ হত, কাজেই সব খবরই ওখানে পৌঁছত, তবে আড়াই দিনের বাসি হয়ে। আমরা খবরের কাগজ বড় একটা পড়তাম না, বড়রা ভুলেও কখনো আমাদের সামনে রাজনীতি আলোচনা করতেন না। আসল কথা রাজনীতি সম্পর্কে তখনো সচেতন হই নি।

সচেতন হই নি বটে, কিন্তু যারা আমাদের শাসন করে তারা বিদেশি এ কথা ভালো করেই জানতাম। তাদের চামড়ার রঙ সাদা আর তারা কালা আদমিদের ঘেন্না করে, ছয় বছর বয়স থেকে তার বহু প্রমাণও পেয়েছিলাম। আমরা 'নেটিভ', আমাদের ধর্ম 'হিদেন' ধর্ম, অতি নিকৃষ্ট, আমাদের খাওয়া-দাওয়া চালচলন বড়ই অসভ্য, এ কথা আমাদের সাদা ও কালো মেমের বাচ্চা সহপাঠীরা উঠতে বসতে শোনাত। প্রথমটা শুনে কাঁটা হয়ে থাকতাম, পরে যখন দেখতাম ওরা কোনো কিছুতেই আমাদের সঙ্গে পারে না, অথচ আমাদের চেয়েও কালোরাও গোইং হোম টু স্কট-ল্যান্ড নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করে, তখন হাসি পেত। দেশের দুরবস্থা সম্বন্ধে

অচেতন ছিলাম না, শুধু রাজনীতি কাকে বলে জানতাম না।

ভারতের ইতিহাস আমাদের স্কুলে পড়ানো হত না ; দাদা আর মেজ-ভাই কল্যাণ ওখানকার সরকারি হাইস্কুলে পড়ত, ওদের ভারতের প্রাচীন ইতিহাস পড়তে দেখতাম। আমরা ব্রিটেনের গৌরবময় ইতিহাস পড়তাম। আশ্চর্য হয়ে শুনলাম একবার ওদের দেশকে রোমানরা জয় করেছিল, তারপর নরম্যানরা জয় করেছিল। কিন্তু তবু ওদের স্বাধীনতা নাকি ক্ষুণ্ণ হয় নি, কারণ রোমানরা ওদের নানাভাবে শিক্ষিত-দীক্ষিত করে দিয়ে নিজেদের দেশটাকে শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে, তল্পি-তল্পা গুটিয়ে চলে গেছিল। আর নরম্যানরা ওদের আরো শিক্ষিত করে তুলে ওদের মধ্যে একেবারে বিলীন হয়ে গেছিল। তাকে তো আর পরাধীন হওয়া বলে না। আসল পরাধীন হল ভারতবর্ষের লোকেরা। ব্রিটিশদের সঙ্গে ভারতবর্ষের নেটিভদের কখনো তুলনা করা চলে?

মাকে এসে বলতাম, 'কি ভালো হয় না মা, ইংরেজরাও যদি একদিন তল্পি-তল্পা গুটিয়ে নিজেদের দেশ রক্ষা করতে আমাদের দেশ থেকে চলে যায়?'

মা হাসতেন, 'তাই যায় কখনো? ওরা তো এদেশে বসবাস করতে আসে নি, এসেছে পয়সা করতে। পয়সা করা হয়ে গেলেই দেশে ফিরে যায় ; ছেলে-মেয়েদের স্কুলে যাবার বয়স হলেই দেশে পাঠিয়ে দেয়। এখানে আসে ওরা বাণিজ্য করতে আর শাসন করতে, বাস করতে নয়।'

বাস করতে আসে না শুনে অবাক হয়ে যেতাম। বইয়ে পড়েছিলাম, ছোট্ট দেশ ওদের ভিজে স্যাঁতসেঁতে, অবিরাম টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ে, শীতকালে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, একটাও বড় নদী নেই, উঁচু পাহাড় নেই; তবুও সেই দেশটাকেও ভালো বলো!

বাবা সরকারি কর্মচারি, জরিপ বিভাগে বড় কাজ করেন, রায়বাহাদুর উপাধি পেয়েছিলেন, কিন্তু সে উপাধি কেউ ব্যবহার করলে রেগে যেতেন। প্রচণ্ড আত্মসম্মান, উপরওয়ালার বাড়ি যাওয়া কিংবা সাহেব-সুবোকে আপ্যায়ন করা তাঁর ধাতে সইত না। দেশের লোকের ওপর কোন সাহেব অত্যাচার করেছে শুনলে রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে যেতেন।

Scanned by CamScanner

কোথাকার এক সাহেব পাখা টানা কুলিকে লাথি মেরে পিলে ফাটিয়ে মেরে ফেলেছিল, এ কথা বাবার মুখেই শুনেছিলাম। বলতে বলতে বাবার মুখ অন্যরকম হয়ে গেছিল, হাত দুটো মুঠো পাকিয়ে গেছিল, সাহেবটার নাকি কোন শাস্তিই হয় নি ; ওটা নাকি দৈবদুর্ঘটনা বলে সাব্যস্ত হয়েছিল : দেশের লোকেরাই সাক্ষী দিয়েছিল।

কিন্তু বাবা সাহেবদের গুণের প্রশংসা করতেন, বলতেন ওদের সময়নিষ্ঠা ও কর্তব্যপরায়ণতা দেখতে হয় ; ওরা সহজে বিশ্বাসঘাতকতা করে না। আবার সঙ্গে সঙ্গে হেসে বলতেন, 'তবে এও সত্যি, টাকার জন্য ওরা সব করতে পারে। নেপোলিয়ন বলেছিলেন—ওদের হৃদয়টার অবস্থান ওদের পকেটে!'

এসব গল্প শুনতাম; আরো শুনেছিলাম বড় জ্যাঠামশাই কোন বড় সাহেবের সঙ্গে তর্ক করে ভালো চাকরি ছেড়ে দিয়ে কষ্টের চাকরি করেছিলেন। প্রতিজ্ঞা করেছিলেন আর কখনো সরকারি চাকরি করবেন না; করেনও নি। তাঁর নাম ছিল সারদারঞ্জন রায় ; অনেক বছর তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মেট্রোপলিটান কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে কাজ করেছিলেন। এখন ও কলেজের নাম বদলে বিদ্যাসাগর কলেজ হয়েছে।

দেশের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে খানিকটা জানলেও, মনে হত তার সঙ্গে আমাদের কি? স্বদেশী আন্দোলনের গল্প মা'র কাছে শুনতাম; মনে হত অন্য জগতের কথা। ক্ষুদিরামের ফাঁসির কথা বলতে মা'র চোখ ছল-ছল করত; ওদের পরিবারের সঙ্গে জ্যাঠামশাইদের জানাশুনা ছিল। যখন ওসব কথা শুনেছিলাম তখন নতুন করে আবার স্বদেশী আন্দোলন শুরু হয়েছে; এ আন্দোলন ছিল দেশজোড়া, শুধু কয়েকজন আদর্শবাদী অসাধারণ পুরুষের আত্মত্যাগের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত নয়।

আসলে বাংলাদেশের বাইরে থেকে ও ফিরিঙ্গি স্কুলে পড়ে, দেশের জলের থই পেতে শিখি নি। এই অবস্থায় পাহাড় থেকে নেমে এলাম। দীর্ঘ যাত্রাপথ, বাড়ি থেকে হেঁটে মোটর টার্মিনাসে যাওয়া; সেখানে সুন্দর সুন্দর প্রকাণ্ড বাসগুলিকে দেখেই সে কি দারুণ উত্তেজনা, ছোটবেলার পর তাতে কখনো চড়ি নি, এমন কি কলকাতার পথেও তখন

Scanned by CamScanner

বাস চলত না। অত উত্তেজনার মধ্যে বিচ্ছেদ বেদনার জায়গা থাকে না; আমরাও হাসিমুখে বিদায় নিলাম। মনেই হল না যে ছোটবেলাকার এত ভালোবাসার জায়গাটিকে দীর্ঘদিনের মতো, হয়তো চিরদিনের মতো ছেড়ে যাচ্ছি। বাস ছেড়ে দিল, জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে চেনা জায়গাগুলোকে দেখতে লাগলাম।

ঐ জামাতুল্লার দোকান, ঐ গোলাম হাইদারের দোকান: ওখান থেকেই সেবার আমাদের মেমপুতুল কেনা হয়েছিল, ওখানে বড় ভালো কেক পাওয়া যায়। ঐ বিজয়বাবুর ছোট দোকান, ওখান থেকে কতবার লজেঞ্চুস কিনেছি। ঐ মোড় ঘুরে বড়বাজার পেরিয়ে আমাদের বাস পাহাড় থেকে সত্যি সত্যি নামতে শুরু করল। বড়বাজারে সপ্তাহে দুদিন করে হাট বসত, তখন মাছ পাওয়া যেত। মা'র কাছে শুনেছিলাম কল-কাতায় রোজ মাছ পাওয়া যায়।

কিছু দূর চেনা পথ; এখানে বড় বড় জলপ্রপাত আছে, কতবার এই পথে পায়ে হেঁটে চড়িভাতি করে গেছি। হঠাৎ গলার মধ্যে টন্‌টন্‌ করে এল, চোখে ঝাপ্‌সা দেখলাম। ঐ পথে আবার যাবার সুযোগ হয়েছিল আটাশ বছর পরে; তখন সব বদলে গেছে, আমিও বদলে গেছি।

গাড়ি বড় নদী পার হল; নদীর বাঁকে গম পেষার কল, জলের স্রোত তার চাকা ঘোরায়। এখানে কতবার বেড়াতে এসেছি, গায়ে মাথায় গমের গুঁড়ো লেগে সাদা হয়ে গেছে। পথের ধারে সারি সারি গোরুর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, মালপত্র বোঝাই। এরা দিনের বেলায় বিশ্রাম করত; রাতে যখন মোটর চলাচল বন্ধ হত তখন চলার অনুমতি পেত। সরু পাহাড়ে পথ, এঁকেবেঁকে পাহাড়ের গা ঘেঁষে নেমেছে, যখন মোটর চলে তখন গোরুর গাড়ি চালানো নিরাপদ নয়। চেয়ে দেখলাম গোরুর গাড়ির লোকগুলো তিনটে করে পাথর বসিয়ে উনুন বানিয়েছে, রান্না চাপিয়েছে, বিশ্রাম করবার জন্য পথের পাশে চাটাই পেতেছে।

ঘুরে ঘুরে গাড়ি নামতে লাগল, সে কি অপূর্ব দৃশ্য, পাঁচ বছর বয়সে যখন শেষ এ পথে গিয়েছিলাম, তখন এতটা লক্ষ করি নি। এখন অবাক হয়ে চেয়ে দেখি, একদিকে লতাগুল্ম গাছ-গাছড়ায় ঢাকা। পাহাড়ের সবুজ

Scanned by CamScanner

গা আর অন্যদিকে খাদ নেমে গেছে, তার নিচে নুড়ি আর পাথরের ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে সুন্দরী নদী, তারই নাম বড়-পানি। এখানে নাকি আগে চিতাবাঘের উপদ্রব ছিল, চা-বাগানের সাহেবরা সব মেরে প্রায় নির্বংশ করে ফেলেছে।

মাঝপথে নংপোতে গাড়ি থামল, দুপুরের খাওয়াদাওয়া সারা হল। ছোট বিশ্রামাগারে বসলাম আমরা; বাবা স্পিরিট-ল্যাম্প জ্বেলে ছোট বোনটির দুধ গরম করতে গেলেন। কেমন করে ল্যাম্পটি ফেটে গেল, বাবার চোখমুখে ঝলসানোর দাগ দেখলাম, দুধ সব নষ্ট হল। মাকে কখনো অতিরিক্ত ব্যস্ত হতে দেখি নি, বাবার পোড়া জায়গায় ভ্যাসেলিন দিয়ে, ছোট মেয়েটাকে পাঁউরুটি মিষ্টি দিলেন, তার দাঁত উঠেছে, ভাবনা কিসের। হঠাৎ মনে পড়ল, এই নংপো, এখানে ইল্‌বনের ছেলে হেড্রিক্সন আর তার ঠাকুমা থাকে ; এখানকার স্কুলে হেড্রিক্সন পড়ে। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও স্কুলের মতো কোনো বাড়ি, কিংবা হেড্রিক্সনের বর্ণনার মতো দেখতে কোনো ছেলে চোখে পড়ল না।

বিকেলের আগেই গৌহাটি পৌঁছে গেলাম। শীতের ছোট দিন, যেখানে যেখানে পাহাড়ের ছায়া পড়েছে, সেখানে দেখতে দেখতে সন্ধ্যা নামে; কিন্তু শহরটা একটু দূরে, সেখানকার রাস্তায় তখনো শীতের মিষ্টি রোদ ঝিকমিক করছে। আমরা লম্বা একটা বাংলোর সামনে পৌঁছলাম। ওখানে কটন কলেজের অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র রায় থাকতেন; তাঁদের সঙ্গে আমাদের বড় স্নেহের সম্বন্ধ ছিল, ছুটিছাটায় তাঁরা সাধারণত পাহাড়ে কাটাতেন। তাঁদের ছেলেমেয়েরা আমাদের খেলার সাথী । চওড়া বারান্দায় বসে চা-জলখাবার খাওয়া হল, বাড়ির বড় ছেলে সাইকেলে চেপে দোকান থেকে গরম বিস্কুট নিয়ে এল। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছেলে অরুণেন্দ্রনাথের বড় জামাই জ্ঞান বড়ুয়া ওখানকার নামকরা অধ্যাপক। তাঁরাও গল্প করতে এলেন। সাতচল্লিশ বছর আগেকার সেই বিকেলটি আমার মনে চিরন্তন হয়ে তোলা রইল। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নেমেছিল, ইউক্যালিপটাস গাছের ছায়াগুলো লম্বা হয়ে গেল, বারান্দায় তখনো শিকারের গল্প, বাঘের গল্প, চা-বাগানের চারদিককার ঘন বনের গল্প চলতে লাগল। তারপর কখন

Scanned by CamScanner

রাত বাড়ল, আমরা খাওয়াদাওয়া করে শুতে গেলাম। সে সহজ আদর, সে অনাড়ম্বর আনন্দের কথা ভাবলে এখন আশ্চর্য লাগে। বাবা, মা, আমরা আটটি ভাইবোন আর একটা চাকর, সবাই কেমন অনায়াসে এক-জন অধ্যাপক বন্ধুর বাড়িতে রাত কাটালাম ; এখন হলে তাঁদের অসুবিধে করছি এই ভেবে দ্বিধা করতাম।

পরদিন সকালে আবার রওনা হলাম, একটুখানি ট্রেনে যেতে হবে, তারপর পাণ্ডুঘাটে জাহাজে চড়ে ব্রহ্মপুত্র পার হয়ে আবার আমিনগাঁওতে ট্রেনে চাপা। শেষরাতে গৃহস্বামী কখন উঠে দলবল নিয়ে শিকারে গেছিলেন, নাকি হাতি মারা হবে, তার নরম পায়ের মাংসের কাবাব রেঁধে আমাদের জন্য পথের খোরাক দেওয়া হবে। শুনে আমরা কাঠ! হাতির মতো সুন্দর জানোয়ার কেউ মেরে খায় বলে তো শুনি নি! আমরা হাতি ভালোবাসতাম, বাবা যখন ক্যাম্পে যেতেন, সঙ্গে হাতি থাকত শুনে-ছিলাম। যেখানে ঘন জঙ্গলে বড় বড় গাছ কেটে পথ তৈরি করে এগুতে হয়, সেখানে সঙ্গে হাতি থাকলে ভারি সুবিধে হয়। একবার চেরাপুঞ্জিতে বাবার ক্যাম্পে হাতির পিঠে আমরা চড়েও ছিলাম; একটি হাতি তার পিঠে বাঁধা নরম গদীর ওপর আমাদের পাঁচ-ছয় জনকে একসঙ্গে নিয়ে, হেলেদুলে অনেকদূর অবধি ঘুরিয়ে এনেছিল। দেশে জ্যাঠামশাইদের বাড়িতে দুটো পোষা হাতি ছিল, তার পিঠে চেপে ওঁরা এ-বাড়ি ও-বাড়ি নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যেতেন। তখন কারো মোটর ছিল না; বড়লোকেরা শহরে জুড়িগাড়ি হাঁকাতেন। পাড়াগাঁয়ে পথঘাট ভালো ছিল না, যা ছিল তাও বর্ষায় ডুবে যেত কিংবা কাদা-প্যাচপ্যাচ করত, তাই যাঁরাই পারতেন হাতি পুষতেন। তখনকার দিনে হাতি পোষাতে সেরকম অসুবিধাও ছিল না। সকলেরই শস্যক্ষেত ছিল, গাছপালায় ভরা জমিজমা ছিল, হাতিতে যদি বছরে দু-চারশো বাঁশগাছ, কলাগাছ, আখের গাছ খেয়েও ফেলে, তাতে এমন কিছু এসে যেত না। সেই হাতি নাকি আমরা খাবো! ছি!

সুখের বিষয় সে রাতে হাতি পাওয়া যায় নি, তার বদলে শিকারী ভদ্রলোকেরা বুনো মোরগ মেরে এনেছিলেন। তারি গোটা দুই রোস্ট করে আমাদের সঙ্গে দেওয়া হল। কত দিন আগের কথা, খুঁটিনাটি মনে

Scanned by CamScanner

নেই, তবে ফ্ল্যাটে করে ব্রহ্মপুত্র নদী পার হওয়ার কথা বেশ মনে আছে। ফ্ল্যাটটা একটি দোতলা জাহাজের মতো, নিচে মালপত্র, ওপরে থাকার জায়গা, খোলা ডেক, ক্যাবিন, খাবার হল্‌ ইত্যাদি। সব সুন্দর করে সাজানো, দুপুরের খাবার সময় আসন্ন, কাজেই সুন্দর করে চেয়ার-টেবিল সাজানো। সেকালে এইসব নদীর জাহাজে অতি দক্ষ রাঁধার লোক রাখা হত, তাদের রান্না যে একবার খেয়েছে, সে নাকি আর জন্মে ভোলে নি। সত্যি কথা বলতে কি, সে খাওয়ার কথা আমার একটুও মনে নেই, বরং মনে হয়, আমরা জাহাজঘাটে পৌঁছবার আগেই গাড়িতেই বুনো মোরগ ও পাঁউরুটি দিয়ে মধ্যাহ্নভোজন করেছিলাম।

পাণ্ডুঘাটে ব্রহ্মপুত্রের শোভা দেখার মতো। অদূরে পাহাড় দেখা যায়, জলের রঙ নীল, খুব গভীর, কাছেই মারাত্মক ঘূর্ণিজল আছে, যেখানে যাত্রীরা মাঝে মাঝে প্রাণ হারায়। জলে শুশুকমাছ খেলা করছে দেখে আমরা মুগ্ধ। শুশুক আসলে মাছ নয়, স্তন্যপায়ী জানোয়ার, এখনো মনে আছে জল থেকে শুশুক লাফিয়ে অনেকটা ওপরে উঠে যাচ্ছে। মেটে রঙের গা থেকে মুক্তোর মতো জলের ফোঁটা নীল নদীতে ঝরে পড়ছে; দুপুরের রোদে শুশুকের গা, নদীজলের ঢেউ চকচক করছে। দেখে দেখে আশ মেটে না।

অনেকক্ষণ পরে একটা চোঙাওয়ালা ছোট একতলা জাহাজ এসে পাশে লাগল, চোঙাটা থেকে বিশ্রী কালো ধোঁয়া বেরুতে লাগল। শুনলাম সেই নাকি আমাদের টেনে ওপারে নিয়ে যাবে। জাহাজ কখন চলতে শুরু করল তা টের পাই নি, হঠাৎ দেখি আমরা আর নদীর পাড়ের সঙ্গে লেগে নেই, মাঝখানে একটি জলময় ব্যবধান। সেই ব্যবধানটা প্রতি মুহূর্তেই বাড়তে লাগল। যাত্রীদের মধ্যে কে যেন বললেন, ঐ যে দূরে কামাখ্যার পাহাড়, বড় সাংঘাতিক জায়গা। আমরা তাঁকে ঘিরে ধরলাম, কেন, সাংঘাতিক কেন? তিনি বললেন, 'ওমা, তাও জান না? ওখানকার লোকরা ভালো মানুষকে ভেড়া করে দেয় যে!'

শুনে আমরা শিউরে উঠলাম। দাদা বলল, 'বাঃ! তাই হয় নাকি?'

Scanned by CamScanner

তিনি একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'যাঃ আবার কি? আবহমান কাল থেকে এই রকম হয়ে আসছে, এই নিয়ে কত বই লেখা হয়েছে, চাক্ষুষ দেখে এসে কত লোক বলেছে। তারা কি সব মিথ্যাবাদী নাকি ?'

মা এইখানে নরম গলায় বললেন, 'তোমরা সবাই একটু এদিকে এসো তো, বাবা কমলালেবুর ঝুড়ি খুলেছেন, এমন কমলা কিন্তু কলকাতায় গিয়ে আর পাবে না।' আমরা কমলা খেতে গেলাম।

বাস্তবিক কমলালেবুর দেশই ওটা। তবে আমাদের পাহাড়ের শহরের চারদিকে ভালো কমলা হত না, যদিও গাছে ছোট ছোট পাকা কমলা অনেক দেখেছি। ভালো কমলা আসত সিলেট থেকে ; সিলেট ওখান থেকে খুব দূরে নয়, আমাদের শহরের কোনো কোনো জায়গা থেকে সিলেটের বাড়িঘর দেখা যেত, দূরে কালো কালো ফুটকির মতো। তবে যেতে হলে অনেক ঘোরা পথ ধরতে হত। ওখানকার কমলালেবু আর আনারসের তুলনা হয় না। সেটা ছিল সস্তার যুগ; সব চেয়ে বড় ও ভালো কমলা, যে রকম কমলা আর কখনো দেখি নি, সে কমলা ছিল সাত-আট আনায় ভারি। এক ভারি মানে বত্রিশটি, আবার দু-একটি ফাউও পাওয়া যেত। লোকে দু-চারটে কমলা কিনত না, ভারি ভারি কিনত।

অল্প সময়ের মধ্যেই জাহাজ এপারে লেগে গেল; বাবা আমাদের জায়গা খুঁজে নিলেন, তাঁর সঙ্গে গেলে আমাদের কোনো ভাবনা ছিল না, তাঁর কথামতো কাজ করে গেলেই হল।

Scanned by CamScanner

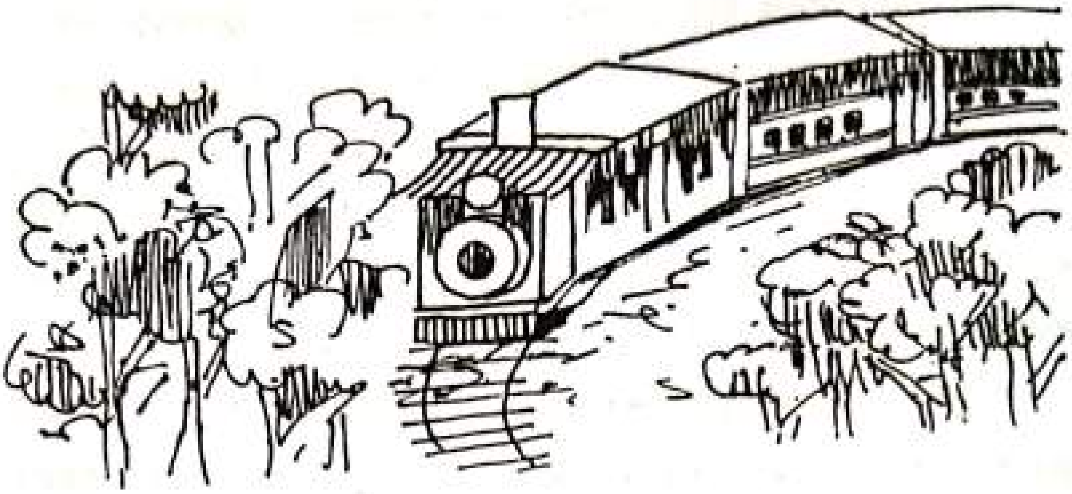

॥ দশ ॥

নেমে এলাম কলকাতায়। পথে কোনো আশ্চর্য ঘটনা ঘটল না। শুধু গভীর রাতে চার বছরের যতি চলন্ত গাড়ি থেকে পড়ে গেল। সে এক কাণ্ড। সেকালে ওদিককার গাড়ির দরজাগুলো খুলত বাইরের দিকে ; লালমণিরহাট স্টেশনে কারা যেন দরজা খুলে একবার ঢুকবার চেষ্টা করে-ছিল, ভরা গাড়ি দেখে আর ঢোকে নি। দরজাটাকেও ভালো করে বন্ধ করে নি; গাড়ির ঝাঁকিতে সেটা হাট হয়ে খুলে রইল আর ছোট্ট যতি ঐ খোলা দরজা দিয়ে আরেকটা ঝাঁকির সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে বাইরে পড়ে গেল। বাবা আধজাগা ছিলেন, যতিকে আচম্কা পড়ে যেতে দেখে, তিনিও অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই খোলা দরজা দিয়ে লাফিয়ে নেমে পড়ে, রেলের লাইনের ঢালু দিয়ে হাঁচড়পাঁচড় করে নেমে ধানক্ষেত থেকে যতিকে টপ করে তুলে নিলেন। যতি দুটো ছোট ছোট মুঠি পাকিয়ে বাবাকে দমাদম কিল মারতে লাগল আর বলতে লাগল—মাকো পাস্! মাকো পাস্! সে ভেবেছে অচেনা লোক তাকে তুলেছে, বাবা যে লাফিয়ে নেমেছে ভাবতে পারে নি।

বাইবেলে একজনের কথা লেখা আছে, গাছ থেকে পাখির ছানা নিচে পড়লে যার চোখ এড়ায় না। তার থাকা-না-থাকা নিয়ে অনেকে তর্ক করে থাকে, এক্ষেত্রে কিন্তু মনে হয় সে-ই দেখেছিল। আমি ওপরের বাঙ্কে শুয়েছিলাম, হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখি দাদা খচমচ করে নেমে যাচ্ছে, জিজ্ঞাসা করাতে খালি বলল, 'বাবা আর যতি পড়ে গেছে।' এই বলে

Scanned by CamScanner

হঠাৎ চেন ধরে ঝুলে পড়ল। ততক্ষণে গাড়ির অন্যান্য যাত্রীরাও জেগে গেছেন, তাঁরা বলেন—পড়বে কেন? গাড়িতেই খুঁজে দেখা যাক। অত-টুকু গাড়ি আর স্নানের ঘর দেখতে বেশি সময় লাগল না, তাছাড়া খোলা দরজাও সাক্ষ্য দিচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত বড়দের একজনও দাদার সঙ্গে চেন ধরলেন, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘ্যাঁচ করে গাড়ি থেমে গেল।

মা জেগে কাঠ হয়ে বসেছিলেন, একটি কথাও বলেন নি, খালি মুখ-টাকে অস্বাভাবিক সাদা দেখাচ্ছিল। বাইরে একটি শোরগোল শোনা গেল, পুরুষ সহযাত্রীরা সকলেই নেমেছিলেন, সেই গোলমালের মধ্যে স্পষ্ট কানে এল, বাবা কাকে ইংরেজিতে বলছেন, 'আমার এই ছেলেটি পড়ে গেছিল।' খানিকক্ষণ কথাবার্তার পর, বাবা গাড়িতে উঠে যতিকে মার কোলে দিলেন। হাতে পায়ে মুখে অসংখ্য আঁচড় লাগা ছাড়া কোথাও কিছু হয় নি। বাবারও একটা পায়ের কব্জিতে একটু লেগেছিল, আর কিছু হয় নি। তবে তিনি ছিলেন পাকা খেলোয়াড়। এই একটা সামান্য ঘটনা আমার পরবর্তী জীবনের অনেক পরীক্ষা অনাস্থা অবিশ্বাসের সময়ে মনে বল যুগিয়েছে।

পরদিন বিকেলের দিকে এলাম কলকাতায়। অবাক হয়ে দেখি ছোটবেলায় মনে পড়া সে কলকাতার সঙ্গে এর অনেক তফাৎ। তবে শিয়ালদাতে আমাদের ছোট জ্যাঠামশাই কুলদারঞ্জন এসেছিলেন, উপেন্দ্রকিশোরের মেজছেলে মণিদা অর্থাৎ সুবিনয় এসেছিলেন, তাঁদের দেখেই চিনতে পারলাম। ঠিকেগাড়ির মাথায় মোটঘাট চাপিয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই মেজ জ্যাঠামশাই উপেন্দ্রকিশোরের গড়পারের নতুন বাড়িতে পৌঁছে গেলাম। সেখানে জ্যাঠামশাই আর নেই, জ্যাঠাইমার গায়ে সাদা থান। অবাক হয়ে দেখি এই সাত বছরের মধ্যে আমাদের সেই হাসিখুশি কর্মতৎপর জেঠিমা শুকিয়ে এতটুকু ছোট্টটি হয়ে গেছেন। ক্লিষ্ট মুখে মা'র দিকে চেয়ে রইলেন, বাবাকে জড়িয়ে কাঁদলেন।

সংসার এখন বৌদির হাতে গিয়ে জেঠিমা অবসর নিয়েছেন, বিশ্রামের অবসর নয়, দুঃখের অবসর। দুজন বৌঠান আমাদের, বড়বৌদি আর মেজবৌদি। বড়বৌদির কথা আগেই বলেছি; মেজবৌদিকে এই প্রথম

Scanned by CamScanner

দেখলাম। পশ্চিমে মানুষ, লম্বা-চওড়া দশাসই চেহারা, এত বড় বড় চোখ, আর রং যেন ফেটে পড়ছে। যেমনি ফরসা মণিদা, তেমনি ফরসা মেজবৌদি, আর তাদের একমাত্র ছেলে ধনারও ভারি সুন্দর চেহারা। ছোট একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ভাবি, সবাই ফরসা সুন্দর, শুধু আমরা ছাড়া। অবিশ্যি যতি খুব সুন্দর।

বাড়িতে আরো অনেকগুলি মেয়ে দেখলাম, তাদের অকারণ রাগ, অকারণ হাসি, অকারণ গান গাইতে গাইতে সিঁড়ি দিয়ে অকারণে ওঠা-নামা যে বাড়ির গুরুজনদের সব সময় মনঃপূত নয় সেটুকু বোঝবার আমাদের তখন বয়স হয়েছে। আস্তে আস্তে তাদের মুখগুলি চেনা হয়ে গেল, সবাই আমাদের দিদি সম্পর্কীয়া; ছোট জ্যাঠামশাইয়ের দুই মেয়ে, আমার সোনাপিসির এক মেয়ে, বড়বৌদির এক বোন, মেজবৌদির চারটি বোন আর এদের সখীরা। সবাই এ বাড়িতে থাকেও না। আসা যাওয়া করে, হয়তো বা দু-চারদিন কাটায়। তাদের গলায় গলায় ভাব, প্রায় সবাই বেথুন কলেজে পড়ে, সবাই সমান বড় খোঁপা বাঁধে, রঙ-বেরঙের ঢাকাই শাড়ি পরে, সবাই গলায় মটর মালা, হাতে মতিচুর কাঠের চুড়ি, কানে এক প্যাটার্নের সোনার দুল। সবাই আমাদের চাইতে পাঁচ-সাত বছরের বড়, সুবিধে পেলেই আমাদের দুটো মিষ্টি কথা বলে ব্যাগার খাটায়, কিন্তু গল্পের রস যেই জমতে থাকে, আমাদের দিকে কটমটিয়ে তাকিয়ে বলে—'ফের বড়দের কথা শোনা হচ্ছে! ভীষণ জ্যাঠা হয়ে যাবে, ভাগো হিঁয়াসে!' মা-ও সেই একই কথা বলেন, বড়দের কথায় অত কান কেন?

জ্যাঠামশাইয়ের নতুন বাড়ি কালাবোবাদের স্কুলের পাশেই, দোতলার জানালা দিয়ে দেখা যেত ছেলেমেয়েরা বিকেলে বাগানে খেলা করছে, আঙুল নেড়ে পরস্পরের সঙ্গে কেমন কথা বলছে। ছাদে উঠে অবাক হয়ে দেখতাম, ছাদের পরে ছাদ, দূরে গড়পারের খাল। তবু এদিকটা অনেকটা নিরিবিলি, বাইশ নম্বর সুকিয়া স্ট্রীটের মত হট্টগোলের মাঝখানে ছোট্ট একটি দ্বীপের মত নয়। মনে হয় বড্ড বড় বাড়ি, মস্ত ফটক দিয়ে ঢুকতে হয়, সামনের দেয়ালে প্রকাণ্ড পদ্মফুলের নক্সা করা এ বাড়ির

Scanned by CamScanner

সঙ্গে নিজেদের কোনো সম্পর্কের কথা ভাবতেই পারতাম না।

এখানেও নিচে ছাপাখানার কাজ হত, সারাদিন তার একঘেয়ে ঘুম-পাড়ানি শব্দ শোনা যেত, কিন্তু সেই পুরনো অন্তরঙ্গতাটুকু আর খুঁজে পাই নি। এখানেও যেখানে-সেখানে চকচকে কাগজে রঙ-বেরঙের ছবি পড়ে থাকত; বুড়ো চাকর প্রয়াগ সেগুলি কুড়িয়ে এনে দিত; সেজভাই আমি তাকে ছোটবেলায় পিয়াগ বলে ডাকত, এখনো আমরা সবাই তাই ডাকি। জ্যাঠামশাই নেই বটে, কিন্তু তাঁর বদলে বড়দা আছেন ; সেবার যখন এসেছিলাম বড়দাকে দেখি নি, তিনি তখন বিলেতে। ইতিমধ্যে ফেলো অফ দি রয়েল ফটোগ্রাফিকেল সোসাইটি হয়ে ফিরেছেন, স্যার কে জি গুপ্তর ভাগ্নি সুপ্রভার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে, জ্যাঠামশাইয়ের কাজের বোঝা বড়দা মণিদা দুই ভাই কাঁধে তুলে নিয়েছেন, কাজ সামনে চলেছে, মানুষ বদলেছে। এখনও দেখা যেত সেই প্রুফ দেখা, ছবি পরীক্ষা করা; ছোট জ্যাঠামশাইও আগের মতন খেটে যাচ্ছেন।

১৯১৯ সালের বড়দিনের ছুটি চলেছে তখন। ছোট জ্যাঠামশাই আমাদের ছয় ভাইবোনকে সঙ্গে করে ট্রামে চেপে নিউমার্কেট দেখাতে নিয়ে চললেন। নিউমার্কেটের রোমাঞ্চ যদি সর্বান্তঃকরণে উপভোগ করতে হয়, তা হলে এগারো-বারো বছর বয়সে পাহাড় থেকে আন্‌কোরা নেমে আসতে হয়। সেই নিউমার্কেটকে বছর দুই-তিন দেখেছিলাম, তারপর যেই না চোখ থেকে রঙের ঠুলিটি খসে পড়ল, সে নিউমার্কেটও উধাও হল; তার বদলে এখনকার এই দরকার মেটাবার কেজো নিউমার্কেট জায়গা জুড়ে বসল।

মনে আছে বিকেলে গেছিলাম, সবে আলো জ্বেলেছে, নিউমার্কেটের অলিতে-গলিতে মহোচ্ছব লেগে গেছে। বড় বড় খুঞ্চিপোষে করে সাদা আর রুপোলি নক্সা পরানো বড় বড় কেক সাজানো, কাঁচের দেয়ালে নেটের মোজায় ভর্তি রঙচঙে রহস্য। কাগজের ফুলের মালা আর রঙিন কাগজে মোড়া ক্র্যাকার, দুজনে ধরে টেনে ফাটালে কানে তালা লাগার যোগাড়। সেই সঙ্গে মাটিতে পড়ে ছোট্ট একটি খেলনা, একটা পুতুল, কিংবা কাঁচ-বসানো পিন, কিংবা লকেটসুদ্ধ পুঁতির মালা কিংবা আধ-

বিঘত মাপের জাপানী ছাতা। তা ছাড়া কাগজের টুকরোতে দু লাইন পদ্য লেখা। এ ধরনের শহুরে রোমাঞ্চ আমাদের চিন্তার বাইরে ছিল।

সস্তার বাজার তখন, বারো আনায় এক পাউণ্ড কেক পাওয়া যেত, দশ আনায় ছোট এক বাক্স চকোলেট, এক টাকায় বেশ বড় মেমপুতুল, পাঁচ-সিকিতে একজোড়া জুতো! ছোট জ্যাঠামশাই সেদিন আমাদের দু'হাত ভরে খেলনা, খাবার, নতুন জুতো কিনে দিয়ে, আজো অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন। হয়তো খরচ পড়েছিল বারো-চোদ্দ টাকা, কিন্তু ছ'টি আনাড়ি ছেলেমেয়েকে সঙ্গে নিয়ে বড়দিনের বাজার ঘোরা, তারপর আইসক্রীম খাইয়ে, ফিটন গাড়ি চাপিয়ে সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরিয়ে আনার অপার্থিব আনন্দ বাজারে টাকা দিয়ে কেনা যায় না।

আসলে গড়পারের বাড়িটা বড্ড ফাঁকা-ফাঁকা মনে হত, সুকিয়া স্ট্রীটের বাড়ির মত লোকজন জিনিসপত্রে ঠাসা ছিল না। এখানে অনবরত লোকজন আসত, আস্তে আস্তে কে কার কাছে আসে তাও আমাদের জানা হয়ে গেল। দিদিমা আসতেন জ্যাঠাইমার কাছে; দিদিমা মানে কাদম্বিনী গাঙ্গুলি। জ্যাঠাইমার বাবা দ্বারিক গাঙ্গুলি অনেকদিন গত হয়েছেন, তাঁর বিধবা স্ত্রী কাদম্বিনীর লম্বা-চওড়া ফরসা চেহারা দেখে ও ভারিক্কে স্বর শুনে আমরা তাঁকে সমীহ করে চলতাম। সমীহ করে চলার মত মানুষও ছিলেন তিনি। ভারতের প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েট ও এম-বি পাস করা প্রথম মহিলা ডাক্তার। শুধু তাই নয়, সেই যুগে বিলেতে গিয়ে ডাক্তারি ডিগ্রি আনা কম সাহসের কথা নয়। স্বামীকে ছেড়ে ছেলে-মেয়েদের নিজের মা'য়ের কাছে রেখে কাদম্বিনী কেমন বিলেতে গিয়ে পড়া- শুনো করেছিলেন মা সপ্রশংসভাবে কতবার বলতেন।

দ্বারিক গাঙ্গুলি নিজেও মহা তেজী সমাজসংস্কারক ছিলেন, ঠিক সেই সময় ঐ রকম ভয়শূন্য বলিষ্ঠ পুরুষ কয়েকজন না জন্মালে, আধুনিক ভারত এত তাড়াতাড়ি রূপ নিতে পারত না, এ কথাও মা বলতেন। এক-বার কোনো কাগজে নাকি নারী জাগরণ নিয়ে বিদ্রূপপূর্ণ সম্পাদকীয় মন্তব্য ছাপা হয়েছিল। দ্বারিক গাঙ্গুলি মন্তব্যটুকু কেটে গুলি পাকিয়ে পকেটে পুরে হাতে একটা মোটা লাঠি নিয়ে সম্পাদক মহাশয়ের সঙ্গে

Scanned by CamScanner

দেখা করে, তাঁকে দিয়ে কাগজের গুলিটুকু গিলিয়ে, ইংরেজিতে যাকে বলে 'ঈট্ হিস ওয়ার্ডস্' করিয়ে তবে ছেড়েছিলেন। পরের কোনো সংখ্যায় মন্তব্যটুকু প্রত্যাহার করা হয়েছিল, এ কথা বলা বাহুল্য।

কাদম্বিনী দিদিমা নিজের ঘোড়াগাড়ি করে ডাক্তারি করতেন, দূরে দূরে রুগিণী দেখতে যেতে পথে বড় সময় নষ্ট হয় বলে, সে সময়টুকু গাড়িতে বসে সূক্ষ্ম লেস বুনতেন; এ আমার নিজের চোখে দেখা। দিদিমার সঙ্গে তাঁর কন্যা জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলিও অনেক সময় আসতেন, ইনি দেশ-প্রেমিকা বলে প্রাতঃস্মরণীয়া; অনেক পরে স্বদেশী আন্দোলনের ফলেই তাঁর মৃত্যু ঘটেছিল। তাঁর ভাই প্রভাত গাঙ্গুলি, একমুখ দাড়িগোঁফ নিয়ে আসতেন, তাঁকে আমরা জংলুমামা বলতাম। আরো আসতেন বড়দার বন্ধু প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ এবং রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের বড় ছেলে কেদার-নাথ। তাঁর মতো সুপুরুষ কম দেখা যেত। পাছে বড়দের কথা শুনছি বলে বকাবকি হয় বলে আমরা উঁকিঝুঁকি মেরে তাঁকে দেখে আসতাম, কথা বলার সাহস ছিল না। এবং সত্যি কথা বলতে কি, শুধু আমরা কেন, বাড়ির যাবতীয় তরুণীকুলই তিনি এলে একটু চাঞ্চল্য প্রকাশ করত, তবে বড়দার বন্ধু বলে কেউ এগুত না।

প্রশান্তচন্দ্রের ছোট ভাই বুলাদা আর কেদারনাথের ছোট ভাই যদুও আসত যেত, তাদের সঙ্গে আমাদের অনেকটা সহজ সম্বন্ধ ছিল। বুলাদা পরে ছোট জ্যাঠামশাইয়ের বড় মেয়েকে বিবাহ করে আমাদের পরম ভালোবাসার মানুষ হয়ে উঠেছিল। ওরকম গুণগ্রাহী স্নেহপরায়ণ মানুষ জগতে বিরল, সে অকালে চলে যাওয়াতে আমাদের জীবনে একটা শূন্যতা থেকে গেছে। আরো বহু লোক আসত গড়পারের বাড়িতে, জ্যাঠামশাই না থাকলেও, দাদা-বৌদিদের অতিথিপরায়ণতা ও বিশেষ করে বড়দার ব্যক্তিগত অসাধারণত্ব সবাইকে আকর্ষণ করত। কিন্তু শুধু সেজন্য বাড়িতে লোক আসত না, ও বাড়িটা একটা নতুন রকম সংস্কৃতির কেন্দ্র হয়ে উঠে-ছিল। বড়দাদের মনডে ক্লাবের কথা তখনকার যুগে সবাই জানত এবং তার কোনো একটা অধিবেশনে যোগ দিতে পারলে কৃতার্থ হয়ে যেত।

Scanned by CamScanner

কিন্তু মনডে ক্লাবের স্থান বর্তমান অধ্যায়ে নয়, কারণ বয়স কম বলে আমাদের তার আওতায় পড়বার সুযোগ হয় নি, কেবল পারিবারিক কিংবদন্তী শুনেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। মনডে ক্লাবের কথা মনে নেই বটে, কিন্তু স্পষ্ট মনে আছে একদিন সকালে স্নান সেরে কালো কোঁকড়া চুলগুলি পিঠে ছড়িয়ে বড়বৌদি বাড়ির পিছনের বাগানে দাঁড়িয়ে, বাগানের পিছনে অবস্থিত আনন্দমোহন বসুর পুত্রের বাড়ির জানলায় দাঁড়ানো আনন্দমোহনের পুত্রবধূর (অর্থাৎ ডক্টর রমা চৌধুরীর মা'র) কাছ থেকে মুখে মুখে 'লেমন-রাইস' তৈরির প্রণালী শিখে নিচ্ছেন। জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য বলা উচিত 'লেমন্-রাইস্' অতিশয় উপাদেয় সামগ্রী এবং অতি সহজেই তৈরি করা যায়, কারণ ব্যাপারটা কিছুই নয়; সর্ষে ফোড়ন দিয়ে ঘিভাত বানিয়ে, তাতে কারি পাতা এবং লেবুর রস দিয়ে নামালেই হবে 'লেমন্-রাইস্'। অনেকে লেবুর রসের বদলে টক-দই দিয়ে থাকেন, তখন জিনিসটার নাম হয়ে যায় স্রেফ দই-ভাত। কোনো রান্নার জন্য পূর্ববঙ্গের কাছে গোটা পশ্চিমবঙ্গ চিরকাল ঋণী থাকবে, অবিশ্যি হিংসার কারণে সেটি স্বীকৃত না-ও হতে পারে।

নতুন আবহাওয়ায় পড়ে আমরা অনেকটা হকচকিয়ে গেছিলাম; তার মধ্যে বাবা পাহাড়ে ফিরে গেলেন, কাজের শেষরক্ষা দিতে হবে, মা অসুস্থ হয়ে পড়লেন, দিদি আর আমি ভবানীপুরে ডায়োসেশন স্কুলের বোর্ডিং-এ ভর্তি হলাম। দাদারা গেল হেয়ার স্কুলে।

Scanned by CamScanner

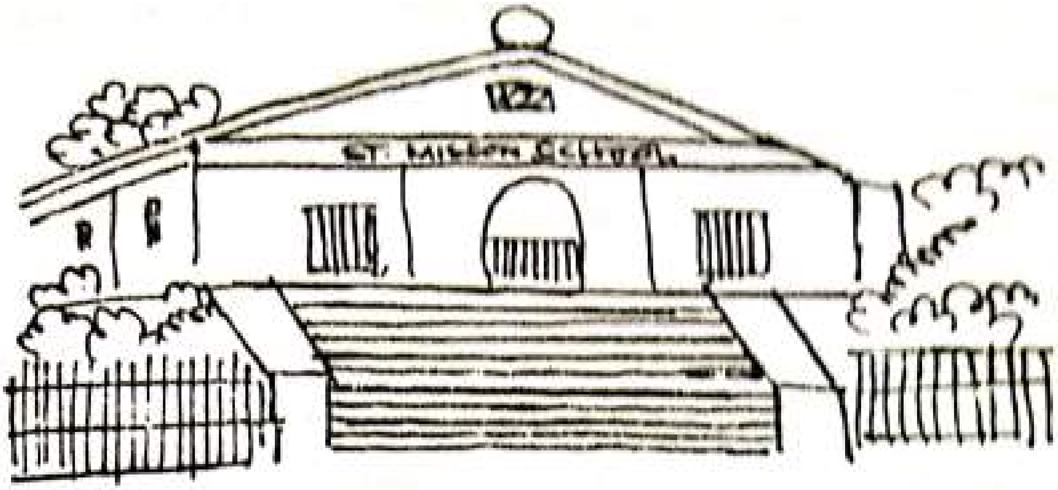

॥ এগারো ॥

দিদি আর আমি নতুন স্কুলের বোর্ডিং-এ ভর্তি হলাম। ভবানীপুরের পুরনো একটা নামকরা রাস্তায় পুরনো একটা নামকরা মিশন স্কুল, সঙ্গে কলেজও আছে। এই স্কুলে চার বছর পড়ে ম্যাট্রিক পাস করে, এই কলেজেই আরো চার বছর পড়ে বি-এ পাস করেছিলাম। প্রাণ দিয়ে স্কুল-কলেজ ভালোবেসেছিলাম। কিন্তু যখন পাহাড় থেকে নেমে এক মাসও না যেতে যেতে ছোট জ্যাঠামশাই একদিন একটা সেকেন্ড ক্লাস ঠিকেগাড়ি করে আমাদের দুজনকে অচেনা স্কুলে রেখে এলেন, তার মস্ত মস্ত তিনতলা বাড়ি, কেয়ারি করা বাগান আর তেঁতুল গাছ, বাতাবিলেবুর গাছ, আম গাছ দেখে আমরা হকচকিয়ে গিয়েছিলাম।

বাড়ি ছেড়ে কোথাও কখনো থাকি নি, কিছুই আর ভালো লাগত না, দিদি আবার রাতে লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদত টের পেতাম। কোথায় আমাদের সেই ম্যাটিং দিয়ে মোড়া কাঠের মেঝের ছোট্ট শোবার ঘর; তার জানলায় লেসের পর্দা, পাশের ঘরে মা, মাঝখানের দরজার পাশে রাতে লণ্ঠন জ্বালা! এখানকার সান-বাঁধানো লম্বা শোবার ঘরে চারসারি লোহার খাট পাতা, তাতে চার বছরের ছোট্ট মেয়ে থেকে শুরু করে, ষোল-সতেরো বছরের বড় মেয়েরা ও জনা-দুই শিক্ষিকার খাট পাতা। তারা প্রায় সকলেই বাঙালি, পাশের ছোট ঘরে একজন নান্ থাকেন, তিনি ইংরেজ।

সব খাটে নম্বর দেওয়া; আমি চল্লিশ, দিদি বিয়াল্লিশ, মাঝখানে

Scanned by CamScanner

একত্রিশ নম্বরে আমাদেরি সমবয়সী হাসিখুশি একটি মেয়ে শোয়। তার নাম রেবা রায়, সে-ই আমাদের প্রথম নতুন বন্ধু, তার কাছেই আমরা বোর্ডিং-এর হালচাল নিয়মকানুন শিখলাম। এই মেয়েটি আসলে আর পাঁচজন সাধারণ মেয়ের মতো ছিল না। পরে এর নাম সবাই শুনেছিল, এ-ই প্রথম ভারতীয় প্রথায় প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে নেচে প্রচুর প্রশংসা ও অকথ্য নিন্দার ভাগী হয়েছিল। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে ভদ্রলোকের মেয়ে স্টেজে চড়ে নাচবে শুনলে লোকে শিউরে উঠত। রেবা রায় তাতে ভয় পায় নি, সাহস করে এগিয়ে গিয়ে, পরবর্তিনীদের পথ খুলে দিয়ে ছিল। এখন আর কেউ তার নামও করে না।

বোর্ডিং-এর স্নানের ঘর একতলায়, তোয়ালে কাপড়-চোপড় নিয়ে ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে নামতে হত। স্নানের ঘরের দরজার উপরেও নম্বর দেওয়া, কে কখন কোন ঘরে স্নান করবে তার লম্বা ফর্দ ঝোলানো। প্রত্যেকের দশ মিনিট সময় বরাদ্দ: দেরি করলে উত্তরাধিকারিণী দরজা পেটায়! তার উপর দরজাগুলোর নিচের দিকটা মাটি থেকে দশ ইঞ্চি উঁচু অবধি ফাঁকা। জীবনযাত্রা যে এত শীতল এমন বে-আব্রু হতে পারে এ আমাদের চিন্তার বাইরে ছিল।

এখানকার হাওয়াই অন্যরকম। আমাদের পাহাড়ের সেই রোমান ক্যাথলিক মিশনের সুন্দর ঘরদোর সুন্দর ছবি ও মূর্তি দিয়ে সাজানো ছিল। সুন্দর সুন্দর আসবাব, ফুলদানিতে বাগান থেকে সদ্য তোলা সুন্দর সুন্দর ফুল। এটাও মিশন স্কুল, কিন্তু প্রটেস্টান্টদের মিশন, এখানে অত সাজগোজের বালাই নেই। তিন-চার জন নান্ অনেকগুলি বিশেষভাবে শিক্ষিত ভারতীয় খ্রিস্টীয় শিক্ষিকার সাহায্যে স্কুল চালান। তবে সংস্কৃতের জন্য পণ্ডিত আসতেন।

অবিলম্বে বুঝলাম এখানকার নান্‌রা রোম্যান ক্যাথলিক বিদ্বেষী, তাদের সম্বন্ধে ঠেস দিয়ে কথা বলেন, আমরা তাদের হাতে তৈরি বলে নানান খুঁত ধরেন। এবার বুঝলাম আমাদের সেই নিশ্চিন্ত উষ্ণকোমল জীবনযাত্রার সব অবলম্বনই খসে গেছে, নিজেদের পায়ে দাঁড়ানো ছাড়া উপায় নেই। তাছাড়া এগারো-বারো বছরের বুড়োধাড়ি মেয়েরা নিজেদের

Scanned by CamScanner

পায়ে দাঁড়াবে না তো কি করবে?

এ কথা আমাদের সেই পুরনো যামিনীদা প্রতি শনিবার সকালে, আমাদের নিতে এসে বার বার করে বলত আর নিজের নাক টানত। ট্রামে চড়িয়ে আমাদের গড়পারে নিয়ে যেত যামিনীদা। সেখানে ছয় দিন পরে আবার আমরা মাকে, ভাইদের, ছোট বোনটিকে দেখতে পেতাম। আবার সোমবার সকালে বোর্ডিং-এ ফিরে যেতাম। সেই শিখলাম যে পৃথিবীতে যত ভালো জায়গাই থাকুক না কেন, বাড়ির মতো জায়গা কোথাও নেই।

তবে বোর্ডিং আর একশো নম্বর গড়পার রোডে আমরা বেশিদিন থাকি নি; দোলের সময় আমাদের স্কুলের কাছেই ভাড়াবাড়িতে উঠে এলাম। আমাদের বোর্ডিংবাসের ক্লিষ্ট দিনগুলিও শেষ হল। পরে যখন ঐ স্কুল ঐ কলেজকে ভালোবাসতে শিখেছিলাম, অনেক সময় ভেবে আশ্চর্য লাগত ঐ প্রথম তিনটি মাস কেন অত দুঃখে কেটেছিল। বনের পাখিকে খাঁচায় পুরলে যা হয় তাই হয়তো হয়েছিল।

এই প্রথম বুঝলাম বাংলা বই যতই ভালো লাগুক না কেন, ইউ রায় অ্যান্ড সন্স সম্পর্কে যতই গর্ব অনুভব করি না কেন, বাংলায় আমরা কাঁচা। ক্লাসের মধ্যে যতগুলি বাঙালি মেয়ে আছে সবাই আমাদের চাইতে বেশি জানে। ব্যাকরণ বলে কোনো জিনিসের সঙ্গে এর আগে সংস্পর্শে আসি নি। তার উপর মিস্টার মণ্ডল বলে একজন পার্টটাইম মাস্টারমশাই ইংরিজিতে বাংলা ব্যাকরণ পড়াতেন। প্রথম দিনই আমাকে জিজ্ঞাসা করে বসলেন—'ক্যান্ ইউ টেল্ মি হোয়েদার ষষ্ঠি ইজ এ কারক অর এ বিভক্তি?' আমি তো থ! এ আবার কি বলে! পরদিন পণ্ডিত মশাই সম্ভবত ব্যাপার শুনে, চশমার উপর দিয়ে পিটপিট করে তাকিয়ে বললেন— 'বিলেত থেকে এয়েচ?' শুনে আমরা লজ্জায় মরে যাই। বাংলা ব্যাকরণ জানি না, হাঁটুর উপরে ফ্রক পরি, নিজেদের মধ্যে নিজেরাই কোনো বাঙালীত্ব খুঁজে পাই না, একমাত্র হৃদয়ের ভিতর ছাড়া।

সহজে যে ফ্রকগুলোকে ছাড়া যাবে সে ভরসাও ছিল না কারণ ছোট

Scanned by CamScanner

জ্যাঠামশাই আমাদের দুজনকে নিউমার্কেটের রেডিমেড পোশাকের দোকানে নিয়ে গিয়ে অবিকল এক ডিজাইনের লম্বা-হাতা সাদা লংক্লথের ফ্রক, একেক জনের আটটা করে কিনে দিয়েছেন, সেগুলিতে ফ্যাশানের কোনো বালাই না থাকলেও, দেখেই বোঝা যেত সাংঘাতিক ট্যাঁকসই! এতবড় স্কুলে কেউ ওরকম পরত না। সারা বছর ধরে আমরা দুজনে প্রত্যেক দিন একরকম এক ডিজাইনের ফ্রক পরে স্কুলে গেলাম। পরের বছর দিদি ফ্রক ছেড়ে যেই শাড়ি ধরল, আমিও মহা কাঁদাকাটি করে ওর সঙ্গ নিলাম। ততদিনে বাড়িতে পড়ে ব্যাকরণও খানিকটা শিখেছি; আবার ক্লাসে ভালো মেয়ে বলে নাম কিনেছি; এতক্ষণে নিজেদের পুরো-পুরি বাঙালি বলেও প্রমাণ করা গেল। মাথা থেকে একটা বোঝা নেমে গেল।

আরেকটা জ্বালাও ছিল। বাবা বড় সরকারি কাজ করেন; এদিকে সি আর দাশ (তখনো দেশবন্ধু নাম কেউ জানত না) বলে একজন কেবলি বলেন ইংরেজ সরকারের চাকরি ছাড়! অথচ বাবা কিছুতেই শুনবেন না। এদিকে মহা দেশভক্ত, মোটা মোটা বাংলা মিলের শাড়ি কিনে দিতেন আমাদের, তখনো এদেশে সূক্ষ্ম কাপড় তৈরি হয় নি। বিলিতি কাপড় তো কেনাই হবে না, বিলিতি সুতো দিয়ে এদেশে বোনা কাপড়ও নয়। কিন্তু আমার জন্য বাবা মিহি সুন্দর বিদেশি ভয়েল্ কেনেন, বন্ধুরা টিটকারি দেয়! শেষ পর্যন্ত সাহস করে বললাম গিয়ে খদ্দরের জামা পরব। বহুকাল তাই পরেও ছিলাম। তারপর আস্তে আস্তে এদেশে সূক্ষ্ম কাপড় তৈরি হল, সুন্দর ছাপা খদ্দর দেখা দিল। আমরা সাবান পাউডার আর সুগন্ধি অগুরু দেলখোস কুন্তলীন ছাড়া আর কোনো প্রসাধনী দ্রব্যের কথা ভাবতেও পারতাম না। রঙ মেখে নিজেদের সুন্দর করে তোলার কথা চিন্তা করতেও শিউরে উঠতাম। বন্ধুবান্ধবরা যারা বলত কেন ভাই, আলতা পরতে পারি তো মুখে রঙ মাখতেও বা দোষ কি?—তারাও নিজেদের গুরুজনদের কাছে সে কথা বলবার সাহস পেত না।

সত্যি কথা বলতে কি, তখন ছিল অসুন্দরদের রাজত্ব, চারদিকে গুণের

Scanned by CamScanner

প্রশংসা শোনা যেত, কে ভালো রাঁধে, কে ভালো সেলাই করে, কার গানের গলা ভালো, আর গুণের চেয়েও বেশি প্রশংসা পেত শুধু একটি জিনিস, সেটি হল ফরসা রঙ। তখনকার গিন্নীরা সুন্দর বৌ খুঁজতেন : 'সুন্দর' মানেই ফরসা, নাক-চোখ যেমন হোক না কেন, তাতে কিছু এসে যেত না। ফরসা হলেই টপাটপ মেয়েদের বিয়ে হয় যেত, কালোরা পড়াশুনা করত। দৈবাৎ যদি এম-এ ক্লাসে কোনো ফরসা মুখ দেখা যেত, হয় তার অধিকারিণী বিবাহিতা নয় তো—এই বলে গিন্নীরা পরস্পরের দিকে তাকাতেন! এখন যুগ পালটে গেছে, বিখ্যাত সুন্দরীরা অনেকেই মিশকালো, তার উপরে অনেকের মোটা নাক, পুরু ঠোঁট; আবার অনেকের রঙই বা কেমন, মুখ-চোখের গড়নই বা কেমন, কারো বোঝার সাধ্য নেই। রূপও এখন গুণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মোট কথা সেকালে দিদিকে কি আমাকে কেউ সুন্দরী বলতও না, সেজন্য মাথাও ঘামাতাম না।

স্বদেশী আন্দোলন ক্রমে তীব্র হয়ে উঠল। এর আগেই ১৯১৯ সাল থেকে রাওলাট বিল নিয়ে দেশময় গণ্ডগোল, গান্ধীজী নেতৃত্ব নিয়েছেন, সত্যাগ্রহ সভা স্থাপন করেছেন। তারপর জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যা-কাণ্ডের খবর চারদিকে যেই ছড়িয়ে পড়ল, দেশময় তার প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। কলকাতাতেও মিছিল, ধর্মঘট, ছেলেদের স্কুলে পিকেটিং! আমাদের গায়ে তখনো পাহাড়ের সেই সরল-পাতা সুরভিত হাওয়া লেগে ছিল, এ কোন্ রাজ্যে এসে পড়লাম ভেবে পাই না। আমাদের স্কুলে কিছু হয় না, কিন্তু ভাইরা ঢুকতে না পেরে ফিরে আসে, অপমান মারামারির কাহিনী শোনা যায়। ১৯২০ সালে অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক মতিলাল ঘোষ পরলোকে গেলেন। যাবার সময় গান্ধীজীকে নাকি বলেছিলেন— 'এখন যেখানে যাচ্ছি সেখানে ব্রিটিশ শাসন নেই—এই আমার সান্ত্বনা—'

বলা বাহুল্য আমাদের স্কুলেও সবার মুখে তখন ঐ এক আলোচনা; শুনে শুনে রক্ত গরম হয়ে উঠত, কিন্তু বাড়িতে ঠাণ্ডামাথায় বাবা তখন বলতেন, 'শত্রুর নিন্দা করে তাকে হীন প্রতিপন্ন করার চেষ্টা বুদ্ধিমানের

Scanned by CamScanner

কাজ নয়। ওভাবে যুদ্ধে জয় হয় না। প্রবল শত্রুর চেয়ে প্রবলতর হতে হয়; মুখে বক্তৃতা করলেই হল না, কাজেও দেখাতে হবে। ব্রিটিশদের অনেক গুণ, সেগুলোকে আয়ত্ত না করলে কিছু হবে না, শুধু জোর করে ছেলেদের স্কুলে ঢোকা বন্ধ করে দেশের কোনো মঙ্গল হবে না, সাহসী হওয়া চাই, জোরালো হওয়া চাই।'

বাড়িতে বাবা আমাদের একসারসাইজ করাতেন, কর্তব্যের পথ থেকে এতটুকু খসলে বেজায় কড়া শাস্তি দিতেন। তাঁকে আমরা যমের মতো ভয় করতাম।

এদিকে আমার পড়ার দেরাজ ফালতু খাতা আর কাগজের কুচিতে বোঝাই হয়ে উঠেছে, কবিতা গল্প প্রবন্ধ—ইংরাজিতে ও বাংলাতে। সাহস করে প্রবাসীতে একটা ভারি আদর্শবাদী করুণ গল্প লিখে পাঠালাম, অবশ্য গোপনে। রামানন্দবাবু সম্ভবত তার প্রথম দুই লাইন পড়েই ময়লা কাগজের টুকরিতে ফেলে দিয়েছিলেন। প্রতিজ্ঞা করলাম সম্পাদক না চাইলে আর কখনো কোথাও লেখা দেব না। জীবনের অন্যান্য উত্তম সঙ্কল্প ভরাডুবি হলেও, এই প্রতিজ্ঞাটি রক্ষা করে এসেছি।

Scanned by CamScanner

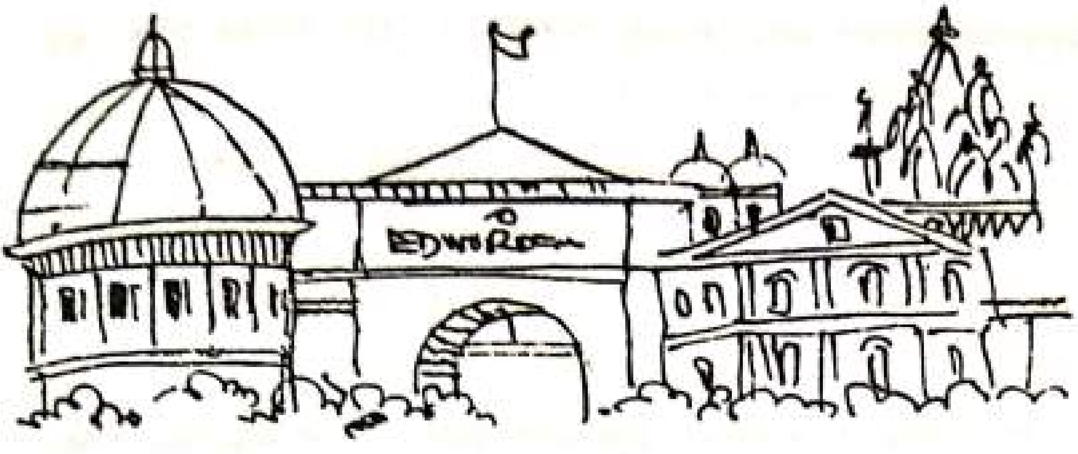

॥ বারো ॥

কলকাতাতেই যখন এসে পড়লাম, তখন আমার বাবার ভাইবোনদের কথা বলতে হয়। আমার বড় জ্যাঠামশাইকে দেখলে সকলে থরহরি কম্পমান। মাঝারি লম্বা ইটের মতো পেটানো দশাসই চেহারা, লম্বা ঘন একমুখ দাড়ি, জলদগম্ভীর গলার স্বর। শুনেছি আমার বড় পিসিমা ছাড়া গুষ্টিসুদ্ধ সকলে তাঁকে ভয় করত। মসূয়ার রায় পরিবারের প্রচণ্ড রাগ ময়মনসিং জেলায় বিখ্যাত ছিল। আমার ঠাকুরদা শ্যামসুন্দর রায় তাঁর মধুর স্বভাবের জন্য সকলের কাছে পরিচিত ছিলেন বটে কিন্তু তাঁরো রাগটি খুব কম ছিল না। একবার খুব ছোট বয়সে বড় জ্যাঠামশাই আর মেজো জ্যাঠামশাই তাঁর ভুঁড়ি নিয়ে হাসাহাসি করেছিলেন বলে দুই ছেলেকে নাকি দুটি চড় মেরেছিলেন, সেই চড়ের ধাক্কায় ছেলেরা ঘর থেকে উড়ে বাইরে গিয়ে পড়েছিল।

মেজো জ্যাঠামশাইয়ের শরীরে রাগ ছিল না এক কণাও, কিন্তু বড় জ্যাঠামশাই ও আমার বাবা উত্তরাধিকারটি পুরোমাত্রায় পেয়েছিলেন। ছোট জ্যাঠামশাই হঠাৎ দপ্ করে জ্বলে উঠে, খপ্ করে নিবে যেতেন। একবার আমরা তাঁর মুখের উপর তর্ক করেছিলাম বলে রেগেমেগে আমাদের বাড়ি থেকে চলে গেছিলেন। যাবার সময় বাবাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে গেছিলেন, ‘আর কখনো শম্ভুয়ার বাড়ি আসব না, ছেলে-মেয়েরা বড় বেয়াদব!’ আমরা ভয়ে আধমরা, বাবাও হয়তো খুব রাগমাগ করবেন। আশ্চর্যের বিষয় বাবা একবার শুধু জানতে চাইলেন কি হয়েছিল। তারপর বললেন—‘তোমরা বড় হচ্ছ, লেখাপড়া শিখছ,

Scanned by CamScanner

নিজেদের মতামত হবে সে আর আশ্চর্য কি! তবে বড়দের সঙ্গে তর্ক করার সময় মুখ সামলে কথা বলা উচিত।'

আরো আশ্চর্যের কথা, দুদিন না যেতে ছোট জ্যাঠামশাই দু হাতে দুই মিষ্টির চ্যাঙারি নিয়ে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলেন— 'ওরে তোরা কোথায় গেলি? কথায় কথায় অত রাগ করা কি ভালো?' এ ঘটনা অবিশ্যি অনেক দিন পরের কথা।

বড় পিসিমাকে সকলেই সমীহ করে চলত ; তাঁর নাম ছিল গিরিবালা ; থান পরা, চুল ছাঁটা, কালো রঙের বড় পিসিমা মানুষটি ঠিক অন্যদের মতো ছিলেন না। শুদ্ধভাবে বাংলা লিখতে পড়তে পারতেন, তবে বিদ্যের দৌড় ঐ পর্যন্তই। পিসিমা দেশে থাকতেন, মাঝে মাঝে ক্ষীরের ছাঁচ, নারকেল নাড়ু, ইত্যাদি নিয়ে কলকাতায় আসতেন, ভাইদের কারো না কারো বাড়িতে উঠতেন। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আর সাংঘাতিক তেজ ছিল তাঁর।

একবার কোনো মাসিকপত্রে আমাদের আত্মীয় শিল্পী হেমেন মজুমদারের আঁকা স্নানরতা সুন্দরীর চেহারা দেখে বড় পিসিমা চটে কাঁই। কোত্থেকে একটা কলম যোগাড় করে এনে এক ভাইঝিকে বললেন, 'গোপ্‌লা মনে করতাসে কি? (গোপ্‌লা মানে উক্ত শিল্পী) উয়ারে ব্লাউজ পরা!' শুনে সবাই অবাক! জামা পরাবে কি? ঐ তো আর্ট, ঐ রকমই আজকালকার রুচি, গোপ্‌লার কি দোষ? তখন আমার বিদ্যাবিহীনা পিসিমা এক মোক্ষম কথা বলে ফেলেন, 'কস কি? শিল্পী কি মান্‌ষের কুরুচি মাইন্যা চলব, নাকি সুরুচি গড়ব তাই ক।'

বড় জ্যাঠামশাইকে ততটা ভয় না করলেও, তাঁর সামনে মুখ তুলে বড় পিসিমাও বিশেষ কথা বলতেন না। সাধারণত বড় জ্যাঠামশাইয়ের পায়ের শব্দ শুনলেই যে যার নিজের কাজে মশগুল হয়ে যেত, চোখ তুলে তাকাত না। এদিকে বাড়ির প্রত্যেকটি মানুষের মঙ্গল বিধানের উপর তাঁর কড়া দৃষ্টি; কার শরীর খারাপ, কার ওষুধ চাই, নিজে থেকে খোঁজ নিতেন। বড় জ্যাঠামশাইয়ের নাম সারদারঞ্জন, মেট্রোপলিটান কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন তিনি। এখন সে কলেজের নাম বিদ্যাসাগর কলেজ।

Scanned by CamScanner

তা ছাড়াও তাঁর অন্য পরিচয় ছিল ; লোকে তাঁকে বাংলা ক্রিকেটের জনক বলত। সাহেবরা বলত ডব্লু জি গ্রেস্ অফ ইন্ডিয়া। ঐ বিখ্যাত ইংরেজ খেলোয়াড়ের সঙ্গে আশ্চর্য চেহারার সাদৃশ্যও ছিল। একাধারে খেলোয়াড় ও পণ্ডিত, তাঁর সংস্কৃত ব্যাকরণ আজো লোকে পড়ে, তার উপরে অঙ্কে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি। ডবল এম-এ অঙ্কে ও সংস্কৃতে।

আমার ঠাকুরদা যখন চোখ বুজলেন, তখন বড় জ্যাঠামশাইয়ের বয়স কুড়ি-বাইশের বেশি নয়। বিধবা মা ও বুড়ি ঠাকুরমা আর নিজের ছোট ভাইবোনদের ভার তখুনি নিজের কাঁধে তুলে নিলেন। বাবার বয়স তখন বছর পাঁচ-ছয়, কাজেই বড় জ্যাঠামশাই তাঁর দাদা বলতে দাদা, বাবা বলতে বাবা। ভাইয়ে ভাইয়ে এত গভীর ভালবাসা সচরাচর দেখা যায় না। পিতৃশোক কাকে বলে বাবা প্রথমে জেনেছিলেন বড় জ্যাঠামশাই যখন মারা গেলেন, ১৯২৩ কি ১৯২৪ সালে। অন্যরা বড় জ্যাঠামশাইয়ের ঘর এড়িয়ে যেত, বাবা তাঁর সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করতেন। আমার ভাই যতিও তাঁকে ভয় করত না; দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর তাঁর গায়ে ঠ্যাং তুলে দিয়ে তাকে শুয়ে থাকতে দেখা গেছিল! দর্শকরা স্তম্ভিত। বড় জ্যাঠামশাই একদিকে যেমন বজ্রের মতো কঠোর অন্যদিকে তেমনি ফুলের মতো কোমল। পুরুষসিংহ তাকেই বলে।

ওরকম তেজী মানুষ আজকাল কম দেখা যায়। এখন বোঝাপড়ার যুগ এসেছে, কিন্তু আমার বড় জ্যাঠামশাই বলতেন, 'Compromise' আবার কি? অন্যায়ের সঙ্গে কখনো Compromise হয় না ; অন্যায় সর্বদা অন্যায়।' কাজের বেলাও তাই! প্রথম সরকারি কলেজে চাকরিতে ঢুকেছেন; একাধারে পণ্ডিত ও খেলোয়াড়, ভবিষ্যতে অনেক উন্নতির সম্ভাবনা, তখনি গোল বাধল। ইংরেজ প্রিন্সিপাল আদেশ করলেন, একটা বিশেষ ম্যাচে কলেজের ক্রিকেট টিমে নামতে হবে। বড় জ্যাঠা-মশাই তো অবাক—'ও তো ছাত্রদের টিম, অন্য কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে খেলা হবে, তাতে আমি কি করে খেলি?' সাহেব বলল, 'কেউ টের পাবে না আমরা জিতে যাব। আমি আদেশ করছি।' শুনে বড় জ্যাঠামশাইয়ের চোখমুখ লাল হয়ে উঠল। বললেন, 'এমন অন্যায় আদেশ আমি মানি

Scanned by CamScanner

না।' বাস্, অমন ভালো চাকরি তখুনি ছেড়ে দিলেন। প্রতিজ্ঞা করলেন, আর কখনো ইংরেজ সরকারের চাকরি করবেন না। করেনও নি। এমন মানুষকে যে বিদ্যাসাগর মশাই খুঁজে পেয়ে তাঁর কলেজে ঢোকাবেন তাতে আর আশ্চর্য কি!

বড় জ্যাঠামশাই বিশ্বাস করতেন যে শুধু ক্লাস-রুমেই মানুষ তৈরি হয় না, খেলার মাঠে গড়েপিঠে মানুষ তৈরির কাজ সম্পূর্ণ করতে হয়। বিদ্যাবুদ্ধি যেমন তীক্ষ্ণ হবে, শরীরও হবে তেমনি বলিষ্ঠ। খেলার মাঠে নিয়ম মেনে চলতে শিখবে ছেলেরা, সময়নিষ্ঠা শিখবে, একসঙ্গে কাজ করা শিখবে। কড়া প্রিন্সিপাল তাই মাঠে গিয়ে ছাত্রদের সঙ্গে বল পেটাতেন। টাউন ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হল অনেকখানি তাঁর উৎসাহে। কত ছেলে যে তাঁর হাতে মানুষ হয়েছিল, এখনো তারা শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁকে মনে করে।

আমার বাবা আর ছোট জ্যাঠামশাইকেও তিনি পাকা খেলোয়াড় বানিয়েছিলেন। বাবার অসাধারণ অঙ্কের মাথা ছিল আর চমৎকার ছবি আঁকার হাত, আর ছোট জ্যাঠামশাই যেমন লিখতেন তেমনি আঁকতেন। বংশে বংশে পারিবারিক দোষগুণ এইভাবে বর্তায়।

বড় জ্যাঠামশাই আমহার্স্ট রো'তে ভাড়াবাড়িতে থাকতেন। সেখান থেকে রোজ হেঁটে গঙ্গাস্নানে যেতেন। গামছা কাঁধে ফিরতেন। কি বলিষ্ঠ জোরালো পৌরুষের মূর্তি, দেখলে দু'দণ্ড তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছা করত, কিন্তু ঐ মর্মভেদী চোখে চোখ পড়লে ভয়ে প্রাণ উড়ে যেত।

আমহার্স্ট রো'র ঐ বাড়িটা আমাদের কাছে পরম আকর্ষণীয় স্থান ছিল। প্রকাণ্ড সেকেলে চক-মেলানো বাড়ি, তার বার-বাড়ির উঠোন, ভেতর-বাড়ির উঠোন, উঠোনের চারদিকে চওড়া বারান্দা, তার উপরে দোতলাতেও আবার ঐ রকম চওড়া বারান্দা। আমরা কলকাতায় আসার কিছুদিন পরেই ঠাকুমা এলেন, সঙ্গে বড় পিসিমা। ছেলেরা সব কলকাতায়, কিন্তু ঠাকুমা দেশের বাড়ি আঁকড়ে পড়ে থাকতেন। একবার খুব বড় ভূমিকম্প হল, প্রায় সব বাড়িই পড়ে গেল। ঠাকুমার বাড়ি যেমন ছিল তেমন রইল। যতক্ষণ না খবর এল, বাবা খেতে পারেন না, শুতে

Scanned by CamScanner

পারেন না। সেই ঠাকুমাকে এই প্রথম দেখলাম।

আমার ছোট পিসিমা, তাঁকে আমরা সোনাপিসিমা বলতাম, আর ঠাকুমা দুজনে দুটি জলচৌকিতে কাছাকাছি বসেছিলেন। পাতলা ছিপ-ছিপে দুজনেই, খুব ফর্সা না হলেও উজ্জ্বল গায়ের রং, মুখেও খুব সাদৃশ্য। ঠাকুমা থেকে থেকে সোনাপিসিমার চুলে হাত দিচ্ছিলেন। সোনাপিসি-মার বয়স তখন হয়তো বছর বেয়াল্লিশ ছিল, দেখাত আরো কম, মোমের ফুলের মতো হাত-পায়ের গড়ন; ঠাকুমারও তাই। ঠাকুমার চোখ সোনা-পিসিমার উপরে। আমরা প্রণাম করলাম, মাথায় হাত দিয়ে একটু আদর করলেন। এখন মনে হয় ঠাকুমার চোখে সোনাপিসিমা হয়তো তখনো সেই ছোট মেয়ে যাকে কোলে নিয়ে তিনি বিধবা হয়েছিলেন।

সোনাপিসিমাও কম বয়সে বিধবা হয়েছিলেন। তাঁর চোদ্দটি সন্তান হয়েছিল, তখন তার মধ্যে তেরটি জীবিত। কয়েক বছরের মধ্যেই পিসিমার ছেলেমেয়েদের মধ্যে যাদের আমাদের কাছাকাছি বয়স, তাদের সঙ্গে আমাদের দারুণ ভাব হল। ছেলেমেয়েরা যেমন দেখতে সুন্দর, তেমনি গানবাজনার শখ। ভারি গুণী পরিবার। নামকরা গাইয়ে মালতী ঘোষাল পিসিমার বড় মেয়ে। বিখ্যাত ক্রিকেটার গণেশ বোস, কার্তিক বোস ওঁর ছেলে। বহু প্রশংসিত ফিল্ম ডিরেক্টর নীতিন বোস আর ক্যামেরাম্যান মুকুল বোসও ওঁর ছেলে। আর সবচাইতে বিখ্যাত যিনি, তিনি হলেন আমাদের পিসেমশাই হেমেন্দ্রমোহন বসু, কুন্তলীন দেল-খোসের আবিষ্কর্তা। তাঁকে খুব ভালো মনে পড়ে না, আমাদের কলকাতা আসার কয়েক বছর আগেই তিনি পরলোকে গেছিলেন। সোনাপিসিমার সুন্দর শরীরে একটিও অলঙ্কার থাকত না, সাদা থান পরা; তবু যখন ভিজে কালো চুল খুলে দাঁড়াতেন, মনে হত সেজেগুজে এসেছেন।

পিসেমশাই ছিলেন আনন্দমোহন বসুর ভাইপো। বহুমুখী প্রতিভা ছিল তাঁর। প্রসাধনী দ্রব্য, নানারকম মিষ্টি পানীয়, পানের মশলা তাম্বুলীন—তাতে নাকি সত্যিকার মৃগনাভি দেওয়া হত—তার আগে আমাদের দেশে খুব বেশি তৈরি হয় নি। উদার হস্তে পিসেমশাই ও তাঁর ছেলেরা সেসব আমাদের বিলিয়ে দিতেন। ১৯২০ সালে, পিসেমশাইয়ের

Scanned by CamScanner

মেজো ছেলে ব্যবসা চালাত, তার বয়স তখন বছর পঁচিশের বেশি নয়। পিসিমাও নিজের চেষ্টায় ইংরিজি শিখে একসময় যথেষ্ট কাজের ভার নিয়েছিলেন।

কলকাতায় প্রথম যাঁরা ফোর্ড গাড়ি কেনেন, পিসেমশাই তাঁদের একজন। প্রথম যাঁরা কণ্ঠস্বর রেকর্ডিং-এর দিকে মন দেন, তিনি তাঁদের অন্যতম। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের গাওয়া "বন্দেমাতরম্" তিনি নিজে রেকর্ড করেছিলেন। দুঃখের বিষয়, সেকালের ঐ সিলিন্ড্রিকেল রেকর্ড বাজাবার যন্ত্র এখন দুষ্প্রাপ্য। তবে রেকর্ডটি নাকি এখনও আছে। ফিল্মের ব্যাপারেও পিসেমশাইয়ের যথেষ্ট উৎসাহ; বাড়িতে প্রজেক্টর ছিল; আমার যখন পাঁচ বছর বয়স, ঘরে বসে আমাদের ফিল্ম দেখিয়েছিলেন মনে আছে। এই অসাধারণ মানুষটিও বেশি দিন বাঁচেন নি।

সেদিন আমহার্স্ট রোর ঐ বারান্দায় বসে অবিশ্যি এত কথা জানতাম না। তখন শুধু মা-মেয়েকে একসঙ্গে দেখে বড় ভালো লেগে-ছিল। সত্যি কথা বলতে কি, আত্মীয়স্বজনদের মিলনক্ষেত্র বলে ও-বাড়িটার আসল আকর্ষণ ছিল না। বড় জ্যাঠামশায়ের বড় ছেলের ছেলেরা ও তাঁর ছোট মেয়ে ইত্যাদি আমাদের অনেক সমবয়সী ছিল ও-বাড়িতে। তারা বলত ওখানে নাকি ভূতের উপদ্রব হয়। শুনে আমাদের গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠত। রাতে ভূতেরা ছাদে ভারি ভারি রোলার গড়ায়, একতলা থেকে তার শব্দ শোনা যায়, বাড়ি কাঁপে। অথচ ছাদে গেলে দেখা যায় সব ফাঁকা, কেউ কোথাও নেই। তা ছাড়া ছোটদের কারো বেশি অসুখ করলে সে নাকি রোগা রোগা লম্বা লম্বা সাদা মূর্তি দেখতে পায়, যা অন্যরা কেউ দেখতে পায় না।

তাছাড়া একদিন নেনিদি—আমার চেয়ে বছর দুয়ের বড়—আরো সাংঘাতিক কথা বলল। একবার নাকি তার ম্যালেরিয়া হয়েছিল, গভীর রাতে ওর বড় বোন খুকনুদিকে সঙ্গে নিয়ে উঠে, বারান্দায় বেরিয়ে দেখে ভেতরবাড়ির উঠোনে লণ্ঠনের মিটমিটে আলোতে সাদা শাড়ি পরা চারটে বৌ বাসন মাজছে। কল থেকে জল পড়ছে, তার শব্দ শোনা যাচ্ছে, অথচ সবাই জানে অত রাতে কলে জল থাকে না। একজন বৌ এক-

Scanned by CamScanner

গোছা মাজা থালা নিয়ে যেই উঠে দাঁড়িয়েছে, ওপরের বারান্দার দিকে চোখ পড়েছে। অমনি পাশের বৌকে ঠেলা দিয়ে আঙুল দিয়ে নেনিদিদের দিকে দেখিয়ে দিয়েছে। নেনিদিদের তো হাত-পা ঠাণ্ডা! নিমেষের মধ্যে ভোজবাজির মতো সব মিলিয়ে গেল, কোথায় বা লণ্ঠন কোথায় বা কলের জল!

এইসব গল্প আমরা শুনতাম। আরো শুনতাম যে সবাই এসব ভৌতিক ব্যাপার দেখতে পায় না, বিশেষ ক্ষমতা থাকা চাই। আমাদের বংশের অনেকের নাকি সে ক্ষমতা আছে। বড়রাও কথা সমর্থন করে, বড় জ্যাঠামশাইয়ের এম-এ পরীক্ষার গল্প বলেছিলেন। গল্পটি বাস্তবিক অদ্ভুত এবং আমার সব গুরুজনদের মিথ্যাবাদী না বলে অস্বীকারও করা যায় না।

অঙ্কের পরীক্ষার আগে বড় জ্যাঠামশাইয়ের খুব অসুখ হল, বই ছুঁতে পারলেন না। সেরে উঠেও ভালো করে তৈরি হতে পারলেন না: বিশেষ করে প্রথম পেপার সম্পর্কে মনে বড় ভয়। পরীক্ষার আগের দিন খুব মন খারাপ করে শুতে গেলেন। ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলেন যেন পরীক্ষার হলে গেছেন, সিট পড়েছে মস্ত একটা থামের পাশে, সামনে একটা থান ইঁট পড়ে আছে। এমন সময় প্রশ্নপত্র দিয়ে গেল। স্বপ্নে জ্যাঠা-মশাই কম্পিত হস্তে প্রশ্নপত্র খুলে সবটাকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। অমনি ঘুম ভেঙে গেল। অসাধারণ স্মৃতিশক্তি, উঠে বসে মনে করে দেখেন সব প্রশ্ন মনে আছে। আর ঘুম নয়, বই খাতা নিয়ে ঐ প্রশ্নগুলিকে একেবারে সড়গড় করে ফেললেন। যথাসময়ে হলে গিয়ে দেখেন থামের পাশে সিট, সামনে ইঁট। প্রশ্নপত্র দিয়ে গেলে দেখেন সেই প্রশ্নই বটে। আর তাঁকে পায় কে?

আমার সেজ জ্যাঠামশাইয়ের নাম মুক্তিদারঞ্জন, তিনিই ঐ মেট্রো-পলিটান কলেজের অঙ্কের অধ্যাপক। চেহারায়ও বড় জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে অদ্ভুত সাদৃশ্য, সেই রকম চুল-দাড়ি, সেই রকম বলিষ্ঠ গড়ন। বলতে গেলে এক রকম দাদার হাতেই গড়া। তাঁকে আমরা সুন্দর জ্যাঠামশাই বলতাম, রূপের জন্য নয়, সত্যি কথা বলতে কি, মেজো জ্যাঠার আরো

Scanned by CamScanner

সুন্দর চেহারা ছিল; তবে আমাদের দেশের ঐ রকম নিয়ম ছিল, মিষ্টি মিষ্টি ডাক। বড়দাদা হলেন ঠাকুরদাদা, তারপর সুন্দরদাদা, ধনদাদা, রাঙাদাদা ইত্যাদি। দিদিদের বেলাও তাই। চেহারার জন্য এসব ডাক নয়, ভালোবাসার জন্য কালোরা হল রাঙা, কুৎসিতরা হল ফুল।

সুন্দর জ্যাঠামশাইয়ের গায়ে অসুরের মতো বল ছিল, এককালে খেলার মাঠে গুণ্ডা গোরা সেপাইরাও তাঁর ভয়ে জুজু ছিল। সেকালের গোরা সেপাইরা অনেক সময় শরীরের ও বুটের জোরে খেলা জিতত, আইনকানুনের অতটা ধার ধারত না। কায়দা করে জখম করে প্রতি-যোগীদের ধরাশায়ী করাই ছিল তাদের প্রধান উদ্দেশ্য। একবার সুন্দর জ্যাঠামশাই কসরৎ করে বল নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন, এমন সময় দর্শকরা শুনতে পেল একটা ষণ্ডামার্কণ্ড গোরা আরেকটা ষণ্ডামার্কণ্ডকে চাপা গলায় বলছে 'নক দ্যাট বিয়ার্ডেড ফেলো ডাউন!' অর্থাৎ দাড়িওয়ালাকে পেড়ে ফেল। অন্য গোরাটা মাথা নেড়ে বলল, 'নট্ সো ঈজি!' অর্থাৎ অত সোজা নয়। সম্ভবত এর আগেও সে চেষ্টা করে দেখেছিল।

লোহার মতো দেহে বজ্রের শক্তি সুন্দরজ্যাঠার। তাতে ঠাণ্ডা মাথা, অসীম ধৈর্য আর সে যে কি কোমল মনটা। দেহের রাগের বালাই ছিল না, এ বিষয়ে বড় জ্যাঠামশাইয়ের একেবারে উল্টোটি। বাবার কাছে শুনেছি, প্যারালেল বারের ওপরের বারে দুটো হাত ভর করে, আস্তে আস্তে নিজের শরীরটাকে ওপরে দিকে তুলতেন। বার যখন হাঁটুর কাছে আর হাত দুটো টান হয়ে নিচের দিকে, তখন বাবাকে আর ছোট জ্যাঠামশাইকে ডেকে বলতেন, 'কুইল্যা শম্ভুয়া, ঝুইলা পড়।' অমনি বাবারা সুন্দর জ্যাঠামশাইয়ের দুই পা জাপটে ধরে, শরীরের সমস্ত ওজন দিয়ে ঝুলে পড়েও তাঁকে এক ইঞ্চি নামাতে পারতেন না।

এই আশ্চর্য মানুষটি অস্বাভাবিক রকমের চুপচাপ থাকতেন। তাঁর ছাত্ররাও জানত না কি অসাধারণ মেধা তাঁর। একবার কোন মৌলিক গবেষণা করে তার ফলাফল ইংল্যান্ডের কোনো বিখ্যাত গণিতশাস্ত্রবিদ্‌কে পাঠিয়ে দিলেন, দুঃখের বিষয় ঐ সাহেবের অঙ্কের বইয়ের যখন নূতন সংস্করণ হল, তার মধ্যে সুন্দর জ্যাঠামশাইয়ের সিদ্ধান্তটি দেখা গেল,

Scanned by CamScanner

কিন্তু নামটি নয়। প্রায় আশি বছর বয়সেও দেখেছি মন ভালো করার জন্য জ্যাঠামশাই অঙ্ক কষছেন। শুনেছি হেন অঙ্কের সমস্যা ছিল না যা তিনি সমাধান করতে না পারতেন।

Scanned by CamScanner

॥ তেরো ॥

বলেছি-ই তো বেশি দিন থাকতে হয় নি বোর্ডিং-এ, তিন মাস না যেতেই ভবানীপুরে নিরিবিলি একটি ছোট্ট বাড়ি পাওয়া গেল, তাও মাত্র তিন মাসের জন্য। তারপর কি হবে? আবার বোর্ডিং-এ যেতে হবে না তো? মা বললেন, 'তিন মাসের মধ্যে দেখেশুনে একটা বাড়ি নেওয়া যাবে এখন।' অমনি সব দুর্ভাবনা দূর হয়ে গেল। প্রায় বারো বছর বয়স, তখনো ভাবি এমন অবস্থা নেই মা যার ব্যবস্থা করতে না পারেন।

ছোট্ট বাড়ি, একতলায় দুখানি ঘর, রান্নাঘর, একটা স্নানের ঘর, টুক-টুক করছে লাল সানবাঁধানো মেঝে। দোতলায়ও দুখানি ঘর, স্নানের ঘর, রান্নাঘরের উপরের ঘরের দরজায় মস্ত তালা ঝোলানো; যাঁদের বাড়ি তাঁদের জিনিসপত্র সেখানে বন্ধ করা। দরজায় একটা ফুটো, তাতে চোখ দিয়ে ভিতরে দেখতে চেষ্টা করি; অন্ধকারে ভরা, কিছু দেখা যায় না। ভাবি, না জানি কত দামী দামী জিনিস আছে! এত সুন্দর বাড়িতে যারা থাকে, তাদের নিশ্চয় অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিসও আছে।

খুব সুন্দর মনে হয়েছিল বাড়িটা, আমাদের চেনা একজনরা ওর ভাড়াটে, তাঁরা তিন মাসের জন্য কোনো স্বাস্থ্যকর জায়গায় গিয়েছিলেন, তাই বাড়িটা পাওয়া গেল। ভাড়া নাকি পঁয়তাল্লিশ টাকা। তাতে একটুও আশ্চর্য হই নি কেউ। সে সময় ভবানীপুরের ছোট রাস্তায় ঐ রকমই ভাড়া ছিল। আস্ত বাড়ি নয়, একটা বড় বাড়ির পিছনের দিকটা। তাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। খিড়কি দোর দিয়ে ঢুকতে হত, ঢুকেই সান-

Scanned by CamScanner

বাঁধানো উঠোন : উঠোনের ধারে নারকেল গাছ, লেবু গাছ, সজনে গাছ, তাতে ফল ধরে রয়েছে। খিড়কি দোরের মাথায় মোমলতা, তাতে ছড়া ছড়া গোলাপী ফুল ফুটেছে। মুখ তুলে দেখি পাশের একতলা বাড়ির খোলা ছাদে বাথরুমের পটে করে তারা গোলাপফুল ফুটিয়েছে। দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল, মনে হল এ জায়গাটা আমাদের পাহাড়ের সেই বড় আদরের লম্বা বাড়িটারই মতো সুন্দর। তবে অন্য রকম।

এখানে সরল গাছের লম্বা পাতার মধ্যে দিয়ে বাতাস বয়ে যাওয়ার সোঁ সোঁ শব্দ নেই বটে, কিন্তু দুপুরবেলায় পাড়া যখন নিঝুম হয়, তখন একটা লোক ডেকে যায় বে-লো-য়া-রি-চু-ড়ি চাই বা-লা চাই। মা একদিন তাকে ডেকেছিলেন, দিদি আর আমি দু'হাত ভরে সাদা নীল বেঁকি চুড়ি, রেশমী চুড়ি পরেছিলাম, এক পয়সা জোড়া তার দাম!

আরেকটা লোক গলায় শব্দ করে না, কিন্তু কাঁসার বাসন বাজিয়ে যায়। সন্ধ্যাবেলায় মাটির হাঁড়ি মাথায় করে কুলপি বরফওয়ালা হেঁকে যায়। এমন ভালো জিনিস আমরা কখনো খাই নি।

ভারি ভালো লাগল কলকাতা শহরটাকে। এ বাড়িতে আমাদের চেনা পুরনো আসবাব কিছুই ছিল না। খানকতক চেয়ার-টেবিল তক্তা-পোশ ছাড়া কিছুই ছিল না। কিন্তু তার কি-ই বা দরকার ছিল? রাতে আমরা তিনতলার খোলামেলা ঘরে ঢালা বিছানা পেতে ঘুমোতাম। ঝির ঝির করে দখিন হাওয়া বইত, মশারি লাগত না; সেকালে ভবানীপুরে মশাও ছিল না, কারো মশারিও ছিল না। বাক্স থেকে চেনা বাসন বেরুল, পুরনো পর্দাগুলি টাঙানো হল, রঙচটা ফুলদানিতে মোমলতার ছড়া সাজানো হল। এই আমাদের বাড়ি, এইখানে মা'র সঙ্গে পরম নিশ্চিন্তে আমরা বাস করতে লাগলাম।

ক্রমে আত্মীয়স্বজনরা আমাদের বাড়িতে বেড়াতে আসতে লাগলেন। একদিন সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র বলে একজন টিকোলো নাক, টাক মাথা, হাসি-খুশি মোটাসোটা লোক এলেন, দু'হাতে দুটি পেলিটির কেকের বাক্স! তিনি আমাদের বড় মেসোমশাই, শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ফিজিক্সের অধ্যাপক, অবসর যাপন করেন পড়াশুনা ও বেনামায় কবিতা লিখে।

Scanned by CamScanner

আমার চেয়ে বত্রিশ বছরের বড় মেসোমশাইকে দেখামাত্র আমার মনের মতো মানুষ বলে চিনতে পারলাম। শুনেছিলাম তাঁর গানের গলা চমৎকার, মাঘোৎসবে তাঁর একক সঙ্গীতে কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের ব্রহ্ম-মন্দিরের ছাদ অবধি গমগম করত, গলায় তাঁর তিনটি অক্টেভ খেলা করত। তবে সেজন্য তাঁর সঙ্গে আমার অমন গভীর সম্বন্ধ নয়। মেসো-মশাই আমার অটোগ্রাফ খাতায় যেই লিখলেন,—

"গ্রামোফোনের চাক্‌তি খানার নানান রেখার ফাঁকে
সুরের পাখি গুটিয়ে পাখা লুকিয়ে যেমন থাকে,
তেমনি তোমার খাতার পাতার হিজিবিজি লেখায়
আমার গানের মৌন তানের সুরের লিপি ঘুমায়।
যদি সে ঘুম ভাঙতে পার, খুলে যাবে কান,
শুনতে পাবে জড়ের ফাঁকে পরমাণুর গান।"

মনের মধ্যে গুঞ্জরিয়ে উঠতে লাগলো কথাগুলো ; আমি আমার মেসোমশাইয়ের আজীবন ভক্ত হয়ে রইলাম। অনেক পরে যখন বুদ্ধি হল, বুঝলাম মেসোমশাইয়ের মনের মধ্যে কত কাব্যের সম্ভাবনা রয়েছে! কিন্তু দুঃখের বিষয়, বিদেশী কবিতার বাংলা অনুবাদ করেই তিনি এত সময় কাটালেন যে নিজেরগুলি সামান্যই লেখা হল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে সাতষট্টি বছর বয়সে লখ্‌নউএ তিনি পরলোক গমন করেন। কয়েকটি কবিতার বই তাঁর প্রকাশিত হয়েছিল, ব্রাউনিং পঞ্চাশিকা, জাপানি ঝিনুক ইত্যাদি, প্রত্যেকটি কবিতা অপূর্ব কিন্তু তবু তাঁর নিজের নয়। অনেক গুণী ভক্ত ছিল তাঁর; তাঁদের মধ্যে জাতীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও পরলোকগত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ঘোষ ও সঙ্গীতজ্ঞ লেখক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ইত্যাদির নাম করা যায়।

শিবপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের মস্ত হাতার মধ্যে মেসোমশাইয়ের একতলা কোয়ার্টারে কত সুখের দিন কাটিয়েছিলাম। চারদিকে ফলগাছ, ফুলগাছ, ঝোপঝাড়, কেয়ারি করা বাগান নয়, গাছপালাগুলো মনের আনন্দে বিকশিত হয়ে রয়েছে। আম গাছে আম ঝুলছে, পেয়ারা, লেবু, কাঁঠাল, বেল, ঘুরে ঘুরে সাধ মিটত না। মেসোমশাইয়ের পড়ার ঘরের

Scanned by CamScanner

মাটি থেকে ছাদ অবধি কাঠের আলমারি বই দিয়ে ঠাসা। মেসো-মশাইয়ের একমাত্র সন্তান নোটন, সেই আমার ছোটবেলাকার রূপসী মাসতুতো বোন। এখন যেন আরো সুন্দরী হয়ে উঠেছে, গান গায়, ছবি আঁকে আর কি যে তার মিষ্টি কথা।

মাঝে মাঝে শোবার আগে নোটন আমার কাছে চিরুনি ফিতে নিয়ে চুল বাঁধতে আসত: চুল তো নয় কালো কালো আঙুরের গুচ্ছ। আমি সেগুলোকে চিরুনি দিয়ে টেনে হিঁচড়ে মাথার উপরে উন্‌দো করে এঁটে এক ঝিনুকি বেঁধে, মুখটাকে ঘুরিয়ে দেখতাম যেন প্রাচীন গ্রীক-শিল্পীর হাতে গড়া অয়না মূর্তি। একরকম রূপ আছে তাকে কিছুতেই অসুন্দর করা যায় না: আমার মাসতুতো বোন নোটন ছিল সেইরকম জাত-সুন্দরী। কিন্তু এখন আর একটুও হিংসে হত না, অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতাম। হিংসে হয় সমানে সমানে, নিদেন যেটাকে আয়ত্তের মধ্যে বলে মনে হয় তাই নিয়ে: নাগালের বাইরে যা, তাই দেখে বিস্ময় হয়, ঈর্ষা হয় না।

আমার বড় মাসিমা ছিলেন গম্ভীর প্রকৃতির, ইন্‌টেলেকচুয়েল, সেকালে বি-এ পাস করা, মেয়ের রূপগুণের গর্বে গরবিনী, মনের মধ্যে ছোট কিছু স্থান পেত না: কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁকে নিয়ে আমরা অনেক সময় হাসাহাসি করতাম।

আমার জ্যাঠামশাইরা ছিলেন অন্যরকম। খেলাধুলো হাসি-তামাশা আর ছোটদের জন্য বই লেখা, ছবি আঁকানো, বই ছাপানো, এই নিয়েই তাঁদের সময় কাটত। বড় জ্যাঠামশাইয়ের কথা অবিশ্যি আলাদা, যখন-তখন ছোট ভাইয়ের বাড়িতে আসার তাঁর সময় কোথায়! তবে সুন্দর জ্যাঠামশাইয়ের আর ছোট জ্যাঠামশাইয়ের একতলা থেকে 'শম্ভুয়া' ডাক এখনো যেন শুনতে পাই। ছুটির দিনে একসঙ্গে ক্রিকেট খেলা দেখতে যাওয়া ছিল ভারি এক মজার ব্যাপার। আমাদের বাড়িতে একসঙ্গে তিন ভাইয়ের খাওয়া হত, তারপর সারাদিনের মতো ইডেন গার্ডেন। সে ইডেন গার্ডেনও ছিল অন্যরকম; মাঝখানে ক্রিকেট গ্রাউন্ড, চারিদিকে বাগান। গেট গ্যালারির বালাই ছিল না।

Scanned by CamScanner

এক-আধবার ছোট জ্যাঠামশাই আমাদের খেলা দেখতে নিয়ে গিয়েছিলেন, ক্রিকেট-উৎসাহী কয়জন ছাড়া সাধারণ লোকের ভিড় হত না তখন। সাধারণ লোকে তখনো ক্রিকেট সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে নি; ভিড় হত ফুটবলের আর হকির মাঠে, সেখানে তখনি গ্যালারি বাঁধা ছিল।

ছোট জ্যাঠামশাইয়ের অর্থাৎ কুলদারঞ্জনের ভাত খাওয়ার পর্বটি ছিল বেশ চিত্তাকর্ষক। তিনি যখন স্নান করতে যাবেন, তখন তাঁর ভাত চাপাতে হবে, তার আগে নয়। ভাত হবে মোটা সিন্ধচালের, অন্যদের জন্য যে সরু আতপ রান্না হত তা তিনি খেতেন না। বেশ শক্ত ঝরঝরে ভাত হবে, যাতে একটু উঁচু থেকে কাঁসার থালায় ফেললে চুন-চুন শব্দ হয়। চা-ও খেতেন অন্যদের চেয়ে একটু অন্যরকম, নিজের গায়ের রঙের সঙ্গে মিলিয়ে। বলা বাহুল্য মসূয়ার কুলদারঞ্জনের গায়ের রংটি মোটেই ফরসা ছিল না, যদিও তাঁর বাবার শুনেছি দুধে-আলতা রং ছিল।

ছোট জ্যাঠাকে কানা তোলা থালা দিতে হত, সুগঠিত আঙুল দিয়ে পরিপাটি করে ভাত মাখতেন। একদিন ভাইদের সঙ্গে খেলা নিয়ে খুব তর্ক করতে করতে—ওঁদের খেলার গল্প মানেই ছিল মতভেদ—এক গ্রাস তুলে খেয়ে, হাঁচড়-পাঁচড়ে আর থালা খুঁজে পান না যে পরের গ্রাসটি তুলবেন! তাকিয়ে দেখেন তাঁর সামনে থালা নেই, কিন্তু তাঁর কোলের কাছে বসে আমার তিন বছরের ছোট বোনটি পরম তৃপ্তি সহকারে তাঁর মাখা ভাত তুলে খাচ্ছে! অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকাতে ছোট্ট হাবু মুখ তুলে বলল, 'এটা আমার থালা, জন্মদিনে পিসিমা দেছে।' অগত্যা জ্যাঠামশাইয়ের নতুন থালা গ্রহণ।

মাছ ধরার শখ বাবার তেমন ছিল না, পুকুরপাড়ে সারাদিন ছিপ নিয়ে বসে থাকা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। মাছ ধরতে যেতেন সুন্দর জ্যাঠা ও ছোট জ্যাঠা। অপূর্ব ছিল তাঁদের মাছ ধরার গল্প; কিন্তু আমাদের মনে হত গল্প যতই শুনি না কেন, মাছ তো কই খুব দেখা যায় না! একদিন এই কথা বলাতে ছোট জ্যাঠা চটে গেলেন—'বেশ, আজ যা ধরব, সব দিয়ে যাব।' আমরা ভাবলাম ধরবেন তো কাঁচকলা; সারা দুপুর কোন এক জমিদারের পুকুরধারে চুপটি করে ছিপ নিয়ে বসে থাকবেন ; কাউকে

Scanned by CamScanner

কাছে আসতে দেবেন না; কথা বলা দূরে থাকুক জলে কারো ছায়া পড়লেও পাছে মাছ পালায় তাই সতর্ক দৃষ্টি! যার পুকুরে যাচ্ছেন, সে ভদ্রলোক নিজে মোটে মাছ ধরতে পারেন না, কিন্তু মাছ ধরাতে মহা উৎসাহ এবং যাঁরা মাছ ধরেন তাঁদের আদর-আপ্যায়ন করতে পারলে আর কিছু চাইতেন না। কাজেই বোঝাই যাচ্ছে যে মধ্যাহ্ন-ভোজনটি খুব মন্দ হত না। তারপর আবার পুকুরপাড়ে বসে ঝিমুনো। জ্যাঠামশাইরা মাছ ধরবেন, না হাতি ধরবেন!

সেদিন কিন্তু ঠিক সন্ধ্যা লাগতেই একতলায় হাঁকডাক—'কই, তোরা কোথায় গেলি, মাছ নিয়ে যা!' গিয়ে দেখি পাঁচসেরি এক কাৎলা মাছ হাতে ধরে জ্যাঠামশাই চ্যাঁচাচ্ছেন। তাছাড়া থলির মধ্যে আরো কয়েকটি ছোট মাছ। আমরা তো লজ্জায় মুখ লুকোবার জায়গা পাই না; মনে মনে ঠিক করলাম, এখন থেকে সব মাছ ধরার গল্প বিশ্বাস করব। সব চেয়ে মজার কথা হল যে সুন্দর জ্যাঠামশাই বাড়ি গিয়ে যেই না বলেছেন যে পাঁচসেরি কাৎলা ধরে আমাদের বাড়িতে দিয়ে গেছেন, সেখানেও সবাই হেসে কুটোপাটি! কেউ বিশ্বাস করতে চায় না।

বড় জ্যাঠামশাইও মাছ ধরতে যেতেন। তিনি একটা মাছ ধরার চার তৈরি করেছিলেন, তার নাম দিয়েছিলেন 'ইধার আও'! সেই চারের গন্ধে নাকি কোনো মাছ দূরে থাকতে পারত না। তাই দেখে ওঁদের বন্ধু, বিখ্যাত শিশু সাহিত্যিক যোগীন্দ্রনাথ সরকারও একটা মাছ ধরার চার করলেন, তার নাম রাখলেন 'উধর মৎ যাও'! আমাদের ভাবতে ভালো লাগে যে বড় জ্যাঠামশাইয়ের চারটাই বেশি ভালো ছিল।

কয়েক বৎসর আগে কর্ড লাইনের একটা প্যাসেঞ্জার ট্রেনে শান্তি-নিকেতন থেকে ফিরছিলাম। গাড়ির বাতি এমনিতেই মিটমিট করে জ্বলছিল, স্টেশনে গাড়ি থামলে একেবারেই নিবে যাচ্ছিল। এমন সময় ডানকুনি স্টেশনে পৌঁছতেই ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে কয়েকজন লোক উঠল। সঙ্গে তাদের ছোটখাটো মেলা জিনিসপত্র। কি জানি কেন, তারা উঠতেই আমার কতকাল হারানো জ্যাঠামশাইদের জন্য মন কেমন করে উঠল! ট্রেন চলতেই মিটমিট করে বাতি জ্বলল, দেখি তারা মাছ

Scanned by CamScanner

ধরে ফিরছে, সঙ্গে ছিপ, মোড়া, চুপড়ি আর ঘরময় মাছ ধরার মশলার গন্ধ ভুরভুর করছে।

ততদিনে বাবা পাহাড়ের পাট গুটিয়ে কলকাতায় চলে এসেছেন, রসা রোডে দোতলার উপর বেশ ভালো একটি ফ্ল্যাট নেওয়া হয়েছে। সেই আমাদের প্রথম ফ্ল্যাটে বাস; সেখানে এক হাতও জায়গা ছিল না যে একটি চারাগাছ পুঁতি ; ছাদের উপরে মাটির টবে মা কিছু গাছপালা করতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু চড়াই আর শালিকপাখি তার একটিও পাতা বাকি রাখত না। তবু দেখার জিনিসের অন্ত ছিল না। দুপুরে বড় ঘরে ঢালা বিছানায় শুয়ে শুয়ে দেখতাম বন্ধ খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে আলো ঢুকেছে ঘরে, সেই আলোতে দেয়ালে দেখতাম রাস্তায় যত গাড়িঘোড়ার ছোট ছোট উল্টো ছায়া পড়ছে, মাথাটা নিচের দিকে, পাগুলো উপরে।

দাদা হেয়ার স্কুলে পড়ত ; কল্যাণ আর সরোজ হাতের গোড়ায় এল-এম-এস্ স্কুল ছিল ; সেখানে যেত। দিদি আর আমি আগের স্কুলেই পড়তাম, হেঁটে যাওয়া-আসা করা যায় এত কাছে। স্বদেশী আন্দোলনের বছর, তিলক মারা গেলেন, তাই নিয়ে দেশজোড়া আন্দোলন। ভাইদের স্কুলে পিকেটিং শুরু হল, ছোটখাটো মারামারিও হল। একবার একজন গোরা পুলিস ইন্সপেক্টর এল-এম-এস্ স্কুলের সামনে দাঁড়িয়েছিল, ছেলেরা পিছন থেকে তাকে ঢিল মেরেছিল। ব্যাপার শুনে ওদের হেডমাস্টার বলেছিলেন, 'নিরস্ত্র শত্রুকে পিছন থেকে ঢিল মেরে কি তোমরা দেশটাকে স্বাধীন করবে?' হেডমাস্টারের নাম সুধীর চ্যাটার্জি, বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড়।

বাবা জ্যাঠামশাইরা পথে-ঘাটে আন্দোলন করা পছন্দ করতেন না। তাঁদের দেশসেবার ধারণা অন্যরকম ছিল। কখনো কোনো সাহেবের খোশামোদ করতেন না; বিপদে পড়লে কখনো পিছপাও হতেন না; বলতেন ভীতু মন আর দুর্বল শরীর দিয়ে কিছু করা যায় না। নিজেদের লোহার মতো শরীর ছিল, শরীরটাকে সুস্থ রাখা তাঁদের ধর্ম ছিল।

আমাদের স্কুলের লাইব্রেরি থেকে দিদি আর আমি প্রতি সপ্তাহে দুটি করে বই আনতাম ; কাছেই আমাদের কলেজ বিভাগের দুটি মেয়ে

Scanned by CamScanner

থাকত, তারাও কলেজ লাইব্রেরি থেকে দুটি করে বই আনত। নিজেদের মধ্যে বই চালান হত ফলে চারজনে প্রতি সপ্তাহে চারটি করে বই গিলতাম। তার মধ্যে ভালো মন্দ উপযুক্ত অনুপযুক্ত সবরকম বই থাকত, তবে স্কুল-কলেজের লাইব্রেরি, মন্দ বই থাকার উপায় ছিল না। বলা বাহুল্য এ সবই ইংরিজি বই ; বাংলা বই মা আনাতেন। তেরো বছর বয়েসে শরৎচন্দ্রের বই পড়ছি দেখে বড় মাসিমা স্তম্ভিত। মাকে বললেন, 'ওরে, ওসব পড়ে যদি ওরা খারাপ হয়ে যায়?' মা একটু হেসে বললেন, 'তা হলে আর কিছুতেই ওদের খারাপ হওয়া ঠেকানো যাবে না।'

বড় মাসিমা এত স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন না। দিদিকে জন্মদিনে কে যেন গল্পগুচ্ছ তিনখণ্ড উপহার দিয়েছিল, মাসিমা বইগুলি নিয়ে যেসব গল্পে কবিগুরু মাত্রা লঙ্ঘন করেছেন, তার পাশে ছোট্ট একটি দাগ দিয়ে মেয়েকে বললেন, 'এগুলি পড়ার দরকার নেই'। কিন্তু বার বার সে-গুলিকে মন দিয়ে পড়েও মন্দ কিছুর সন্ধান না পেয়ে দিদির আমার সে কি নৈরাশ্য!

Scanned by CamScanner

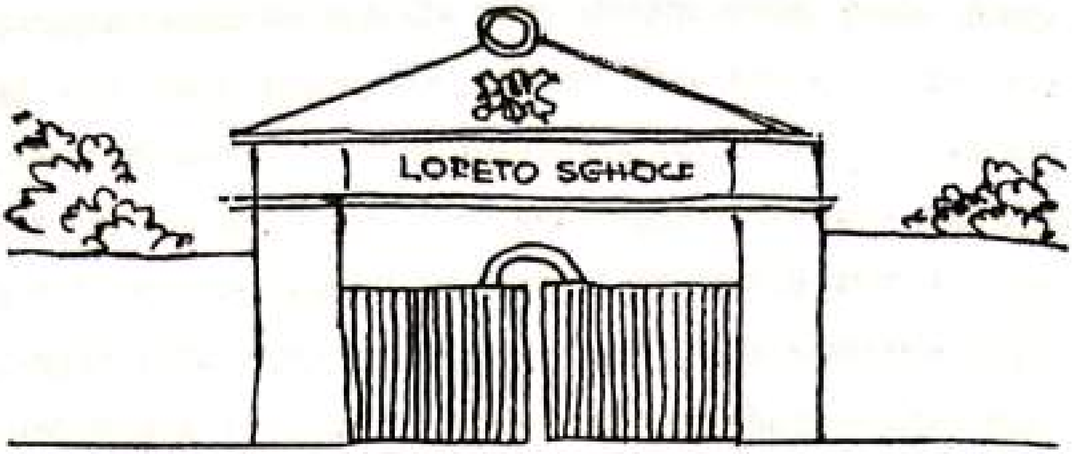

॥ চোদ্দ ॥

ততদিনে ছোটবেলাকার সেই শৈলশিখরে বাস যেন কোন স্বপ্নে দেখা দেশের মতো হয়ে গিয়েছিল। অথচ মাত্র একটি বছরের ব্যবধান। এরি মধ্যে আমরা পুরোপুরি কলকাত্তাইয়া হয়ে উঠলাম। যে স্কুলকে একদিন বিষচোখে দেখতাম, সে-ই আমাদের হৃদয় জুড়ে বসল। বাস্তবিক ঐ একটা নিজস্ব আবহাওয়া ছিল, যেটা চিনে নিতে কিছুদিন সময় লেগেছিল। এখানে পড়াশুনার মান যে অনেক উঁচু সেটা বুঝে নিতে দেরি হল না। ছবি আঁকতেন একজন নিরীহ যুবক, তাঁর ভালোমানুষির উপর আমরা যথেষ্ট অত্যাচার করতাম। সেলাই শেখাতেন একজন দক্ষিণী খ্রিস্টান মহিলা। গান শেখাতেন একজন চার-মণী ফিরিঙ্গি মহিলা, কিন্তু গলায় তাঁর কোকিলের বাসা ছিল। সংস্কৃত পড়ি নি, অথচ ইংরিজি বাংলা ছাড়াও তৃতীয় একটা ভাষা শেখা দরকার। ম্যাট্রিক দিতে হলে তাই নিয়ম ছিল। লোরেটোতে আমরা ফরাসী ভাষা শিখতাম ফরাসী নান্‌দের কাছে, তাই এখানেও ফরাসী নিলাম।

নিলাম তো বটে, কিন্তু ফরাসী পড়াবার মানুষ কই? একজন কালো মেমসাহেব সাহস করে ভার নিলেন, রোজ ধৈর্য ধরে পরদিনের পড়াটি আমাদের কাছে শিখে নিয়ে, খুব মন দিয়ে পড়াতেন। এই নিয়মে আমরা দুজনেই বেশ ভালো নম্বর পেয়ে পরে ম্যাট্রিক পাস করেছিলাম। আমাদের সময় সকলেই তিনটে ভাষা শিখতে অভ্যস্ত ছিল, তাই নিয়ে কেউ বড় একটা মাথা ঘামাত না।

Scanned by CamScanner

এখন আবার নতুন করে কি হল তাই ভাবি। এবং পণ্ডিতরা যাই বলুন, সংস্কৃত না শিখলে বাংলা শেখা যায় না, এ কথা যে কত ভুল নিজের জীবনেই তার অনেক প্রমাণ দেখেছি।

ছোট বোনটা আবার সিঁড়ির ধাপে বসে থাকা ধরল, কখন আমি স্কুল থেকে ফিরি তারই অপেক্ষায়। তাকে গল্প বলে শেষ করা যায় না। যখন পড়া গল্প সব ফুরিয়ে গেল, তখন না বানিয়ে উপায় রইল না। কুঁৎকুতেরাম পাঁড়ে নামক একজন গোবেচারা নায়কের অবতারণা করতে হল। যত রাজ্যের অদ্ভুত ও অভাবনীয় অভিজ্ঞতা তার কপালে জুটত, এদিকে বেচারা নিজের বৌয়ের ভয়ে জুজু। শেষে এমন দাঁড়াল যে সচিত্র গল্প না বললে মেয়ে খুশি হয় না। তখন শ্লেট-পেন্সিলের স্মরণ নেওয়া ছাড়া গতি ছিল না। দেখতে দেখতে কুঁৎকুতের আত্মীয় কুটুম্ব সম্বলিত বিশাল গুষ্টির প্রত্যেকের এক-একেকটি চেহারা নির্ধারিত হয়ে গেল এবং সব চেয়ে মুশকিলের কথা হল ঐ কপোলকল্পিত চেহারার সঙ্গে মিলিয়ে পরবর্তী গল্পের চেহারাগুলি আঁকতে হত।

একদিন ছোট জ্যাঠামশাই আমার ঐ হিজিবিজি আঁকা দেখে বাবাকে বলে আমাকে ভালো করে আঁকা শেখাবার জন্য একজন মাস্টার-মশাই নিযুক্ত করে দিলেন। তাঁর নাম ছিল পরেশবাবু; খুব যত্ন নিয়ে শেখাতেন, কিন্তু শুধু কপি করাতেন, প্রথমে অন্য ছবি থেকে, তারপর সামনে কোনো বস্তু থেকে। এদিকে কুঁৎকুতের দল কেবলি মনের মধ্যে হাঁচড়পাঁচড় করতে থাকে। অথচ পরেশবাবু নিজের মতো ছাড়া অন্য কোনো ধরন বরদাস্ত করতে পারতেন না। ফলে কুঁৎকুতেরা আজো মাঝে মাঝে আমার মনে অশান্তি করে।

সেকালে শিক্ষিত পরিবারের অভিভাবকরা মেয়েদের গান গাইতে পারাটাকে অত্যাবশ্যক মনে করতেন, তা সে গলা ও কান থাক্ বা না-ই থাক্। দিদিকে আমাকে তাই শ্রীযুক্তা বি. এল. চৌধুরীর সঙ্গীত সম্মেলনীতে ভর্তি করে দেওয়া হল। সেখানে আমরা এঞ্জেল স্মিথ সাহেবের কাছে পাশ্চাত্য কেতায় বেহালা বাজাতে ওস্তাদের কাছে বাঙালি কেতায় গান গাইতে শিখব, গুরুজনদের এই ছিল আশা। রবিবারে রবিবারে

Scanned by CamScanner

ক্লাস হত, ঠিকেগাড়ি নিয়ে সম্মেলনীর চাকর ছাত্রীদের সকাল নটার মধ্যে তুলে নিয়ে যেত ও বেলা সাড়ে বারোটায় আবার পৌঁছে দিত। আপার সার্কুলার রোডের লোরেটো ডে স্কুলের বাড়িতে ক্লাস হত।

অনতিবিলম্বেই আবিষ্কার করলাম আর যে-গুণই মা সরস্বতী দিয়ে থাকুন, এক্ষেত্রে শূন্যি। নিজেরা বুঝলেও বাড়ির লোকেদের বোঝাতে কিছু সময় লেগেছিল। অনেক পরে, এম-এ পাস করে যখন শান্তিনিকেতনে এক বছর অধ্যাপনা করেছিলাম, তখন দিনুদা বলে একজন আশ্চর্য মানুষের পাল্লায় পড়ে গলায় খুব বেশি না হলেও প্রাণের মধ্যে বাংলা দেশের গানের রসের স্বাদটি পেয়েছিলাম। এঁর কথা পরে আরো বিস্তারিতভাবে বলার ইচ্ছা।

তখন পাড়ায় পাড়ায় এত গানের স্কুলও ছিল না, ঘরে ঘরে রেডিও-ও ছিল না। ঘরে ঘরে মানে কোনো ঘরেই ছিল না; সত্যি কথা বলতে কি, অল-ইন্ডিয়া-রেডিওর প্রতিষ্ঠাই হয় নি। বড় শান্তি ছিল তখন পাড়ার মধ্যে। সঙ্গীত সম্মেলনীর এক প্রবল প্রতাপশালিনী প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল, তার নাম সঙ্গীত সঙ্ঘ, তার কর্ণধারিণী ছিলেন স্যার আশুতোষ চৌধুরীর সুযোগ্যা সহধর্মিণী লেডি প্রতিভা চৌধুরী। প্রতিভা দেবী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্রী, তাই ধরে নেওয়া যায় সঙ্গীত সঙ্ঘে রবীন্দ্রসঙ্গীতের উত্তম চর্চা হত। কিন্তু আমাদের গানের স্কুলের সঙ্গীত সঙ্ঘের তিক্ত সমালোচনাও হত, তাদের নাকি বড়মানুষির অন্ত নেই ইত্যাদি।

এই সময়ে আমার নিজেদের ক্লাস থেকে একটি হাতে লেখা মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছিলাম। তার নাম ছিল 'কুসুম' বা 'কলি' বা 'প্রসূন' বা ঐ ধরনের কিছু। সবাই জানত দিদি আর আমি বাংলায় কিঞ্চিৎ কাঁচা, কাজেই পত্রিকার কর্তৃত্ব করার সাহস ছিল না, তবে তার বিনয়ী সেবিকাদের মধ্যে ছিলাম বৈকি। মাঝে মাঝে এক পাতা হাসির কথা লিখতে অনুরুদ্ধ হলেই কৃতার্থ হয়ে যেতাম।

এমনি করে দেখতে দেখতে চৌদ্দ বছর বয়স হল। লেখার বড় শখ, রবীন্দ্রনাথের ভারি ভক্ত, পড়ে পড়ে তাঁর কবিতাগুলোকে মুখস্থ করে ফেলি, 'বিসর্জন' নাটক পড়ে মুগ্ধ হই। দুঃখের বিষয়, কবি নিজে যখন

Scanned by CamScanner

জয়সিংহ সেজে বিসর্জন মঞ্চস্থ করলেন, আমাদের তা দেখা হল না। বাবা রঙ্গমঞ্চের উপর হাড়ে চটা ; এমন কি চলচ্চিত্রকেও সুনজরে দেখেন না, থিয়েটার বলতে শিউরে ওঠেন। আমার এদিকে সেদিকে ভারি আকর্ষণ। গল্প শুনে বই পড়ে বাংলা থিয়েটার সম্বন্ধে মনগড়া একটা ছবি দেখি।

এই সময়ে বড়দা অর্থাৎ সুকুমার রায় আমাকে হঠাৎ বলে বসলেন 'সন্দেশে'র জন্য গল্প লিখে দিতে। এত সৌভাগ্য আমার কল্পনার বাইরে ছিল। যে 'সন্দেশ' আমাদের ছোটবেলার দিনগুলোকে আনন্দে ভরে রাখত, তারি পাতায় আমার লেখা গল্প বেরুবে এত সুখ আমি ভাবতে পারতাম না। দুটো গল্প লিখে দিলাম, একটা বড়দা নিশ্চয় তখুনি ছেঁড়া কাগজের বাক্সে ফেলে দিয়েছিলেন, অন্যটা একটু সংক্ষিপ্ত করে নিয়ে ছেপেছিলেন। গল্পের নাম ছিল লক্ষ্মীছাড়া, বলা বাহুল্য, একটা দুষ্টু ছেলের কাহিনী। 'সন্দেশে'র পাতায় গল্প বেরুতেই বিষম একটা উৎসাহ পেলাম। এর পর আমাদের সমস্ত পরিবারের উপর শোকের কালো ছায়া ধীরে ধীরে এগিয়ে এসেছিল।

প্রথমে গেলেন ঠাকুমা। আশি বছর বয়স, খাটের পাশে চার ছেলে, দুই মেয়ে; রোগের কষ্ট পেয়ে গেলেও তাঁর মৃত্যুটাকে সুখের মৃত্যুই বলতে হয়। তারপর বড়দা অসুখে পড়লেন; শুনলাম রোগের নাম কালাজ্বর, তার তখন কোনো ভালো চিকিৎসা ছিল না। চোখের সামনে একটু একটু করে বড়দার শরীর ভাঙতে লাগল। অমন দশাসই চেহারার আর কিছু রইল না। তার আগের বছরেই বিবাহের নয় বছর পরে, বড় বৌঠানের সুন্দর একটি ছেলে হয়েছিল, ঘটা করে তার নামকরণ হয়েছিল, আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব খুব ভোজ খেয়েছিল। ছেলের নাম সত্যজিৎ, ডাকনাম মানিক।

অনেকদিন ভুগলেন বড়দা; মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়স, কত ইচ্ছা, কত আশা। বড়দার প্রথম বই আবোল-তাবোল প্রেসের জন্য তৈরি হচ্ছে। তার ছবি আঁকা হচ্ছে বিছানায় শুয়ে বালিশে ঠেস দিয়ে। ছোট মানিক তারি মধ্যে হামা দিতে শিখল, হাঁটতে শিখল। তার এক বছর বয়স

Scanned by CamScanner

হল, জন্মদিনে ছোটখাটো উৎসব হল। মণিদা, অর্থাৎ বড়দার মেজোভাই সুবিনয়, বেঁটে বামন সেজে সবাইকে খুব হাসাল। কিন্তু সবাই জানত ও-বাড়ির সুখের সূর্য অস্ত যাচ্ছে।

১৯২৩ সালে মাত্র ছত্রিশ বছর বয়সে বড়দা তাঁর সাজানো সংসার ছেড়ে চলে গেলেন। মনে পড়ে মা আমাদের স্কুল থেকে উঠিয়ে নিয়ে গেলেন। গড়পার রোডের সেই চেনা বাড়িতে লোকে লোকারণ্য। বড়দার ঘরে কোনো শব্দ নেই। বড়দা চোখ বুজে খাটে শুয়ে আছেন, আর বড় বৌঠান দু হাত জোড় করে চোখ বুজে পাশে বসে আছেন, বোজা চোখের পাতার ফাঁক দিয়ে স্রোতের মতো জল পড়ছে। বড়দার মা, আমার বিধবা জ্যাঠাইমা, যিনি আমার মাকে মানুষ করেছিলেন, বড়দার খাটের অন্য পাশে মুখ গুঁজড়ে পড়ে আছেন। জীবনে এই প্রথম ব্যক্তিগত শোকের আঘাত বুঝলাম। এর আগ অবধি মৃত্যুও ছিল শোনা কথা, ছবি দেখার মতো, তার যে কত ব্যথা এবার বুঝতে পারলাম।

সমস্ত পরিবারের আবহাওয়া যেন বদলে গেল। ঐ আনন্দমুখরিত বাড়ির কথা ভাবা যায় না। সুবিনয়ের ত্রিশ-বত্রিশ বছর বয়স, কাঁচা হাতে বিশাল ছাপাখানা ও প্রকাশনীর ভার সে তুলে নিল। ওদের দুশ্চিন্তার ছায়া আমাদের বাড়িতেও পড়ে, ওরা যে শুধু আমাদের জ্যাঠা-মশাইয়ের সন্তান তা তো নয়, মা যে ও বাড়িতে মানুষ হয়েছেন, জ্যাঠার বাড়ি বলতে জ্যাঠার বাড়ি, মামারবাড়ি বলতে মামারবাড়ি। অন্য কোনো মামারবাড়ির কথা তো আমরা জানি না। শুধু যখন ট্রেনে করে কোথাও যেতে কোন্নগর স্টেশন পেরোই, মনে পড়ে এইখানে মা'র মামারবাড়ি, কোতরঙের অচলানন্দ স্বামী মা'র দাদামশাই, তাঁর বাড়ি থেকেই দাদা-মশাই তাঁর স্ত্রীকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিলেন।

১৯২৩-এ দিদি ম্যাট্রিক পাস করে কলেজে ঢুকল। আমার সবে পনেরো পুরেছে, আমি পরীক্ষা দেবার অনুমতি পেলাম না। একটা বছর নষ্ট হল। সেকালে ষোল পূর্ণ না হলে ম্যাট্রিক দেবার নিয়ম ছিল না। আরেকটা বছর পর ১৯২৪ সালে ম্যাট্রিক দিলাম, ভালোভাবেই পাস করলাম। এই সময় বড় জ্যাঠামশাই দেওঘরে মারা গেলেন। অঙ্কে কেউ

Scanned by CamScanner

ভালো নম্বর পেলে তিনি বড় খুশি হতেন, তাঁর কথা আমাদের বাড়ির সকলেরি মনে পড়ল। তিনিই আমার বাবার পিতৃস্বরূপ ছিলেন, আমার ঠাকুরদা শ্যামসুন্দর যখন স্বর্গে যান বাবার বয়স বছর পাঁচেক, সোনা-পিসিমা আরো ছোট। বড়দার শাসনে আর মায়ের যত্নে দুটিতে মানুষ হয়েছিলেন। শুনেছি দুজনায় মহা মারপিট করতেন। সোনাপিসিমা বাবাকে খুঁচিয়ে পালাবার তালে থাকতেন, বাবাও তাড়া করে তাঁকে ধরে, পিঠে গুমগুম করে দু-চার কিল কষাতেই সোনাপিসিমা তারস্বরে 'মারলি ক্যারে লাউয়া!!' বলে চিৎকার জুড়ে বাড়িসুদ্ধ সবাইকে জড়ো করতেন। অতঃপর বাবার কি দশা হত সে কথা না-ই বললাম।

আমার ছোট মাসি পাটনায় থাকতেন, তাঁর ডাকনাম ছিল বুটি। তাঁকে আমি কি যে ভালোবাসতাম সে আর কি বলব। মাঝে মাঝে কলকাতায় এসে আমাদের বাড়িতে উঠতেন। অমন সুন্দর মানুষ আমি কম দেখেছি, পাতলা ছিপছিপে, লম্বা কালো চুল, সোনার মতো গায়ের রং, পদ্মফুলের মতো হাত-পা। আমি যেবার বি-এ পাস করলাম ছোট মাসি মারা গেলেন। ছোট মেসোমশাইও ভারি রূপবান ছিলেন, ছিলেন কেন, এখনো তিনি জীবিত, প্রায় নব্বুই বছর বয়স, এখনো রূপ যেন উছলে পড়ে। যখনি আমাদের ভালো কিছু হয়েছে এঁরা কত খুশি হয়েছেন, মন্দ হলে ব্যথা পেয়েছেন। ছোট বেলায় মাঝে মাঝে রাগ হত, আমরা কি করি না করি তাতে মাসি পিসি জ্যাঠা মেসোদের অত মাথাব্যথা কেন? কে কি বলল না বলল অমনি এসে হুমড়ি খেয়ে পড়েন, এমনিতেই বাবার শাসনে তটস্থ, এঁরা আবার বাঘের ওপর টাঘ্। এখন আর কারো কোনো মাথাব্যথা নেই, মন্দ করলেও বলার কেউ নেই, মাসি-পিসিরা সব আসর গুটিয়ে গেলেন কোথায়? কেউ আর আমাদের বকে না কেন?

কলেজে উঠেই আরেকটি আশ্চর্য মানুষের সঙ্গে চেনাজানা হল। তাঁর নাম কুমুদনাথ চৌধুরী, আমার প্রাণের বন্ধু অলকার বাবা। বালিগঞ্জে তাঁর বাগানওয়ালা সুন্দর বাড়িটি আমাদের বড়ই আকর্ষণ করত। নামকরা বাঘশিকারী, বাড়িময় তার নিদর্শন। সিঁড়ির বাঁকে

Scanned by CamScanner

সত্যি ভালুকের ছালে খড়টড় পুরে দাঁড় করানো, প্রকাণ্ড কাঁচের শো-কেসে বিশাল বাঘ, তার হলদে চোখের দিকে তাকালে বুক দুর-দুর করে। দেয়ালে কত চিতার মাথা, হরিণের শিং।

তবে এসব আমাকে আকর্ষণ করত না। কুমুদনাথ নিজেই ছিলেন একটি অত্যাশ্চর্য বস্তু। পরম রূপবান পৌরুষের মূর্তি, তার উপর সাহিত্যরসিক প্রমথনাথ চৌধুরীর দাদা, তাঁর চাইতে এক বছরের বড়। দুই ভাইয়ের রসালাপের তুলনা হয় না; তার মধ্যে এতটুকু ফচকেমি ছিল না। কথাগুলি রসে ভরপুর, যেমন ভাব তেমন ভাষা। নিজেদের যেমন গুণের অন্ত ছিল না, গুণগ্রাহীও ছিলেন তেমনি!

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, প্রমথনাথের সহ-ধর্মিণী। এঁরাও মে ফেয়ারে থাকতেন, কুমুদনাথের বাড়ি থেকে চার মিনিটের পথ। সেখানে পূর্ণিমা-সম্মেলনী হত। কলকাতার বৈদগ্ধ্য ও শিল্পরসের সমাবেশ। দু-একবার অলকার মা'র ডানার আড়ালে সেখানেও গিয়েছিলাম। আমাদের নিরাপদ নিশ্চিন্ত সংসারের বাইরেও যে একটা চাঞ্চল্যময় জগৎ কেবলি আমাকে ডাকে, এখান থেকেই টের পেলাম। কিন্তু বাংলা লিখতে তখনো অজস্র বানান ভুল করি। অবিশ্যি এখনো মাঝে মাঝে করি।

Scanned by CamScanner

॥ পনেরো ॥

এর মধ্যে যামিনীদা একবার দেশে গিয়ে নিউমোনিয়া হয়ে টপ করে মরে গেল। যামিনীদা যে এরকম করতে পারে এ আমাদের কল্পনার বাইরে ছিল। আমাদের পারিবারিক জীবনের ভিত নড়ে গেল। যামিনীদা নেই এরকম সময়ের কথা আমরা কেউ মনেই করতে পারতাম না। খুব ছোট-বেলাতেও মনে পড়ে যামিনীদার হাঁকডাক 'যাও কইতাছি, পাকঘরে গুল ক'র না!' কিংবা হয়তো কখনো রান্নাঘরের দরজা থেকে হাতছানি দিয়ে ডাকল, কাছে যেতেই নিচু গলায় বলল, 'চাচি খাবা?' অমনি আমরা পাঁচ-ছয়জন আধময়লা হাত পাতি,. সর-বাটা ঘিয়ের চাঁচির জন্য। যামিনীদা তার উপর এক চিমটি করে কাশীর চিনিও দিয়ে দিত, খেয়ে মনে হত স্বর্গে গেছি! ও-ই ছিল আমাদের খাওয়া-দাওয়া খেলা-শোয়া শাসন-তোষণের নিত্য সহচর। বাবা বকলে কত সময় যে রান্নাঘরে গিয়ে খুটখাট করেছি তার ঠিক নেই। মুখে বেশি কথাও বলত না, কিন্তু যার যেটা দরকার মনে করত তার থেকে কাউকে ছাড়ানও দিত না। ওর বিরুদ্ধে আমাদের সব চেয়ে বড় নালিশ ছিল যে সব কথা ভালো করে শুনল কি শুনল না, অমনি গিয়ে মার কাছে লাগাত। কিন্তু বাবাকে কিছু বলত না, খানিকটা বাবাকেও ও যমের মতো ভয় করত এইজন্য, আবার খানিকটা বাবা আমাদের কড়া শাসন করলে ও সইতে পারত না বলে।

একটু সময় পেলেই হুঁকো কলকে নিয়ে আমাদের কাছে এসে বসত,

Scanned by CamScanner

দেশের গল্প বলত আর দুঃখ করত দেশে কার কাছে ও নাকি একশো টাকা ধারে, সেটা কিছুতেই শোধ করতে পারছে না। আমরাও তৎক্ষণাৎ আশ্বাস দিতাম, কোনো ভাবনা নেই, বড় হয়ে আমরা যখন বড়লোক হব, তখন ওর সব ধার শোধ করে তো দেবই, উপরন্তু আরো ঢের টাকা দেব। সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল যে মার কাছে ঐ ধারের কথা বলতেও আমাদের মানা করত; একটি ছেলে ছিল যামিনীদার, আমাদের চেয়ে সামান্য বড়, স্কুলে কিছুদূর পড়েও ছিল সে। যামিনীদা মারা যাবার পর সে একবার দেখা করতে এসেছিল। কিছু টাকাকড়ি নিয়ে আবার দেশে চলে গিয়েছিল, এখানে থেকে কাজ করতে রাজি হয় নি। ডিগডিগে রোগা লম্বা চেহারা, একমাথা কালো কোঁকড়া চুল, উঁচু চোয়াল আর বেশ বড় কালো এক জোড়া গোঁপ, এখনো যদি হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে চোখে পড়ে অমনি চমকে উঠি। ঐ না যামিনীদা! আসলে যামিনীদার মৃত্যুটাকে সত্যি বলে নিতে পারি নি।

১৯২৩ সালে দাদা আর দিদি একসঙ্গে ম্যাট্রিক পাস করল। দাদার বয়স ষোলোর চেয়েও কয়েক দিন কম ছিল বলে এক বছর নষ্ট হয়েছিল। পরীক্ষা দিতে দিতে বেচারার প্রায় সতেরো পুরে এল। আমারো বয়স এক বছর কম; আমি পরের বছর ম্যাট্রিক দিলাম। অক্ষর পরিচয়ের পর দিদির সঙ্গে এই প্রথম ছাড়াছাড়ি হল। এখন বুঝতে পারি যে বাবা মা যদি শিশু মনস্তত্ত্বের ধার ধারতেন, তা হলে এক বছরের ছোট বড় দুই বোনকে এক ক্লাসে ভর্তি করতেন না, আর দিদিও আমার অনেক অত্যাচার থেকে বেঁচে যেত। তার মনে যে আজ অবধি এতটুকু খেদ জমে নেই, সেটা নিতান্তই তার নিজগুণে।

ম্যাট্রিকে ভালো জলপানি পেলাম, স্কুল থেকে সোনার মেডেল দিল, বিশ্ববিদ্যালয় অনেক টাকার বই দিল। বন্ধুবান্ধবরা ধরল খাওয়াতে হবে। মা শুনে অবাক হলেন। পরীক্ষার ফল তো সকলেরি ভালো হওয়া উচিত, তার জন্য আবার খাওয়ানোদাওয়ানো কেন! আর বন্ধুদের খাওয়াতেই যদি ইচ্ছা হয়, বেশ তো, গরমটা গেলে সুবিধামত একদিন খাওয়ালেই হবে। পরীক্ষার ফলের সঙ্গে খাওয়াদাওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই।

Scanned by CamScanner

বাবা একটা ঝরনা কলম আর সোনা-বাঁধানো পার্কার পেনসিল কিনে দিলেন। জলপানি তো প্রত্যেক বছরেই ছেলেমেয়ে পায়, তাতে তাদের বাড়ির লোকরা খুশিও হয়, কিন্তু হৈ-চৈ করার মতো কি এমন ব্যাপারটা!

কলেজে উঠে খোঁপা বাঁধলাম। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে, একটা কালো ফিতে দিয়ে আঁটো করে চুলের গোড়া বাঁধা হল। তারপর চুল-গুলোকে তিন ভাগ করে নিয়ে ফুলিয়ে, পাকিয়ে, জড়িয়ে, গোটাপনেরো দিশি সেলুলয়েডের কাঁটা গুঁজে দিব্যি এক খোঁপা হল। তবে একটা মুশকিল ছিল যে মধ্যিখানের খানিকটা মাঝে মাঝে খুলে যেত। তখন ক্লাসের জনাকুড়ি সহানুভূতিশীলা বন্ধু আবার সেটাকে যথাস্থানে গুঁজে দিত। সবারি তখন ঐ এক দশা। পরে হাত দুটো খোঁপা বাঁধায় দক্ষ হয়ে উঠেছিল। এম-এ পাস করে, শান্তিনিকেতনে গিয়ে সেই যে বড় খোঁপা ত্যাগ করলাম, আর কখনো বাঁধি নি। এবং শুধু আমি একাই ত্যাগ করি নি। আস্তে আস্তে মহিলা সমাজ থেকে সেগুলোর চলই উঠে গেল। পরে আমাদের মেয়েরা আমাদের তখনকার ফটো দেখে হাসা-হাসি করত। পঁয়ত্রিশ বছর পরে দেখি নিজেরাও সেইরকম খোঁপা বাঁধছে।

ততদিনে আমরা অনেক বিদেশী জিনিস বর্জন করেছি, তবে সব আর হয়ে উঠল না। বই, কলম, ওষুধপত্র, এসব কিনতেই হত। ভয়েল ছেড়ে খদ্দরের জামা পরতাম ; তার উপরে নিজেরাই নকশা তুলে নিতাম। ঢাকেশ্বরী কিংবা বঙ্গলক্ষ্মী মিলের মোটা মোটা কাপড় পরতাম। অন্য মিল নাকি বিলিতি সুতো ব্যবহার করে। কয়েক ধোপ পড়লেই কাপড়-গুলোর পাড় থেকে ছোপ ছোপ রং উঠে যেত। পরে যখন মোহিনী মিলের মিহি শাড়ি উঠল আমরা মহা খুশি। দিশি পাউডার, দিশি এসেন্স মাখতাম, দিশি সাবান কিনতাম, সুন্দর সুন্দর চন্দন সাবান। আমার পিসেমশাই এইচ্ বসুর কুন্তলীন তেল, দেলখোস সেন্টের তখন আদর কত। দুঃখের বিষয় শেষ অবধি তাঁর ছেলেরা ব্যবসাটাকে রাখতে পারল

Scanned by CamScanner

না। চটি পরে বাইরে বেরুনো তখনো অসভ্যতা বলে গণ্য হত; এত সুন্দর স্যান্ডেলও তখন বাজারে ওঠে নি। আমরা নাগরা পরতাম। পাড়ার দোকানে একটা লোক তিন টাকা জোড়া দামে সুন্দর নাগরা বানিয়ে দিত। যেমন রং চাই, যেমন নকশা বলে দিই, সুয়েড মখমলে যা আমাদের পছন্দ। নাগরার একটা অসুবিধা ছিল পরে বেশি হাঁটলে পায়ের গোড়ালিতে ফোস্কা পড়ে যেত। যেই না স্ট্র্যাপ দেওয়া সুন্দর স্যান্ডেল উঠল, আর সব ছেড়ে তাই ধরলাম।

যাই হোক, কলেজের মেয়ে হয়ে গেলাম, পড়াশুনোয় ভারি ঝোঁক, কলেজ ম্যাগাজিনে ইংরেজিতে কবিতা লিখি, প্রবন্ধ লিখি। যে বই হাতে পাই এতদিন তা-ই পড়ে পড়ে শেষ করতাম; এখন বই বেছে পড়তে শিখলাম।

কলেজে একজন চমৎকার মানুষের সঙ্গে দেখা হল। তিনি আমাদের ইংরেজির অধ্যাপিকা, এথেল কিনভিগ। কেউ সে নাম জানে না চেনে না, সাহিত্যজগতে একটিও আঁচড় কাটেন নি তিনি, কেটেছিলেন আমার চিত্তলোকে। অক্সফোর্ড থেকে সদ্য পাস করেছেন, কেমন একটা বুদ্ধিদীপ্ত কোমল সহানুভূতির ভাব। দেখতে দেখতে আমরা তাঁর রূপগুণের দারুণ ভক্ত হয়ে উঠলাম। তিনিও আমাদের সঙ্গে ভারি একটা সহজ সম্বন্ধ পাতিয়ে ফেললেন।

তাঁর বাঁ হাতের চতুর্থ আঙুলে তিনটি হীরে ও দুটি ওপেল বসানো সুন্দর একটি আংটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। বোর্ডিংএর মেয়েরা তিনতলার খোলা জানলা থেকে বহির্জগতের চমৎকার দৃশ্য উপভোগ করত। অবিলম্বে তাদের কৌতূহলী দৃষ্টি আবিষ্কার করে ফেলল যে মিস্টার পামার বলে একজন ইংরেজ ইয়ংম্যান—যাকে দেখলেই বোঝা যেত যে সে কোনো দিক দিয়েই মিস্ কিনভিগের পায়ের কাছেও দাঁড়াবার যোগ্য নয়—কিন্তু সে-ই নাকি ঐ আংটির দাতা এবং কিনভিগ শুধু যে তার বাগ্‌দত্তা তাই নয়, একমাত্র তারি আকর্ষণে, সপ্তসাগর ঠেঙিয়ে, ভবানীপুরের এই মেয়েকলেজে অধ্যাপনা করতে এসেছেন! হতভাগা রোজ সন্ধ্যাবেলায় এসে একটি পুরনো ফোর্ড গাড়িতে করে তাঁকে নিয়ে

Scanned by CamScanner

বেড়াতে যায়। তিনতলার দর্শকদের কেউ কেউ এতদূর পর্যন্ত বললে যে রাতে ফিরিয়ে দিয়ে যাবার সময় নাকি লক্ষ্মীছাড়া—যাক্ সে কথা। তবে ব্যাপারটা নাকি তাদের নিজেদের চোখে দেখা!

মোট কথা ইংরেজি সাহিত্যের চাবিকাঠিটি মিস্ কিনভিগ আমার হাতে ধরিয়ে দিলেন। এমন কিছু মহাপণ্ডিত ছিলেন না, এর পরে অনেক বিদগ্ধ বিদ্বান পণ্ডিতের কাছে ইংরেজি পড়েছিলাম কিন্তু রসগ্রহণের গোপন মন্ত্রটি তাঁদের অনেকেরি জানা ছিল না। রস যে কত সরল তরল, তাকে যে গাল ভরে আকণ্ঠ পান করতে হয়, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দিলেই যে তার স্বাদটি মাটি এ রহস্য মিস্ কিনভিগের কাছেই প্রথম জেনেছিলাম।

হঠাৎ একদিন কলেজে গিয়ে শুনি সেদিন তাঁর জন্মদিন। অমনি যে যার টিফিনের পয়সা ইত্যাদি চাঁদা দিয়ে দিল, দুজন অন্য অজুহাতে নিউ মার্কেটে গিয়ে, গোছা করে গোলাপ রজনীগন্ধা নিয়ে এল। মিস্ কিন-ভিগকে সেগুলি উপহার দেওয়া হল। এখনো মনে আছে, অপ্রত্যাশিত একরাশি সুগন্ধি ফুল পেয়ে মিস্ কিনভিগের ঠোঁটে হাসি, চোখে জল। কম্পিত কণ্ঠে বললেন, 'আমার যখন সতেরো বছর বয়স, চার্লস ল্যাম্বের রচনায় একদিন পড়লাম—থ্যাঙ্ক গড্, আই অ্যাম থার্টি টু-ডে! পড়ে আমি অবাক হলাম, ত্রিশ পেরিয়েছে বলে কেউ ভগবানকে ধন্যবাদ দেয় নাকি! কিন্তু আজ আমিও সেই কথাই বলি, থ্যাঙ্ক গড্, আই অ্যাম থার্টি টু-ডে!'

এ কথা শুনে আমি শিউরে উঠলাম, মিস্ কিনভিগ বলে কি! ত্রিশ পেরুলে রইল কি? তার জন্য আবার কেউ ভগবানকে ধন্যবাদ দেয় নাকি?

কলেজ-জীবনের শেষ পর্যন্ত এই মানুষটিকে পাই নি। হঠাৎ একদিন ঈস্টারের ছুটির পর থেকে আর তাঁকে দেখা গেল না। শুনলাম কলেজের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতভেদ হওয়াতে পত্রপাঠ বিদায় নিয়েছেন। আর কেউ তাঁর নামও করে নি।

পুকুর থেকে দু'ঘটি জল তুলে নিলে যেমন বাইরে তার কোনো চিহ্ন পড়ে থাকে না, তেমনি আমার জীবন থেকে যামিনীদা আর মিস্ কিন-

Scanned by CamScanner

ভিগও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেন। তবে যামিনীদা একা যে কাজ করত, দুজন ওড়িয়াবাসী তা পেরে উঠত না। মাকে আরেকটু বেশি সময় রান্নাঘরে থাকতে হত।

দিদির আমার গৃহস্থালির কাজ শেখাও পুরোদমে চলতে লাগল। মা আমাদের তরকারি কুটতে লাগিয়ে দিলেন, একবেলা দিদি, একবেলা আমি। এঁচোর মোচা সব কিছু। বাড়িতে খাওয়াদাওয়া হলে আমরা লুচি বেলতাম, চপ গড়তাম। শনিবার শনিবার প্রাইমাস স্টোভে জলখাবার হত, সিঙাড়া কচুরি মালপো পাটিসাপ্টা জিবেগজা এলোঝেলো কত রকমের নিমকি। নিউমার্কেট থেকে টিনের ওভেন কেনা হল এগারো টাকা দিয়ে। স্টোভের উপর সেটা চাপিয়ে বিস্কুট, প্যাটি, পাই হত। মা একটা বিলিতি রান্নার বই নিয়ে গবেষণা চালাতেন। দেখতে দেখতে মা'র হাতের কেক দোকানের কেকের মান ছাড়িয়ে গেল। অবিশ্যি মা অত সাজসজ্জা চিনির গোলাপ রুপোলি বুটির ধার ধারতেন না। তবু যে খেত সে-ই তারিফ করত।

আমার জ্যাঠাইমা, অর্থাৎ উপেন্দ্রকিশোরের স্ত্রী, নিশ্চয় পাকা রাঁধিয়ে ছিলেন। তাঁর হাতে মানুর মা, সুখলতাদি, পুণ্যলতাদি যে কোনো ভালো হোটেলে মোটা মাইনের চাকরি পেতে পারতেন। কত লোকের কাছ থেকে কত কি যে শিখেছিলেন তাঁরা তার ঠিক নেই। শশী হেষ বলে বিখ্যাত চিত্রশিল্পী ছিলেন। তাঁর ছিলেন ইটালিয়ান স্ত্রী, তাঁর কাছে শেখা, দুধ দিয়ে ডিম দিয়ে চিনি দিয়ে তৈরি এগস্-ইন্-স্নো যারা একবার খেয়েছে তারা আর ভোলে নি। কম ঘি তেলে, সম্পূর্ণ খাদ্যগুণ বজায় রেখে রাঁধতে হয়, এ কথা সেকালেও তাঁরা জানতেন।

হঠাৎ মা'র ডবল নিউমোনিয়া হয়ে যায়-যায় অবস্থা। চারবেলা ডাক্তার, নার্স, অক্সিজেন, ওষুধপথ্যি, রাতজাগা, টাকার শ্রাদ্ধ। আমাদের জোরালো বাবা থেকে থেকে কেমন অসহায় ভাবে তাকাতেন। আমরা কজন বড় হয়েছি, কলেজে পড়ি, বাবার ডান হাতের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে পারলাম। রাশি রাশি লোক আসত মাকে দেখতে, তাদের ঠেকানোই এক সমস্যা। তারি মধ্যে অস্পষ্টভাবে বুঝতে পারতাম দুঃখে বিপদে

Scanned by CamScanner

মানুষের সহানুভূতি পেলে মনে কত বল আসে। বাবার সহকর্মীরা কেউ কেউ নিঃশব্দে এসে আমাদের হাতে নোটের তোড়া গুঁজে দিয়ে যেতেন। বাবাকে দেখার সাহস নেই, বাবা তাঁদের উপরওয়ালা। সে টাকার ঋণ কবে শোধ হয়ে গেছে, হৃদয়ের ঋণ শোধ হবার নয়।

সবাই যখন একরকম আশা ছেড়ে দিয়েছে, রোগ হঠাৎ ভালোর দিকে মোড় নিল। তখন এত মোক্ষম সব ওষুধের বালাই ছিল না, যত্নের উপরে অনেকখানি নির্ভর করতে হত। দেখতে দেখতে মা সেরে উঠলেন। মা'র বয়স তখন চল্লিশ পেরোয় নি, কিন্তু আমাদের মনে হত অনেক বয়স।

রোগ সারলে, হাজারিবাগে সুন্দর একটি বাংলো ভাড়া নিয়ে দাদা-দিদির সঙ্গে মাকে পাঠানো হল। ওদের পরীক্ষা হয়ে গেছে, সামনে লম্বা ছুটি। স্কুল কামাই করে যতি-হাবুও গেল। হাজারিবাগে জ্যাঠামশাইয়ের মেজ জামাই অরুণ চক্রবর্তী অ্যাডিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট, তাঁর বাড়িতে কয়েকটি আমুদে ছেলে-মেয়ে, তাছাড়া আত্মীয়স্বজনও কেউ কেউ জুটেছেন, হাজারিবাগে নিত্য হৈ চৈ। এখানে-ওখানে রামগড়ে চুটুপালুতে পিক-নিক করা হয়। আমরা তার বর্ণনা শুনে হিংসায় জ্বলে মরি। গরমের সময় আমরাও হাজারিবাগে গেলাম। সঙ্গে গেলেন মাসিমা আর তাঁর সুন্দরী মেয়েটি, তখন তার চোদ্দ বছর বয়স, রূপ যেন উপচে পড়ছে।

উপেন্দ্রকিশোরের ছোট ছেলে সুবিমলও সেখানে। তার উদ্ভট গল্প শুনে আমাদের চক্ষু চড়কগাছ। 'সন্দেশ' পত্রিকা মাঝে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তারপর আবার কিছুদিন চলেছিল। সুকুমারের মেজভাই সুবিনয় তখন সম্পাদক। সন্দেশে সুবিমলের ঐ সব গল্পের কিছু কিছু বেরুচ্ছিল। আমি চাইনিজ ইঙ্ক দিয়ে মজার মজার ছবি এঁকে দিতাম। যেমন গল্প তার তেমনি ছবি। একবার এঁকেছিলাম এক বুড়ো আর তার কুকুর, দুজনের অবিকল এক চেহারা, ফুটপাতের ধারে সন্দেহজনক ভাবে অপেক্ষা করছে। গল্পটা ভুলে গেছি।

হাজারিবাগেও একজন আশ্চর্য মানুষের সঙ্গে দেখা হল। তাঁর নাম কামিনী রায়, বয়স হয়েছে, নিরাভরণ বিধবার সাজের মধ্যে দিয়ে এক-

Scanned by CamScanner

রকম তেজ বেরুচ্ছে। তাঁর রুগ্ন ছেলেকে নিয়ে, আমাদের বাড়ির কাছেই চমরু বাগ্ বলে একটা সাদা বাড়িতে থাকতেন। টেবিলে, ডেস্কে, টেবিলের টানায় রাশি রাশি কবিতা, কবে কোন্ পত্রিকায় বেরিয়েছে কিংবা মোটা একটা খাতায় লেখা অপ্রকাশিত কবিতা; সেগুলি এখন বাছাই হচ্ছে, পুস্তকাকারে প্রকাশিত হবে। শুনলাম বইয়ের নাম হবে "দ্বীপ ও ধূপ"। কি করে যে আমিও ঐ রাশি রাশি কবিতা বাছাইয়ের কাজে ডুবে গেলাম মনে নেই। নেশার মতো লেগে গেল। মাঝে মাঝে কামিনী রায় আমাদের কবিতা পড়ে শোনাতেন। মাইক্রোস্কোপের মধ্যে দিয়ে দেখা একবিন্দু জলের বিষয়ে একটা কবিতা শুনলাম। তার পদ-গুলির কিছুই মনে নেই, কিন্তু রোমাঞ্চটুকু এখনো মনে লেগে আছে।

ইংরেজিতে একটা বড় ভালো কথা আছে—অ্যাওয়ারনেস্ (Awareness), যে গুণ না থাকলে শিল্পীর শিল্পসৃষ্টি হয় না। এ গুণ হল এক ধরনের সূক্ষ্ম সচেতনতা; যা সাধারণ লোকের হয়তো চোখেও পড়ে না, তাই দেখে অন্তরের মধ্যে থেকে সাড়া দেওয়া। কামিনী রায়ের মধ্যে সেই জিনিস চিনতে পারলাম। বাস্তবিক অমন মেয়ে এদেশে বিরল। তাছাড়া সাহিত্য প্রতিভার সঙ্গে তীক্ষ্ণবুদ্ধির সমাবেশ বেশি দেখা যায় না।

এর কয়েক বছর পরে, ১৯৩১ সালের শেষে রবীন্দ্রনাথের সত্তর বৎসর পূর্তি উৎসবে যাঁরা শ্রদ্ধার্ঘ্য দান করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে কামিনী রায় ছিলেন অগ্রণী। আমি সে সভায় উপস্থিত ছিলাম। বার বার মনে হয়েছিল এই জনতার দৃষ্টির সামনে, সজ্জিত মণ্ডপের উপরে, সাদা গরদ পরা এই মানুষটির আসল পরিবেশ এ নয়। সেই যে হাজারিবাগে দেখেছিলাম সাদা বাড়ির নিচু বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে, দিনান্তের শেষ সূর্যালোকটুকুকে ধরে রেখে, হাতে লেখা কবিতার খাতা থেকে গভীর কণ্ঠে পড়ছেন, দূরে নীল বনানীর রেখা আস্তে আস্তে অন্ধকারের সঙ্গে মিলিয়ে যাচ্ছে, আর পড়া সম্ভব হচ্ছে না—সেই ছিল তাঁর আসল পরিবেশ।

Scanned by CamScanner

॥ ষোলো ॥

হাজারিবাগ থেকে ফিরে আসার পর বেশি দিন কাটল না, জ্যাঠা-মশাইয়ের সারাজীবনের সাধনার ফল ইউ রায় অ্যান্ড সন্স লাটে উঠল। ছাপাখানা বন্ধ হল, বাড়ি যেন কবরখানা। জ্যাঠামশাইয়ের বাড়ি বলতে ছোটবেলা থেকেই মনে হয়, প্রেস চলার একটা বিশেষ ভারি শব্দ, কালির গন্ধ, কাগজের ছড়াছড়ি, প্রুফ্ দেখা, ব্যস্তসমস্ত লোকজনের ক্রমাগত সিঁড়ি বেয়ে ওঠা নামা। আর তারি পিছনে পিছনে একটা রসের রোমাঞ্চের ইঙ্গিত।

ছোট জিনিসেও কত মজা ছিল। মনে পড়ে, একবার বড়দা অর্থাৎ সুকুমার বড় বেশি মোটা হয়ে যাচ্ছে বলে তাঁর নিজের এবং বড় বৌঠানের মহা ভাবনা! শেষ পর্যন্ত বৌঠান সাব্যস্ত করলেন যে দুপুরে খেয়েদেয়ে উঠে আর তিনটে অবধি বিছানায় গড়ানো নয়। এখন থেকে খাবার পর খোশগল্প বই পড়া ইত্যাদি। সবাই অবাক হয়ে দেখল বড়দা সোনা হেন মুখ করে কথাটা মেনে নিলেন। দুদিন এইভাবেই চলল, দুপুরে বড়দা বৌঠান শোন না। বড়দা পড়েন; বৌঠানের অপূর্ব হাতের সেলাই, তাঁর কাশ্মিরী কাজের তুলনা ছিল না, তাই নিয়েই দিব্যি সময় কাটান। তৃতীয় দিন বড়দা হঠাৎ বললেন— 'ঐ যাঃ! আপিসের দিকে একটা দরকারি কাজ ভুলে গেছি!' বলেই চটিতে পা গলিয়ে আপিসের দিকে চলে গেলেন। এলেন সেই সন্ধ্যাবেলায় আপিসের কাজ বন্ধ হলে। পরদিনও ঠিক তাই হল, খাওয়াদাওয়ার পর একটা জরুরি কাজের কথা

মনে পড়াতে বড়দা আপিসের দিকে চলে গেলেন। তার পরদিনও তাই। তার পরদিন বেলা ১২টায় যখন সবাই নিচে প্রেসঘরে কাজে ব্যস্ত, বড়দা স্নানের ঘরে, বড় বৌঠান কৌতূহল দমন করতে না পেরে, গুটি গুটি বড়দার আপিসঘরে গিয়ে দেখেন, যে সরু তক্তাপোশের উপর আগে বইয়ের গাদা থাকত, সেখানে দিব্যি পরিপাটি একটি বিছানা পাতা। দুপুরে বড়দার আপিসের তাগাদার রহস্যের সমাধান হল। বড় বৌঠান ঘরে ফিরে এলেন, কাকেও কিছু বললেন না। পরের সপ্তাহ থেকে বড়দা আবার যখন প্রকাশ্যভাবে নিজের ঘরে শয্যা নিলেন, কেউ আপত্তিও করল না।

এখন মৌচাকের মতো সারাদিন বাড়িময় গুঞ্জন এবার বন্ধ হয়ে গেল। অস্বাভাবিক নীরবতায় কানে তালা লাগত। রাতে আর আপিস-ঘরে আলো জ্বলত না। প্রেসের লোকেরা অনেকেই বহুদিনের পুরনো; জ্যাঠামশাই তাদের কাজে বহাল করেছিলেন; অনেকে এখানেই কাজ শিখে দক্ষ হয়ে উঠেছিল। তারা সবাই বাড়ির লোকের মতো হয়ে গিয়েছিল; পারিবারিক সুখ-দুঃখের ভাগিদার ছিল; রামদহিন তাদের একজন। এখন তাদের সকলের ছুটি হয়ে গেল, এখানে ওখানে চাকরি পেয়ে গেল, কেউ কেউ দেশে চলে গেল। আর তাদের দেখি নি।

এই নতুন শোকে, জেঠিমা যেন শুকিয়ে ছোট্টটি হয়ে গেলেন। অতবড় বাড়িতে গুটিকতক মানুষ টিমটিম করত। দেখা করতে গেলে মন-খারাপ হয়ে যেত। শোনা গেল ব্যবসা বাড়ি সব ব্যবসার দেনা মিটাবার জন্য নিলাম হয়ে যাবে। নাকি আড়াই লক্ষ টাকা আদায় হচ্ছে না, সেটি পেলেই সব পাওনাদারের পাওনা মিটিয়ে দেওয়া যেত। কিন্তু তা হল না। বাড়ির জিনিসপত্রের ফর্দ তৈরি হতে লাগল, রান্নাঘরের টুলটি পর্যন্ত বাদ গেল না। তারি মধ্যে ছোট্ট সত্যজিৎ মহানন্দে ঘুরে বেড়াত। ব্যবসা গেল, বাড়ি গেল; তার তো ভারি বয়ে গেল।

এর মধ্যে আই. এ. পাস করে ঢাকায় গেলাম মাসির বাড়ি। ঐ আমার প্রথম ও শেষ পদ্মাপারে যাওয়া। খুব ভালো লেগেছিল। সমস্ত যাত্রাপথটাও ভালো লেগেছিল; ভোরে গোয়ালন্দ পৌঁছে স্টিমারে ওঠা।

Scanned by CamScanner

দোতলার ডেকে দাঁড়িয়ে যাত্রীদের ঠেলাঠেলি দেখছিলাম। মেসোমশাই সঙ্গে আছেন সুতরাং নিজের কোনো ভাবনা-চিন্তা ছিল না। মেসোমশাই তখন ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের অধ্যক্ষ। রমনার মাঠের ধারে বাড়ি।

সেখানে দুজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে দেখা হল। একজনের নাম জ্ঞান ঘোষ, অন্যজন সত্যেন্দ্রনাথ বসু। এককালে মেসোমশাইয়ের প্রিয় ছাত্র ছিলেন তাঁরা, এখন তাঁদের কর্মস্থলও ঢাকায়। এ বাড়িতে নিত্য যাওয়া-আসা। তাঁদের কোমল সরল ব্যবহার ভালো লাগত, সেই সঙ্গে বুঝতে পারতাম তাঁরা যে জগতে বাস করেন, সেটা আমার নাগালের বাইরে। মেসোমশাই কিন্তু সব্যসাচী, বিজ্ঞানে ও সাহিত্যে তাঁর সমান আনন্দ।

এই সময় মেসোমশাইয়ের বাড়িতে দুটি নতুন নামও শুনে এসেছিলাম, যদিও নামের মালিকদের সঙ্গে দেখা হয় নি। শুনেছিলাম তাদের ছাত্রাবস্থা, বয়সে আমাদের সমান সমান, কিন্তু আশ্চর্য প্রতিভার অধিকারী। এরি মধ্যে তাঁদের রচনা ছাপার অক্ষরে প্রকাশ পেয়ে, বহু লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তাঁদের একজন হলেন বুদ্ধদেব বসু, অন্যজন প্রেমেন্দ্র মিত্র।

কল্লোল পত্রিকা পড়ি নি। ফোর আর্টস্ ক্লাব বলে কলকাতায় মুক্ত চিন্তাবিদদের একটা ব্যাপার আছে জানতাম, কিন্তু তার দূষিত বায়ুর প্রভাব থেকে আমাদের গুরুজনরা আমাদের সাবধানে রক্ষা করে রাখতেন। তবে এক স্কুলের বন্ধুর দাদা বৌদিরা ওর সঙ্গে জড়িত থাকাতে, তাদের বাড়িতে ক্লাবের বৈঠক হত। সে আমাদের প্রায়ই নিমন্ত্রণও করত, কিন্তু সবই বৃথা। তার কাছে নানান রোমাঞ্চময় অভাবনীয় ব্যাপারের কথা শুনে আমাদের চুল খাড়া হয়ে উঠত। কিন্তু কৌতূহল নিবৃত্ত করার কোনো উপায়ই ছিল না। দীনেশ দাস বলে একজন মানুষ নাকি ক্লাবের পাণ্ডা, তাঁকে মাঝে মাঝে দূর থেকে দেখেছিলাম। কিন্তু যতদূর মনে হচ্ছে দাড়ি থাকার দরুন বিন্দুমাত্র আকৃষ্ট হই নি। আমাদের জ্যাঠামশাইদের আর ঠাকুরবাড়ির কয়েকজনের মুখে ছাড়া আর কোথাও আমরা দাড়ি বরদাস্ত

Scanned by CamScanner

করতে পারতাম না। যাঁরা মারা গেছেন, যেমন যীশু, এব্রাহাম লিঙ্কন্, মাইকেল মধুসূদন ইত্যাদির কথা আলাদা।

এদিকে আমাদের এত ভালোবাসার 'সন্দেশ'টা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। লিখব কোথায়? কে-ই বা আমার লেখা ছাপবে? একমাত্র কলেজ ম্যাগাজিন আমার ভরসা ছিল। কলেজের অধ্যাপকরা আমার উপর খুব খুশি। 'এসব রচনা বোধ হয় কোনো বই দেখে লিখেছ? তা বেশ করেছ, বইটা ভালো।' শুনে রাগ হওয়া দূরে থাকুক আহ্লাদে আমি আটখানা। আমার লেখাকে অন্য কোনো ভালো বইয়ের লেখকের রচনা মনে হচ্ছে। কি সুখ!

আমরা রবীন্দ্রনাথের পুজো করতাম। দেওয়ালে তাঁর ছবি টানাতাম। যা লিখতেন সব পড়তাম। মাসিক পত্রিকায় তাঁর রচনা বেরুলেই রুদ্ধ-শ্বাসে আগে সেইটে পড়তাম। এখন বুঝতে পারি তাঁর বিরাট প্রতিভা আমাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিল, বিচার বুদ্ধি লোপ পেয়েছিল, অন্য কিছু দেখেও ভালো করে দেখতে পেতাম না। এমন সময় আমাদের বাংলা পাঠ্যাংশে 'শ্রীকান্তের নিশীথ অভিযান' বলে একটি অধ্যায় পড়ে আমি বাক্যহত। আগে যে শরৎচন্দ্রের লেখা কিছু পড়ি নি এমনও নয়। তবু ঐ হঠাৎ পড়া অধ্যায়টি আমার মনের মধ্যে বিদ্যুতের চমক জাগিয়েছিল। শরৎবাবুর সব রচনা একে একে পড়ে ফেলেছিলাম। মেসোমশাই তাঁকে ভালো করে চিনতেন, তাঁর কাছ থেকে অনেক ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করেছিলাম। শুনে নিজেই আশ্চর্য হয়েছিলাম, এ কি রকম হল, সব বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের উল্টো, অথচ তবু কি করে মনকে এমন নাড়া দিতে পারছেন? সহস্র নয়নে অরূপকে দেখার কথা তখনো শুনি নি।

আসলে এতদিন ইংরেজি সাহিত্যের মধ্যে আমার মানসলোক খুঁজে পেয়েছিলাম। এখনো কোনো গভীর অনুভূতির সময় আমার হৃদয় যে মূক ভাষায় সাড়া দেয়, সে রবীন্দ্রনাথের ভাষা নয়, শরৎচন্দ্রের ভাষা নয়, সে হল বিগত যুগের ইংরেজ কবিদের ভাষা।

ঢাকার স্মৃতি আরো দুটি ভালো জিনিসের জন্য আমার মনে এমন উজ্জ্বল হয়ে আছে। একটি হল বাকরখানি বলে একরকম দেবভোগ্য

Scanned by CamScanner

পরটা ; অন্যটি হল কাচকিমাছ বলে একরকম খুদে মাছ, যার সঙ্গে মধুর কোনো তফাৎ নেই।

আই. এ. পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলাম। প্রথম হয়েছিল সুনীতকুমার ইন্দ্র বলে কৃষ্ণনগরের একটি ছেলে, প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র। বহুকাল পরে এই মানুষটির সঙ্গে আমাদের পরিবার ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হতে পেরে ধন্য হয়েছিল। শুধু মানবতার গুণেই সুনীতকুমার ছিলেন অসাধারণ, অন্য গুণ যদি ছেড়েও দিই। তার অকালমৃত্যুতে আমাদের একটা ব্যক্তিগত অভাব থেকে গিয়েছে।

বাড়ির সকলে আশা করে আছেন বি. এ. পরীক্ষাতেও ভালো ফল দেখাব। অগত্যা ছবি আঁকা গল্প লেখা একরকম বন্ধ করে দিয়ে, পড়াশুনোয় মন দিলাম। সারাজীবন যেখানেই এতটুকু সাফল্যলাভ করেছি, শুধু মা-বাবা কেন, মাসি পিসি জ্যাঠা ও তাঁদের ছেলেমেয়েরা যে আনন্দ প্রকাশ করেছেন, তাতেই আমার হৃদয় ভরে গেছে।

বি. এ. ক্লাসে ইংরেজিতে অনার্স নিয়েছিলাম, সঙ্গে গণিত ও অর্থশাস্ত্র! বাংলায় তখন মোটামুটি ভালোই চালিয়ে নিতে পারি। বাড়িতে ভাইবোনদের বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলি। সাহিত্যসাধনা তার বেশি বিশেষ কিছু হয় না। এই সময় বাড়িসুদ্ধ সকলের বেরিবেরি হল। কলকাতায় তখন সংক্রামক রূপে বেরিবেরির প্রকোপ। নাকি কলে ছাঁটা চাল আর সর্ষের তেল খেলে বেরিবেরি হয়। অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের আর পাঞ্জাবীদের তাই হয় না। ভিটামিন পিল খাওয়া, হাওয়া-বদল আর তেল চাল ত্যাগ, এই হল চিকিৎসা। অসাবধানতার ফলে, হৃদ্‌যন্ত্র বিকল হয়ে বহু লোক সেবার মারাও গিয়েছিল।

বাবা আপিস থেকে, আমরা স্কুল-কলেজ থেকে ছুটি নিয়ে গিরিডি চলে গেলাম। যতদূর মনে পড়ছে সময়টা নভেম্বরের মাঝামাঝি, ঠিক পুজোর পরেই, কলেজ সবে ছুটির পরে খুলেছে, কলেজের বার্ষিক উৎসবের জন্য নাটক বাছাই হচ্ছে। মনটন খারাপ। বেশিদিন কামাই হলে শেষটা যদি পার্সেন্টেজ না থাকে! গিরিডি গিয়ে দেখি ছোটনাগপুরের অপূর্ব শীতকাল আস্তে আস্তে নেমে আসছে। সিরসিরে একটা হাওয়া

Scanned by CamScanner

আর যেখানে সেখানে ফুলের বাহার, বাতাসটা কি রকম শুকনো পরিষ্কার, বুকটা একেবারে ভরে যায়। দূরের পাহাড়গুলোতে নীল রঙ ধরেছে। এখানে অপ্রত্যাশিতের দেখা মেলা অসম্ভব মনে হত না।

এদিকে মাছ তরকারি দুধ ঘি বড় সস্তা। একমাত্র দুঃখ, ভাত বন্ধ। হাতের রুটি দুচক্ষে দেখতে পারতাম না; বিশেষ করে দুপুরবেলায় রুটির গোছা দেখলে হাড়পিত্তি জ্বলে যেত। তবে সুখের বিষয় দিন পনেরো পরে ঢেঁকিছাঁটা চালের ভাত খাবার অনুমতি পেলাম। সর্ষের তেল ছাড়া অন্য সব নিষেধও উঠে গেল। নিজেদের আবার আস্ত মানুষ মনে হল।

ও বাড়িটা ছিল শ্রীযুক্ত অমল হোমের বাড়ি। তাঁর মা-বাবা তখনো জীবিত। বাবার নাম গগনচন্দ্র হোম। আমার মা-বাবা তাঁদের বলতেন মামা-মামি, আমরা বলতাম গগন দাদামশাই গগন বৌদি। তাঁদের সঙ্গে আমাদের পরিবারের, বিশেষ করে উপেন্দ্রকিশোরের বাড়ির, একটা বিশেষ সম্বন্ধ ছিল, যা রক্ত সম্পর্কের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। গগন হোমেদেরো বাড়ি মসূয়া গ্রামে। শুনেছি তাঁরি প্ররোচনায় উপেন্দ্রকিশোর ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেবার পরেও গগনচন্দ্রই ছিলেন তাঁর প্রথম বন্ধু।

গিরিডির উশ্রী নদীর কথা ভোলা যায় না। শীতে সেখানে সামান্য জল, পায়ে হেঁটে ওপারে যেতাম। শহরটা যেমন ঘিঞ্জি, ওপারটি তেমনি ফাঁকা। ওপারে শালবন, তার মধ্যে দিয়ে বাতাস বইলে ছোটবেলার সরলবনের মর্মরের কথা মনে পড়ত।

বুধুয়া আমাদের কুয়ো থেকে জল তুলে দিত। তার নাকি দুই বৌ। তার বাড়িতে বড় অশান্তি, তাই বুধুয়া মাঝে মাঝে মা'র কাছে কেঁদেকেটে, দুপুরে আমাদের বাড়িতেই শুয়ে থাকত। তাতে মা কোনো আপত্তির কারণ দেখতেন না। মোটা চালের তখন আড়াই টাকা মণ, তেলের সের ছ'আনা। গিরিডিতে ছোট মাছ দু'তিন আনায় আধ ঝুড়ি, মুরগি চার আনা করে বেশ বড়ই পাওয়া যেত। কাজেই দুটো-একটা বাড়তি লোক খেলে, কার কি এসে যায়! আমরা ভাবতাম বৌরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করুক, বুধুয়া বেচারি একটু শান্তি পাক।

Scanned by CamScanner

একদিন বুধুয়া কুয়োর পাড়ে আমাদের কড়াই মাজছে, এমন সময় ঝড়ের মতো একটি মেয়ে ছুটে এসে দমাদ্দম করে বুধুয়ার পিঠে আছাড় মেরে হাতভরা চুড়ির গোছা ভেঙে ফেলে আবার ঝড়ের মতো চলে গেল। বুধুয়া কিছু বলল না, দুই হাঁটুতে মুখ গুঁজে শুধু নিজের চোখ দুটিকে রক্ষা করল। পিঠ বেয়ে তার রক্ত পড়তে লাগল; মা তো মহা রেগে গেলেন, বৌয়ের হাতে মা'র খায় এ কি রকম পুরুষমানুষ! বুধুয়া নিজের পিঠে মা'র দেওয়া মলম লাগাতে লাগাতে বলল, 'উ ছোটটার দোষ নেই মা, বড়টাই উকে লেলিয়ে দিয়েছে।'

আমরা বললাম, 'কেন, লেলিয়ে দিয়েছে কেন?'

বুধুয়া মা'র পা জড়িয়ে ধরে বলল, 'দুটোকে না হোক, একটাকে কলকাতায় নিয়ে যাও মা, নইলে আমি বাঁচব না। নিজেদের মধ্যে যেমনি ভাব, আমার সঙ্গে উয়াদের তেমনি ঝগড়া!' নাকি বড়টার রাগ ঠাণ্ডা করবার জন্য তাকে হাটের দিন বুধুয়া নতুন কাঁচের চুড়ি কিনে দিয়েছিল। ছোটটাকেও দেবার মতো পয়সায় কুলোয় নি, তাই বড়টা ছোটকে বুধুয়ার পিছনে লেলিয়েছে!

এ কাহিনীর উপসংহার হল আমরা কলকাতা ফেরার দিন। দুই বৌ এসে মা'র কাছে ধরনা দিল, 'বুড়োটাকে কলকাতা নিয়ে যাও মা, তাহলে আমরা দুজনে একটু সুখে-শান্তিতে থাকি।'

গিরিডিতে আমাদের বাড়ির পাশেই গোলকুঠি ছিল। যোগীন্দ্রনাথ সরকারের বাড়ি। ছুটির বেশির ভাগ সময় তিনি সেখানেই কাটাতেন। চারিদিকে সুন্দর বাগান, রোজ সন্ধ্যায় বহু লোকের সমাগম। বাবা লম্বা লম্বা হাঁটা দেন, বসে বসে গল্প শোনা তাঁর ধাতে সয় না। আমরাও গোলকুঠিতে এক-আধবারের বেশি যাই নি।

শিশুসাহিত্যে যোগীন্দ্রনাথ অবিস্মরণীয়। তিনি প্রথম বাংলা দেশের ছেলেমেয়েদের জন্য সুন্দর করে ছাপা, সুন্দর ছবি দিয়ে ভরা বাংলা বই প্রকাশ করেন। সিটি স্কুলে মাস্টারি করতেন, পয়সাকড়ি বিশেষ ছিল না, তবু ছোটদের বই প্রকাশ করবার জন্য 'সিটি বুক সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সাধারণ প্রকাশকরা ছোটদের জন্য ছবি দেওয়া বই ছাপতে

Scanned by CamScanner

চাইতেন না, খরচ বেশি, লাভ কম। ছবিও দিতে হবে আবার দামও কম রাখতে হবে। আজ পর্যন্ত 'সিটি বুক সোসাইটি' সমানে বই ছেপে যাচ্ছেন।

যোগীন্দ্রনাথের নিজের রচনারো তুলনা হয় না। তাঁর লেখা কবিতা 'দাদখানি চাল মুসুরির ডাল' 'হারাধনের দশটি ছেলে...' 'এখন আসে যদি বাঘ, মামার বড্ড হবে রাগ' ইত্যাদির মতো কবিতা কবে, কোন্ দেশে, ক'জনা কবিই বা লিখেছেন? তিন মাস কেটে গেল দেখতে দেখতে; কলেজ কামাই হল এক মাসের কিছু বেশি। মিশনারি কলেজ আমাদের, বড়দিনের ছুটি এক মাস, ডিসেম্বরের কুড়ি-একুশ তারিখ থেকে জানুয়ারির কুড়ি-একুশ তারিখ অবধি। কলেজ খোলার আগেই আমরা আবার কলকাতায় ফিরে এলাম।

কলেজ কামাই বলে গিরিডি বাস কিছু কম উপভোগ্য হয় নি। সেখানে 'রোজ ভিলা'য় আমার পিসিমা তাঁর ছোট ছেলেমেয়ে ক'টিকে নিয়েছিলেন। আমার পিসেমশাই বড় শখ করে গোলাপ গাছে ভরা বাড়িটি কিনেছিলেন। তিনি অনেক দিন হল স্বর্গে গেছেন, কিন্তু বাড়িটিতে তখনো পিসিমা আর পিসতুতো ভাইবোনরা ছুটিছাটা কাটান। আমার মুকুলদা, ফিল্ম-জগতের নামকরা ফটোগ্রাফার মুকুল বসু, তখনো ফিল্মের সঙ্গে জড়িত হয় নি। রোগা, ফরসা, আমুদে মানুষটি আমার চেয়ে বছর সাতেকের বড়, মোটর সাইকেলে চড়ে এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়াত আর রাশি রাশি বগেরি পাখি শিকার করে এনে আমাদের খাওয়াত। গল্প বলতেও মুকুলদা ছিল ওস্তাদ, গিরিডির বিষয়েই কত গল্প যে ওর কাছে শুনেছিলাম তার ঠিক নেই। যেমন একবার ওখানকার এক ডাক্তারের হঠাৎ মাথার গোলমাল দেখা দিল। কেউ কিছু জানে না, ডাক্তারের স্ত্রী দেখেন স্বামী তাঁর কোলের ছেলেটির ঠ্যাং ধরে ঝুলিয়ে তেলের কলসীতে ডোবাচ্ছেন। হাঁ-হাঁ করে ছুটে যেতেই, ডাক্তার গম্ভীর মুখে বললেন, 'থাক্, আচার হোক!' এই রকম আজগুবী গল্পের সোনার খনি ছিল মুকুলদা।

যদিও গিরিডিতে বসে পড়াশুনো যথেষ্টই করেছিলাম, দিদি আবার সেবার বি. এ. পরীক্ষা দেবে, তাই যখন ফিরে এলাম, মনে হল লম্বা একটা ছুটি ফুরল।

Scanned by CamScanner

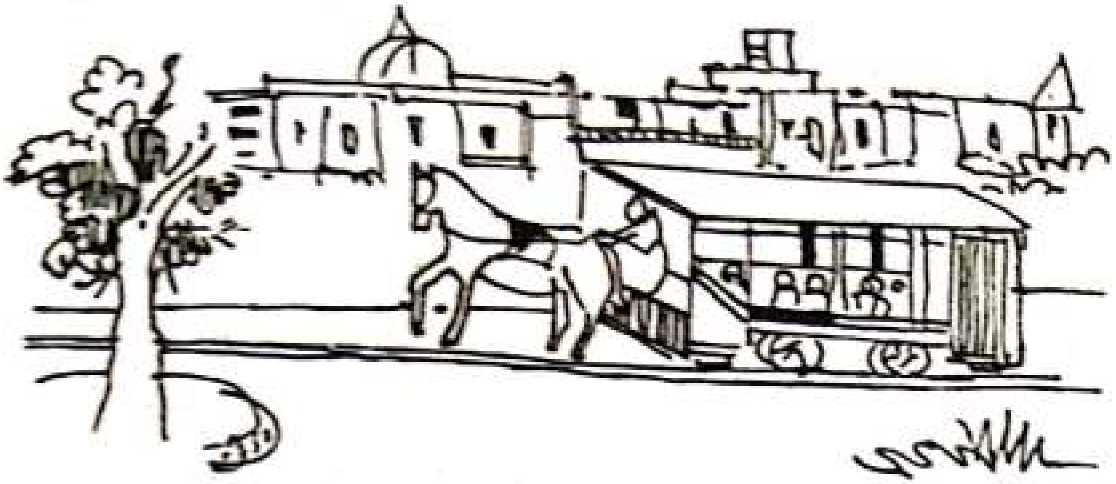

॥ সতেরো ॥

গিরিডি থেকে ফিরে দিদি বি. এ. পাস করে এম. এ. পড়তে গেল। তাই নিয়ে বাড়িতে মতভেদ। এম. এ. পড়া মানেই নানারকম ছেলেদের সঙ্গে পড়া, একা যাতায়াত, হয় ট্রামে নয় বাসে। ট্রামে গেলে আবার এস-প্ল্যানেডে নেমে গাড়ি বদল করতে হয়। বাসগুলোও তেমন সুবিধার নয়, সেগুলি সবে কলকাতার পথে চলতে শুরু করেছে। ছোট ছোট গাড়ি, ভিতরে মুখোমুখি দু'সারি বেঞ্চি। তার মানেই পুরুষদের পাশে বসা। কে না জানে পুরুষরা বড় খারাপ হয়, তাদের পাশে বসা, একঘরে বসে নানারকম কবিতা পড়া, উপন্যাস ও প্রেমের গল্পের আলোচনা শোনা, তা-ও আবার পুরুষ অধ্যাপকের মুখে—আত্মীয়স্বজনরা বড়ই চিন্তিত। এর আগে আমাদের পরিবারের কোনো মেয়ে একা যাতায়াতও করে নি, এম. এ. তো পড়েই নি। কিন্তু দিদির বড় আগ্রহ।

বাবাই সব মতভেদের সহজ উপায় সমাধান করে দিলেন। দিদিকে একটা সুন্দর বেঁটে ছাতা ও একটি সোনালি কাজ করা পাটকিলে রঙের চামড়ার লেডিজ্ হ্যান্ডব্যাগ কিনে দেয়, দাদাকে বললেন—'কাল ওকে এম. এ. ক্লাসে ভর্তি করে দে।' অমনি সবাই কথাটা মেনে নিল। ছোট জ্যাঠামশাইয়ের সব চাইতে বেশি আপত্তি ছিল, এখন দেখি তাঁরই সব চাইতে বেশি উৎসাহ। দিদির সহপাঠিনী আরো চার-পাঁচজন মেয়ে নানান বিষয় নিয়ে এম. এ. পড়তে শুরু করে দিল। ব্যাপারটার মধ্যে আর নতুনত্ব রইল না।

Scanned by CamScanner

পরের বছর আমিও ভালোভাবে বি এ. পাস করে ইংরেজিতে এম. এ. পড়তে লাগলাম। তখনকার দিনের এম. এ. পড়া এক ব্যাপার ছিল। আমাদের ক্লাসে আটানব্বইজন ছেলে ও তিনজন মেয়ে। বারান্দার একটা কোণা পার্টিশান দিয়ে আলাদা করে আমাদের বসবার জায়গা হয়েছিল, ঘণ্টা পড়লে মাস্টারমশাইরা আমাদের সেখান থেকে ডেকে নিয়ে যেতেন, আবার ক্লাসের শেষে সেখানে পৌঁছে দিতেন। পরের ঘণ্টার অধ্যাপক আবার ডেকে নিয়ে যেতেন। সে এক বিচিত্র অদৃশ্য পর্দা-প্রথা। সুখের বিষয়, পর্দাটি একেবারে অ-ভেদ্য ছিল না; আস্তে আস্তে এমন কয়েক-জন সহপাঠীর সঙ্গে ভাব হল, আজ পর্যন্ত যাদের বন্ধুত্ব আমার জীবনের সহায়-সম্পদ।

তাঁদের মধ্যে একজন হলেন আমার পিতৃতুল্য কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের পুত্র জ্যোৎস্নানাথ। পরে তিনি উচ্চ সম্মানের সঙ্গে আইন পরীক্ষা পাস করে সরকারি কর্মক্ষেত্রে সুনাম কিনেছেন। তখন দেখতাম উস্কোখুস্কো চুল, খাটো করে ধুতি পরা, হাসিমুখ ও চকচকে চোখের একটি রোগা ছেলে, ভয়-ভাবনার বালাই নেই, সেই অদৃশ্য পর্দাটিকে উপেক্ষা করে, দু'মাস না যেতেই দিব্যি সুন্দর আমার সঙ্গে ভাব করে নিল। তার একটি বদভ্যাস ছিল; প্রায়ই জমি রুমি ও হাফেজের কবিতার ইংরেজি অনুবাদ এনে আমার হাতে দিয়ে বলত—'বাংলা করে দাও।' আপনি-টাপনি বলত না। বুঝতাম আমাকে পরীক্ষা করা হচ্ছে। কাজেই পেছপাও না হয়ে, দুদিনের মধ্যেই অনুবাদ করে এনে দিতাম। সেগুলো দিয়ে কি করত জানি না; বোধ হয় ফেলে দিত; কিন্তু আমার এই বড় উপকার হল যে পারস্যের কবিদের সঙ্গে পরিচয় হল; কবিতা অনুবাদ করারও কিঞ্চিৎ মক্স হল।

সুনীতকুমারের কথা আগেই বলেছি, এই সময় তার সঙ্গেও প্রথম পরিচয় হয়েছিল। বলতে ভুলে গেছি যে কবিতার অনুবাদের তোড়া হাতে নিয়ে জ্যোৎস্না একদিন অকৃতজ্ঞভাবে বলেছিল—'অনুবাদ হয়তো করতে পারো, কিন্তু আমার মা'র মতো রাঁধতে আর ঘরের কাজ করতে হলে, একদিনেই মরে যাবে।' পুরুষমানুষদের কাছ থেকে কোনদিনই

Scanned by CamScanner

যুক্তিযুক্ত আচরণ আশা করি না বলে কিছু বলি নি। তবে কথাটার মধ্যে যে অনেকখানি সত্য ছিল তখনো জানতাম।

অধ্যাপকদের সম্বন্ধেও কিছু বলতে হয়। এর আগে অবধি সর্বদা ইংরেজি পড়ে এসেছিলাম ইংরেজ মহিলাদের কাছে। এখানে প্রথমদিন অধ্যাপকদের অশুদ্ধ ইংরেজি উচ্চারণ শুনে যেমন ক্ষুণ্ণ হয়েছিলাম, দুদিনে তাঁদের প্রকৃত পাণ্ডিত্যের পরিচয় পেয়ে তেমনি শ্রদ্ধায় আমার মন ভরে গেছিল। অশুদ্ধ উচ্চারণ অবিশ্যি সকলের ছিল না। তাঁদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের। আসলে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক; বিশেষ করে সেক্সপীয়র ও চসার তাঁর নখাগ্রে ধরা ও হৃদয়ে আসীন। ইংরেজি ভাষাতত্ত্বে গভীর জ্ঞান। অমন মানুষ কম দেখেছি। একবার চসার প্রসঙ্গে একটি প্রাচীন শব্দের কথা উঠেছিল। শব্দটি কোনো রঙ বোঝায় এবং যে প্রসঙ্গে ব্যবহৃত তাতে মনে হয়েছিল বেগনি কি নীল গাঢ় ছাই রঙ হবে। তবে ঠিক কি রঙ সেটা সেদিন সাব্যস্ত হয় নি। পরের সপ্তাহে ঐ ক্লাসে প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে একটি ভৃত্য প্রবেশ করল, তার হাতে সাতটি মোটা মোটা বই। সবগুলি মধ্যযুগের ইংরেজি বই এবং প্রত্যেকটিতে রচয়িতা ঐ বিশেষ রঙটির উল্লেখ করেছেন। মাস্টারমশাই শব্দের ব্যবহারের তুলনামূলক সমালোচনা করে রঙটির সংজ্ঞা নির্দেশ করার চেষ্টা করেছিলেন। দুঃখের বিষয়, তাঁর শেষ সিদ্ধান্তটি আমার আদৌ মনে নেই, কারণ ভাব ও ভাষাকে যতই না শ্রদ্ধা করি, শব্দকে যে নিশ্চয় ততখানি করি না, সে-কথা এইখানে প্রমাণিত হল। ব্রাউনিং-এর বিখ্যাত 'গ্রামেরিয়ান'-এর কথা বারবার মনে পড়ে।

সব চেয়ে বড় খেদের বিষয় হল যে মাস্টারমশাই এমন প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের কোনো স্থায়ী নিদর্শন রেখে গেলেন না। তাঁর বক্তৃতার নোট পড়েই কত ইংরেজিনবীশ লিখিয়ে বলে নাম কিনেছেন, অথচ জ্ঞানের সেই গোমুখীকে সবাই এখন ভুলে গেছে।

তাঁর চেহারাটি মনে করি। তখন বয়স নিশ্চয় কম করেও পঞ্চাশ-বাহান্ন হয়েছিল ; মোটা, বেঁটে, শামলা রঙ, মুখাবয়বে সৌন্দর্যের বালাই

Scanned by CamScanner

নেই। শুধু চোখ দুটি থেকে একরকম জ্যোতি বেরুত। বিরল কেশ। পরনে একটা ছাই কি পাটকিলে রঙের গলাবন্ধ কোট, তার সব বোতাম যথাস্থানে থাকত না; আর একটা ধুতি, তাকে কোনোমতেই মিহি বলা চলে না। সামনে দাঁড়িয়ে এই মানুষটি যতদূর মনে হচ্ছে আধময়লা রুমাল দিয়ে নাকের নসিা মুছতেন। চোখ বন্ধ করে তাঁর সেক্সপীয়রের ওথেলো পাঠ শুনতাম। মনে হত কোনো ইংরেজি প্রেমিক ভাবে গদগদ হয়ে কোনো অদৃশ্য চরণে হৃদয়ের ব্যথা নিবেদন করছে। চোখ খুলে চেয়ে দেখতাম; অমনি গায়ে কাঁটা দিত; চোখের সামনে আমাদের আধবুড়ো মোটা বেঁটে মাস্টারমশাই সুন্দরী ডেসডিমোনা হয়ে যেতেন, যার অপরূপ রূপ দেখে পঞ্চেন্দ্রিয় বেদনায় বিদীর্ণ হয়।

রসবোধও ছিল তীক্ষ্ণ, সেটি পরিবেশন করতেও জানতেন। একেকবারে সেক্সপীয়রের একেকটি নাটক আরম্ভ থেকে শেষ অবধি পড়ে যেতেন। পড়ে যেতেন বললে কম বলা হয়, বরং অভিনয় করে যেতেন; সে অভিনয়ে এতটুকু নাটুকেপনা ছিল না। হাত-পা নাড়তেন না, শুধু কণ্ঠের দক্ষতায় শ্রোতাকে মুগ্ধ করে রাখতেন। ক্লাসের ছাত্রছাত্রীরা ছাড়াও দলে দলে শ্রোতা এসে ভিড় করত। ছুটির ঘণ্টা পড়ে যেত, কারো হুঁশ থাকত না। মোটা বেঁটে মাস্টারমশাই কি যাদুবলে সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতেন কে জানে। তারপর যখন পড়া শেষ হয়ে যেত, মনে হত প্রচণ্ড একটা প্রভঞ্জনের মধ্যে দিয়ে এসেছি, এখনো নিজের মধ্যে নিজে নেই। কারো মুখে কথা ফুটত না। সাধারণ চিন্তা অবান্তর বলে বোধ হত। এমন অভিজ্ঞতা আমার জীবনে আর কখনো হয় নি।

রবি ঘোষ বলে আরেকজন আসতেন, সপ্তাহে একদিন ক্লাস নিতেন, কি মধুর তাঁর ইংরেজি বলা।

এঁদের উল্টোটি ছিলেন জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়। ছোটখাটো হাল্কা মানুষটি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, চটপটে চলাবলা, ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলতে পাগল। এমন করে ওয়ার্ডসওয়ার্থের কাব্যে আর কাউকে ডুবে যেতে দেখি নি। তবে উচ্চারণের লালিত্য না থাকায়, শ্রোতাকে তেমন করে আকর্ষণ করতে পারতেন না।

Scanned by CamScanner

আরো অনেকে ছিলেন, প্রিয় ও পরিচিত সব নাম, শ্রদ্ধেয় ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅমিয়কুমার সেন, শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন, শ্রীমোহিনী ভট্টাচার্য। সারাজীবনের পাথেয়র খানিকটা করে তাঁদের কাছে পেয়েছি। মোহিনী-বাবুর বয়স বেশি ছিল না, ছাত্রীদের দিকে তাকাতে লজ্জা পেতেন। ভাল ছাত্রী ছিলাম, সকলেই আমাকে চিনতেন, কিন্তু প্রায় কুড়ি বছর পরে আরেকজন অধ্যাপক বন্ধু যখন নতুন করে মোহিনীবাবুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন, তিনি বললেন, আমাকে কখনো দেখেছেন বলে মনে পড়ছে না। দেখবেন কি করে, দেখতে হলে তো তাকাতে হয়। এঁরা আমার মনের চিত্রশালা আজও আলো করে আছেন।

অশান্তির সময় তখন, এদিকে সন্ত্রাসবাদীদের ধৈর্যচ্যুতি হয়েছে, ওদিকে সিভিল ডিসোবিডিয়েন্স চলেছে। ছাত্রসমাজের নেতা তখন সুভাষচন্দ্র বসু। বাংলার যুবককুলের চোখ তাঁর উপর নিবন্ধ। বিলিতি খবরের কাগজে তাঁকে নিয়ে নানারকম ঠাট্টাতামাশা চলে, আমরা রাগে অন্ধ হই। এখন মনে হয় গান্ধীজীর অহিংসা-বাণীকে সাম্রাজ্যবাদীরা ভয় করতেন না, তাতে তাঁরা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু বিবেকানন্দ স্বামীর পর এমন জ্বালাধরা কথা বাংলার মাটিতে তো আর কেউ বলে নি, এ তো বড় ভাবিয়ে দিলে! বেশিদিন লোকটাকে ছেড়ে রাখা নিরাপদ নয়।

সে-সব দিনের কথা স্বপ্নের মতো মনে হয়। পিকেটিং, ধরপাকড়, বোমা বিস্ফোরণ। সহপাঠিনীদের মধ্যে সব চাইতে কোমল নীরব মেয়েটি হঠাৎ একদিন বলে বসল—'দেশকে কতখানি ভালোবাসো?'

বললাম, 'দেশের জন্যই বাঁচতে চাই।'

সে বললে, 'মরতে চাও না?'

বুকের ভিতর কি একটা হঠাৎ আঁকুপাকু করে উঠেছিল, চোখে ঝাপসা দেখেছিলাম। সে একটু হেসে বলেছিল, 'তাই হোক। বাঁচার লোকেরো তো দরকার।'

এই কোমল প্রকৃতির মেয়েটি সন্ত্রাসবাদের দায়ে ধরা পড়ে জীবনের

Scanned by CamScanner

অনেকগুলি বছর জেলে কাটিয়েছিল, অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করেছিল। এখন সে শান্তিভাবে কর্মময় জীবন যাপন করে। তার নাম কমলা দাশগুপ্ত।

কথায় কথায় অশান্তি তদন্ত তল্লাশি। একদিন কলেজ স্ট্রীটের বইয়ের দোকানে তল্লাশি হল। রবি ঘোষ ক্লাসে এসে মুচকি হেসে বললেন, 'র দিয়ে আরম্ভ সব কথাই যে সাংঘাতিক রাজদ্রোহাত্মক তা কে না জানে। আর "মুভমেন্ট" শব্দটি তো উচ্চারণ করাও বিপজ্জনক। তাই—"দি রোমান্টিক মুভমেন্ট ইন দি নাইন্‌টিন্‌থ্‌ সেঞ্চুরি"র সব কপিই এখন সি-আই-ডি'র হাতে। তোমাদের দরকার হলে আমারটা চেয়ে নিও।'

সে বছরটাও কেটে গেল। অনেকে জেলে গেল, অনেকে পড়া ছেড়ে হাতের কাজে মন দিল, অনেকে দু-চার বছর নষ্ট করে, আবার ইঁদুর হয়ে গেল। বাকিরা লম্বা এক আবেদনপত্র উপাচার্য সাহেবকে দিয়ে এল, তার সারমর্ম হল যে পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়া হোক। হলও তাই। আমরা সেবার নভেম্বরে পরীক্ষা দিলাম।

মনটা খুব ভালো ছিল না। ভিতরে ভিতরে বিলেতে গিয়ে আরো পড়াশুনা করার ইচ্ছা, কিন্তু স্কলারশিপ যোগাড় না হলে সেটি হবার জো নেই। চার বছর অন্তর তখন মেয়েদের একটা স্টেট স্কলারশিপ দিত, ইংরেজির জন্য। মনে বড় আশা, ও স্কলারশিপ আমাকে দিতে কর্তৃপক্ষ বাধ্য হবেন। যথাকর্তব্য সব করা হল, তৈলের ব্যাপারটি ছাড়া। সেটা বাবাকে দিয়ে কস্মিন্‌কালেও হবে না। আমাকে ইন্টারভিউতে পর্যন্ত ডাকল না। যে স্কলারশিপটি পেল তার যোগ্যাযোগ্যতা সম্বন্ধে মুখে বললাম না বটে, কিন্তু কত যে ক্ষুণ্ণ হয়েছিলাম বলতে পারি না।

যাই হোক, এম. এ. পরীক্ষাও ভালোভাবে পাস করলাম। পরীক্ষার ফল বেরুল ফেব্রুয়ারীর শেষে, তার পরদিনই শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের কন্যা হেমলতা সরকার ও তাঁর ছোটখাটো একটি দলের সঙ্গে দার্জিলিং চলে গেলাম। এই আমার প্রথম বাড়ি ছাড়া। এখন ভাবতে আশ্চর্য লাগে আমার মায়ের নিরাপদ বাড়িটি থেকে কেমন সহজে নিজেকে টেনে বের করে এনেছিলাম। এর পর মা'র বাড়িতে আর স্থায়ীভাবে

বাস করি নি। কিন্তু বাড়ি তো আর শুধু ইটকাঠের তৈরি হয় না, মা'র স্নেহচ্ছায়াতেই আমার জীবন কেটেছে। সে গভীর ভালোবাসার কোথাও এতটুকু ঘাটতি দেখি নি।

হেমলতা সরকারকে আমরা হেমমাসিমা বলতাম। আমার দিদিমা মারা গেলে, আমার ছোট মাসি বুটিকে, হেমমাসিমার বাবা নিয়ে গিয়ে নিজের মেয়ের মতো মানুষ করেছিলেন। অনেক বছর বয়স হওয়া অবধি ছোট মাসি জানতেনও না যে ওঁরা ওঁর সত্যিকার মা-বাবা নন। যখন-কার কথা বলছি, তার আগের বছর ছোট মাসি পাটনায় স্বামী ছেলে-মেয়ে রেখে, একচল্লিশ বছর বয়সে চোখ বুজেছেন। হেমমাসিমা অনেক আগেই বিধবা হয়েছেন, অনেক কষ্টের মধ্যে দিয়েও গেছেন, কিন্তু তবু অদম্য উৎসাহে দার্জিলিং-এর মেয়েদের একমাত্র বাংলা হাইস্কুলের অধ্যক্ষা হয়ে, অক্লান্তভাবে কাজ চালাচ্ছেন। জানাশোনার মধ্যে কোথাও কোনো সম্ভবনাময়ী বি. এ. পাস মেয়ে দেখলেই, হেমমাসিমা হয় তার বিয়ে দেবার চেষ্টা করতেন, নয়তো তাঁর স্কুলে চাকরি দিতেন। আমি নানান্ কারণে নিজে যেচে গিয়েছিলাম। হেমমাসিমা একটু অবাক হয়েছিলেন, ভালো এম. এ. পাসরা তো সাধারণত মফঃস্বলের ছোট স্কুলে যেতে চায় না। যাই হোক, আমার মাসিক বেতন ঠিক হল একশো টাকা। ভালো ছাত্রী বলে অন্যদের চেয়ে একটু বেশি।

দার্জিলিং-এ এর আগের বছর আমার প্রিয় বান্ধবী শ্রীমতী মীরা দত্তগুপ্তা ও তাঁর স্নেহশীল মা-বাবার সঙ্গে গিয়ে, বড় আনন্দে তিনটি সপ্তাহ কাটিয়ে এসেছিলাম। এগারো বছর বয়সে সেই যে আমাদের বড় প্রিয় পাহাড় থেকে নেমে এসেছিলাম, তারপর আর সত্যিকার পাহাড় দেখি নি। গিরিডি, দেওঘর, হাজারিবাগ থেকে যে সব পাহাড় দেখতাম, তাকে আমরা পাহাড় বলতাম না, টিপি বলতাম। কিন্তু দার্জিলিং-এর কথা আলাদা।

শিলিগুড়ি থেকে ছোট রেলগাড়ি যেই পাহাড়ের দিকে চলল, কেমন একটা বোঝা আমার নিঃশ্বাস চেপে ধরেছিল। দূর থেকে দেখেছিলাম নীল নীল ছায়া, মেঘের আস্তরণ, দেখে বুক ধড়ফড় করেছিল। তারপর

Scanned by CamScanner

কেবলি ওঠা, মুখে ঠাণ্ডা বাতাস লাগা, চারদিকের বন্ধন খসে পড়া বড় চেনা বড় জানা বড় প্রিয় একটা পরিবেশ। কে কেবলি যেন ডেকে ডেকে বলছিল, 'এসো, ফিরে এসো।' সেবার দিন কুড়ি-বাইশ ছিলাম।

এবার বেশিদিন থাকব মনে করে এসেছিলাম। কিসের আশায় গিয়েছিলাম নিজেই জানি না। পৌঁছলাম বিকেলবেলায়। মেঘলা দিন, টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে, কন্‌কনে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। স্টেশনের কাছেই স্কুল। স্কুলবাড়ির দোতলায় শিক্ষিকারা মেস করে থাকেন, একেক ঘরে দুজন করে। আমাকে কিন্তু দেওয়া হয়েছে বিশাল একটা ঘর, কাঠের মেঝেতে পা ফেললেই ক্যাঁচকোঁচ করে ওঠে, বড় কাঁচের জানলা, তাতে পাতলা কাপড়ের পর্দা, জানলার মাথায় মাথায় টিনের চাল উঁচু করে তৈরি। একে বিলেতে 'গেব্‌ল্' বলে। ছাদের কার্নিসের নিচে নীল পাখির বাসা। একদিকের জানলা দিয়ে চাইলে বরফের পাহাড়ের সারি। অন্যদিকের জানলা দিয়ে দেখি নিচের পাহাড়ের ঢাল, তার গায়ে লাল ছাদ দেওয়া চা-বাগানের বাড়ি; আরো নিচে সঙ্কীর্ণ উপত্যকা, সেখানে নুড়ির উপর দিয়ে পাহাড়ী নদী বয়ে যাচ্ছে। কখনো সব মেঘে ঢাকা, কখনো স্বচ্ছ, ঝক্‌ঝকে।

বাড়ির নাম 'অর্কিড লি'। গাছে গাছে কে এত আদর করে অর্কিড লাগিয়েছে? শুনলাম কোনো এক চা-বাগানের সাহেব তার রুগ্‌ণা স্ত্রীর জন্য বাড়িটি করেছিল, সুন্দর সুন্দর জিনিস দিয়ে সাজিয়েছিল। স্ত্রী অকালে স্বর্গে গেলে, যেমন-তেমন দামে বাড়ি বেচে সাহেব দেশে ফিরে গিয়েছিলেন। বাড়ি ভরা দামি আসবাব, বিবর্ণ জরাজীর্ণ অযত্নে মলিন। এ বাড়িতে কেমন করে থাকব? একা ঘরে তো এর আগে কখনো শুই নি, কি করে ঘুমোব? বাগানে ফুলের বাহার; বড় বড় গাছে রডোডেন-ড্রন ফুলের উদ্ধত সৌন্দর্য। নিচে মাটির কাছাকাছি হলদে প্রিমরোজ, নীল ফরগেট-মি-নট। ধাপে ধাপে টিবেটান রোজের বেগনি সাজের বাহার। ছোটবেলাকার কত চেনা ফুলের মুখ কতকাল পরে আবার দেখলাম। কিন্তু তখন তারা একান্ত আপনার জন ছিল, তাদের খুঁড়েছি,

Scanned by CamScanner

উপড়েছি, পাপড়ি ছিঁড়েছি, কোলে নিয়ে আদর করেছি। এরা অন্য লোকের।

অন্য টিচারদের মন্দ লাগল না। কিন্তু একজন খৃশ্চান মহিলা ছাড়া, সবাই বড় উগ্র ব্রাহ্ম! তাদের দেখে দেখে আমার হাঁপ ধরে যেত। রবিবারে রবিবারে মন্দিরে উপাসনা শুনতে যাওয়া, সেদিন নিরামিষ খাওয়া। টিচারের মধ্যে যিনি বয়সে সব চেয়ে বড়, তিনি হলেন বোর্ডিং-এর গিন্নি। বোর্ডিং অবিশ্যি নয়, আসলে মেস; কিন্তু মেস বলতে কেমন কেরানি-কেরানি শোনায় বলেই বোধ হয় বোর্ডিং বলা হত। প্রত্যেকে মাসে মাসে কুড়ি টাকা করে দিত, তাতেই খাওয়া-দাওয়া রাঁধুনির মাইনে চলত। রাঁধুনিটির বয়স হয়েছে, এককালে ফুটফুটে সুন্দরী ছিল, এখন মুখটা কুঁচকেমুচকে গেছে, কিন্তু রঙটি সোনার মতো আর চোখ দুটি হীরের টুকরো। নাকের ডগাটা কিন্তু লাল। আর পায়ে বাত বলে জুতো না পরলেও মোটা ছেঁড়া উলের মোজা এর কাছ থেকে ওর কাছ থেকে চেয়ে পরত। ছোট শিশি থেকে 'ওষুধ' ঢেলে ঢেলে খেত, মুখে তার গন্ধ লেগে থাকত।

কুড়ি টাকায় কি করে চলে? কিন্তু সব চেয়ে যার কম মাইনে, তার ক্ষমতার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া চাই ; ছোট বড় রাখলে চলে না; এখানে সাম্যবাদ। ভালো ফল তরকারি কিছুই আসত না। দুধ যারা খেত আলাদা পয়সা দিয়ে খেত। আমি দুচক্ষে দুধ দেখতে পারতাম না। খৃশ্চান মহিলাটি শুনলাম দারুণ ভোজনবিলাসী, তাঁর খাই-খরচাই নাকি মাসে পঞ্চাশ টাকা। তাঁর নিজস্ব একটি আয়া ছিল। সে-ই তাঁর ফাই-ফরমায়েশ খাটত, বাড়তি সুখাদ্যগুলি রেঁধে দিত। ভদ্রমহিলা সবাইকে না জানিয়ে একটি মটরের দানা দাঁতে কাটতে পারতেন না। বলা বাহুল্য তাঁর বেতন সবচেয়ে বেশি, আমার চেয়েও।

বোর্ডিং-এর গিন্নিমা সারাদিন স্কুলের নিচের ক্লাসে পড়াতেন, সকাল-সন্ধ্যা ঘরকন্না দেখতেন। রবিবার মন্দির-ফেরত হাট থেকে সস্তায় তরি-তরকারি কিনে আনতেন, নিজেই রাঁধাবাড়ার তদারকি করতেন, দরকার হলে রাঁধতেন এবং খুব ভালো রাঁধতেন। তাঁকে দেখে অবাক হতাম; আধাবয়সী, মোটা-সোটা কুমারী মহিলা, রঙ ফেটে পড়ছে, মাথাভরা

Scanned by CamScanner

কোঁকড়া চুল, সুন্দর হাত-পা'র গড়ন। কিন্তু কোথাও কোনো কোমলতা ধরা পড়তে দিতেন না; একটা কঠিন হিমশীতল সৌজন্যের আবরণে নিজেকে ঢেকে রাখতেন। অনেক বছর পরে তাঁর জীবনের দুঃখের কাহিনী শুনেছিলাম আর কঠিন বরফের নিচে প্রবাহিত মন্দাকিনীর মিষ্টি জলের আস্বাদ পেয়েছিলাম। কিন্তু তখন ওখানে যে চারটি মাস কাটিয়েছিলাম, তাঁর আসল প্রকৃতি একটুও বুঝি নি। এক ধরনের উদ্ধত বিনয় আমাকে তখন বাইরের লোকের কাছ থেকে আলাদা করে রাখত।

শনিবার বেলা একটায় ছুটি হত। সেদিন বিকেলে বাড়িতে জলখাবার তৈরি হত। মা-ও শনিবার বাড়িতে জলখাবার করতেন মনে করে গলাটা একটু ব্যথা করত। এইভাবে শনিবারে শনিবারে আমার জলখাবার তৈরি শেখা হল। টিচাররা পালা করে ঘরকন্নার সাহায্য করত; আমারো বেশ শিক্ষানবিশি হয়ে গেল।

কিন্তু দুটো রবিবার মন্দিরের উপাসনায় যাবার পর, হঠাৎ আমি বেঁকে বসলাম, কিছুতেই আর গেলাম না। সকলের চক্ষুস্থির; চিরকাল সব টিচাররা মন্দিরে যান, খৃশ্চান মহিলাটি নিয়মিত গির্জায় যান, এ আবার কি নতুন কথা! তবে কি বলতে চাও, ব্রাহ্ম হয়ে সপ্তাহে একবারো ভগবানের নাম শোনা খারাপ? বললাম, 'যাতে আমার মন সাড়া দেয় না, সেরকম উপাসনায় যোগ দেওয়া আমার পক্ষে ভণ্ডামি ছাড়া আর কিছু নয়। অমন গড়পড়তা ভগবানের নামে আমার মনের চাহিদা মেটে না। তার চেয়ে বরং আমি হিমালয়ের দিকে চেয়ে বসে থাকব।'

হেমমাসিমা নিজে নিষ্ঠাব্রতী ব্রাহ্ম হলেও এই বলে বিবাদ মিটিয়ে দিলেন—'থাক্ না, না-ই বা গেল। ওর দাদামশাই ব্রাহ্ম হয়ে আবার হিন্দু হয়ে গিয়েছিলেন। পায়ে হেঁটে তিব্বত গিয়েছিলেন, চা-বাগানের কুলিদের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলেন, মানস-সরোবরে স্নান করেছিলেন। ও-যে হিমালয়ের দিকে চেয়ে থাকবে সে আর আশ্চর্য কি?' কৃতজ্ঞতায় বুক ভরে গেল, তবু মন্দিরে গেলাম না। মন খালি খালি বলে, হেথা নয়, হেথা নয়, আর কোনোখানে।

Scanned by CamScanner

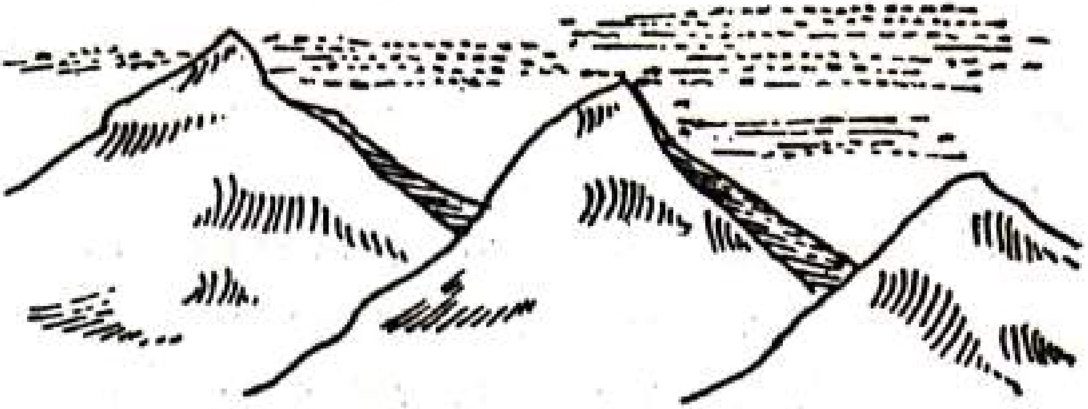

॥ আঠারো ॥

নিচে কার্ট রোড, সেখানে 'অর্কিড লি'র ফটক। ফটক থেকে স্কুলবাড়ি অবধি এঁকেবেঁকে পথ নেমে গেছে। আরো অনেক নিচে কান পাতলে জল পড়ার শব্দ শোনা যায়, একটা ঝরনা সারাদিন জল ঢালে ঃ কার্ট রোডের উপরে ছিল অক্ল্যান্ড রোড, সেখান থেকে একটা চড়াই রাস্তা উঠেছে তার নাম ম্যাকিন্টশ রোড। তার প্রথম দিকটা সব চেয়ে খাড়া; খাড়া জায়গাটুকু পেরুলেই, ডান হাতে ঢালের উপরে 'আশানটুলি'। লাল করুগেটের ছাদ, একতলা লম্বা বাড়ি, সারি সারি কাঁচের দরজা-জানলা, খানিকটা কাঁকরবাঁধানো জমি, ফুলে ফুলে রঙিন। সেই বাড়িতে রবীন্দ্র-নাথ এলেন।

মেসোমশাইয়ের সঙ্গে গেলাম তাঁকে দেখতে। মেসোমশাই মানে সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র। দিন দশেক হল তাঁরাও এসেছেন, অক্ল্যান্ড রোডে উড্‌ল্যান্ড্‌স বাড়িতে তাঁদের জন্য ঘর ভাড়া করে দিয়েছি। মাসিমা এসেছেন, আমার সুন্দরী মাসতুতো বোনটিও এসেছে, এখন তার উনিশ বছর বয়স, রূপ উথলে পড়ছে। গান গায়, ছবি আঁকে, বিয়েতে তেমন উৎসাহ দেখা যায় না। তাঁরা চাকর দাসী নিয়ে দিব্যি সংসার পেতে ফেললেন। সেখানে গেলেই টের পেতাম, আসলে আমার মা'র সংসারটির জন্য আমার কত মন কেমন করে।

বিকেলবেলায় আশানটুলিতে গিয়ে দেখি লোকে লোকারণ্য। বাইরের ঘরের কাঁচের দরজা হাট করে খোলা, কবি বসেছেন কৌচে, তাঁকে ঘিরে কৌচ কেদারায় গণ্যমান্যরা বসেছেন, তাঁরা সরে গিয়ে মেসো-

Scanned by CamScanner

মশাইয়ের জন্য জায়গা করে দিলেন। আমরা ছোটখাটোরা নিচে গালচের উপর গাদাগাদি করে বসলাম। রবীন্দ্রনাথের বড় দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ; তাঁর ছেলে দীপেন্দ্রনাথ; দীপেন্দ্রনাথের ছেলে দিনেন্দ্রনাথ। সবাই তাঁকে দিনুবাবু বলে, কেউ বা ডাকে দিন্‌দা বলে।

দিন্‌দার সঙ্গে কমলবৌঠানও আছেন। গোলগাল ফরসা মানুষটি, সুন্দর নক্‌শাকরা কাশ্মীরী শাল গায়ে। তাঁদের সঙ্গে আমার বাল্যবন্ধু পূর্ণিমা ওরফে বুবুকে দেখে মনটা খুশি হয়ে গেল। বুবুর মা নলিনী দেবী দিন্‌দার সহোদরা। বুবুর দাদামশাই রবীন্দ্রনাথের ভাইপো, বুবুর মা তাঁর নাতনি, কাজেই বুবু তাঁর পুতনি। আমাকে দেখেই তাই কবি বললেন, 'বন্ধুকে হয়তো এবার হারাবে।' হারাব কেন? কবি মুচকি হেসে বললেন, 'সে যে মাদ্‌রাজীতে আধ্‌রাজি!'

বুবু মুখ লাল করে বললে—'যাও!' শুনলাম একজন মাদ্‌রাজী সুপাত্র ক'নের আশায় ঠাকুরবাড়ির চারদিকে ঘুরঘুর করছে। বলা বাহুল্য শেষ পর্যন্ত ভবি ভোলে নি।

এই প্রথম এত কাছে থেকে কবির চোখে কৌতুকের ঝিলিক দেখলাম। সন্ধ্যা হলে সভাও ভঙ্গ হল। একটি ছোট মেয়ে কিছুতেই উঠবে না। তার মা তার হাত ধরে টানাটানি করতে লাগলেন, 'রবিঠাকুর দেখতে এসেছিস, ঐ তো দেখা হল। এবার বাড়ি চল্‌।'

মেয়ে গ্যাঁট হয়ে বসে বলল, 'চলতে দেখি নি।'

তাই শুনে কবি টুক করে উঠে পড়ে ঘরময় হেঁটে বেড়িয়ে, চলা দেখিয়ে দিলেন। মেয়েটি খুশি হয়ে বাড়ি গেল। কবির বয়স তখন প্রায় সত্তর।

রোজ বিকেলে মেসোমশাই কবির কাছে যান, আমিও সঙ্গ ধরি। সারাদিন স্কুলের কাজে মন বসে না, কি যে বলি কি যে বোঝাই, লাল-গাল ছোট মেয়েগুলো তার কতখানি বোঝে আমি বুঝি না। জানলা দিয়ে যেই না দেখি নীল পাহাড়ের সারির পিছনে আরো ফিকে নীল পাহাড়, তার মাথায় বরফের মুকুট পরানো, আবার তারও পিছনে আগা-গোড়া বরফে ঢাকা পাহাড়, রোদ যেমন সরে সরে যাচ্ছে, ক্ষণে ক্ষণে

Scanned by CamScanner

তার রূপ বদলাচ্ছে, অমনি ছোটবেলাকার পাহাড়গুলোও চোখের ভিতরে ভিড় করে আসে। পড়ানো আমার ভালো হয় না টের পাই। তবু মেয়েগুলো আমাকে দেখলে খুশি হত; আমাকে তারা হেলিওট্রাপ ফুলের ছোট ছোট তোড়া এনে দিয়ে মুখের দিকে চেয়ে থাকত, আমাকে খুশি হতে দেখলে ওরাও খুশি হত।

একটু একটু লিখি তখন ইংরিজি বাংলা কাগজপত্রে; 'সন্দেশ' পত্রিকাটি যে ক'টি বছর চলেছিল, প্রায় প্রতি মাসে একটা করে গল্প লিখে দিতাম। ভাই-বোনদের লম্বা চিঠি লিখতাম। যতির তখন বছর চোদ্দ বয়স, ছোট বোনটারো বারো হয়েছে, তাদের চিঠিভরা স্কুলের খবর। পড়ে মন কেমন করে।

রবীন্দ্রনাথের কাছে অপূর্ব চন্দ আসতেন, তিনি তখনো প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক, পরে উচ্চতর সম্মান তাঁর জন্য অপেক্ষা করে ছিল। ডাঃ ধীরেন্দ্রমোহন সেনকেও দেখলাম সেখানে, সদ্য বিলেত থেকে ফিরেছেন, যেমনি সুদর্শন তেমনি চৌকোস; পরে তাঁর অদ্ভুত কর্মদক্ষতা ও কটুবাক্য-প্রিয়তা দেখে হাসব কি কাঁদব ভেবে পেতাম না। কর্মক্ষেত্রে যেসব গুণী লোক দেখেছি ধীরেন্দ্রমোহনকে তাঁদের মধ্যে স্থান দিতে হয়।

কবির কাছ থেকে উঠে দিন্‌দার মহলে যাওয়া হত। সেখানকার আবহাওয়া অন্যরকম। দিন্‌দা আর কমলবৌঠান মজলিশি মানুষ, অতিথি-অভ্যাগত কাছে এলে দুদিনে তাঁদের আপন জন হয়ে যেত। দিন্‌দার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকতাম, অমন মোটা মানুষ কম দেখেছি; আর অমন মধুর কণ্ঠও কখনো শুনি নি। একদিন রিকশা চেপে তাঁকে ম্যাকিন্টশ রোড দিয়ে উপরে উঠতে দেখেছিলাম, সে দৃশ্য ভুলবার নয়। রিকশার সামনে দুজন প্রায় ছ'ফুট লম্বা তিব্বতের দিকের লোক টানছে, পিছনে আরো দুজন ঠেলছে। নামবার সময় তাদের কাজ হল রিকশা টেনে ধরে রাখা; যাতে গড়গড়িয়ে খাদে না নামে। তাদের মাথায় জানোয়ারের লোমের ঝালর দেওয়া অদ্ভুত টুপি, কানে অতিশয় দামি টার্‌কয়েজ পাথরের মাকড়ি, পায়ে ভারি জুতো। মুখের ভাবটাকে কেমন

Scanned by CamScanner

যেন হিংস্র মনে হত: দিনদা দিব্যি নিশ্চিন্তে তাদের হাতে নিজেকে কেমন সমর্পণ করেছেন দেখে আশ্চর্য লাগত। পরে বুঝেছিলাম লোকগুলি অতি সরল স্নেহশীল, বাইরে থেকে প্রথম দর্শনে যাই মনে হোক না কেন।

একদিন শুনলাম কবি বলেছেন, তাঁর পাহাড় খুব ভালো লাগে না, কেমন যেন বুকের উপর বোঝার মতো চেপে বসে, অসীম দিগন্ত যেন বড় বেশি ছোট হয়ে চারদিক দিয়ে বাধার সৃষ্টি করে। শুনে আমি ভারি অবাক হয়ে গেলাম, কবির মুখে এ আবার কি কথা! পাহাড়ে চড়লে আমার তো মনে হয়—সংসারের শৃঙ্খলগুলো একে একে খসে পড়ছে। যতই উপরে ওঠা যায়, ততই যেন মুক্তির স্বাদ পাওয়া যায়। কবির কথা হয়তো পাহাড়-ঘেরা উপত্যকা সম্পর্কে খাটতে পারে; দার্জিলিং সম্পর্কে কি করে খাটে?

দেখতে দেখতে তল্পিতল্পা গুটিয়ে কবি নামবার যোগাড় করতে লাগলেন। সত্যি সত্যি দার্জিলিং-এর সিজন ফুরোবার আগেই সবাই নেমে গেলেন। মাঝে মাঝে ঐদিক দিয়ে বেড়াতে গিয়ে দেখতাম শূন্য বাড়ি খাঁ-খাঁ করছে। তবে যে জায়গায় যেদিকেই তাকানো যায়, দেখে দেখে আর আশ মেটে না। সেখানে ফাঁকা লাগবার খুব অবকাশ থাকে না। শনি-রবি মাসির বাড়িতে কাটাই; মেসোমশাই বলেন, পুরনো ইংরিজি কবিতা পড়ে শোনাও। ছোট একটি লাল বই, নাম তার সেক্স-পীয়র টু হার্ডি, কাব্য সংকলন, আমার নিত্য-সঙ্গী। এখনো সে লাল বইটি আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকে, এখনো তার কাজ ফুরোয় নি। সেই বই থেকে সন্ধ্যাবেলায় দার্জিলিং-এর সেই লাল গালচে-পাতা ঘরে, কৌচের উপর পা গুটিয়ে বসে মেসোমশাইকে পড়ে শোনাতাম মারলো আর ম্যান্‌গানের কবিতা, ইয়েট্‌স্‌-এর কবিতা। দেখতাম মেসোমশাইয়ের চোখ বুজে গেছে, হাতে গড়গড়ার নলটি ধরা, কিন্তু টানতে ভুলে গেছেন। লাল বইটি হাতে নিয়ে চোখ বুজলেই সেই ছত্রিশ বছরের পুরানো সন্ধ্যাগুলি আবার ফিরে আসে।

তারপর গ্রীষ্মও শেষ হয়ে এল, মাসিমারাও সমতলে নামবার কথা

Scanned by CamScanner

চিন্তা করতে লাগলেন। এমন সময় হঠাৎ একটা চিঠি পেলাম। শান্তিনিকেতন থেকে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, 'তুমি ওখান থেকে নেমে এসে অন্তত এক বছরের জন্য শান্তিনিকেতনে কাজ কর।' আর কথা নয়, আমার অনিশ্চয়তায় ভরা মন অমনি পথ খুঁজে পেল। সাতদিনের মধ্যে স্কুলে ইস্তফা ও কবিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়ে গেল। স্থির হল মাসিমাদের সঙ্গে বর্ষা নামবার আগেই নেমে আসব। জুলাই মাসে বিদ্যালয় খুললে শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনা শুরু করব।

বাবা গেলেন মহা চটে। অনিশ্চয়তা, কথায় কথায় মত বদল, তাঁর দু'চক্ষের বিষ। বাবা কিছু লেখেন নি, মার চিঠিতে বুঝলাম তিনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন এবং শুধু মত বদলানোর জন্যে নয়। কবিকে তিনি যতই শ্রদ্ধা করুন না কেন, শান্তিনিকেতনের হালচালের কথা তিনি লোকমুখে যা শুনেছিলেন, সে সব কোনমতেই সমর্থন করতে পারতেন না। তাছাড়া সারাজীবনে বাবাকে কখনো শখ করে বাংলা কবিতা পড়তে দেখি নি। তবে মাঝে মাঝে তাঁর স্কুলপাঠ্য নীতি-কবিতা থেকে স্থলবিশেষে দু-চারটে সময়োপযোগী উদ্ধৃতি যে ঠুসে দিতেন না, তাও নয়। সে যাই হোক, মোট কথা আমার শান্তিনিকেতন যাওয়াতে তাঁর কোনো উৎসাহ ছিল না। তবে কোনো বাধাও দেন নি। ছোট জ্যাঠামশাই বার দুই এসে বকাবকি করে গেলেন। বলা বাহুল্য কোনো ফল হল না। কবির তখন বিশ্বজোড়া খ্যাতি; দেশ-বিদেশ থেকে বিশ্বভারতীর ছাত্র ও কর্মী আসে, অথচ বাবার মতো অনেক জ্ঞানী-গুণী লোকের কবির শিক্ষাপদ্ধতি ও সামাজিক মতামতের উপর কোনো আস্থা ছিল না।

১৯৩১ সালের জুন মাসের একেবারে শেষের দিকে, দুপুরের একটা প্যাসেঞ্জার ধরে রওনা হলাম। ট্রেনে চেপে এর আগে একা কোথাও যাই নি। এখন ভেবে নিজেই আশ্চর্য হই। সেই প্রথম দিনের যাত্রাটা আমি কখনো ভুলব না ; তারপর হয়তো তিনশোবার ঐ ট্রেনে ঐ পথে গিয়েছি, তবু সেই সাবেকি মোহটুকুর একটুখানি এখনো মনে লেগে আছে। খানা স্টেশন পেরিয়ে যেই না লুপ লাইন ধরা, অমনি সমস্ত জগৎটা গেল বদলিয়ে। চেয়ে দেখলাম লাল মাটি থেকে তখনো খরা

Scanned by CamScanner

যায় নি, বর্ষা সবে শুরু হয়েছে। গাছপালার সব অন্য চেহারা, শাল, সিমুল, পলাশ, মহুয়া; ছোট ছোট পুকুরের চারিদিকে তালগাছ, বেঁটে বেঁটে খেজুর গাছ, মনসা গাছ। বাতাসেও যেন অন্য গন্ধ।

মাঝে মাঝে গাড়ি কাটিং-এর মধ্যে নামে, অদ্ভুত একটা গুড়গুড় শব্দ কানে আসে। মাথার উপরে নীল আকাশে সত্যি সত্যি কালো ফিতের মতো চিল ওড়ে। বিকেলে বোলপুর স্টেশনে পৌঁছলাম। আমাকে নিতে রবীন্দ্রনাথ লোক পাঠিয়েছেন দেখে নিশ্চিন্ত হলাম। তখন স্টেশন ছিল ছোট, প্লাটফর্মের ছাউনি ছিল না, সরু লম্বা কাঁকর বিছানো জায়গা, খানিকটা তার সানবাঁধানো, গোটাতিন আপিসঘর, গুদোমঘর, বোলপুর স্টেশনে তখন বিদেশি ট্যুরিস্টরা নামত না। যারা আসত, তারা চোখে স্বপ্ন নিয়ে আসত, আশেপাশে কি আছে না আছে ভালো করে দেখতে পেত না। যা দেখত তাই ভালো লাগত।

তখন রিকশা ছিল না। তিনটি উপায়ে ঐ মাইল দেড়েক পথ পার হতে হয়। হয় পায়ে হেঁটে, নয় গোরুর গাড়িতে চেপে, নয়তো অনঙ্গ-বাবুর লড়ঝড়ে ট্যাক্সিতে। তখন বিশ্বভারতীর পুরনো বাসটাও ছিল না; তার অভাবও আমরা কখনো বোধ করি নি। আমার জন্য অনঙ্গবাবুর ট্যাক্সি ঠিক করা ছিল। তাতে চেপে আমি ঝড়ঝড় করতে করতে রাজার হালে মেয়েদের নতুন বোর্ডিং শ্রীভবনে পৌঁছলাম।

এখন মেয়েদের জন্য অনেক বাড়ি অনেক ঘর অনেক শাখা অনেক ব্যবস্থা। তখন সব ছিল সাদা-মাটা ঝাড়া-ঝাপটা। একটি দোতলা বাড়ি, সামনে খানিকটা বাগান, একটা লাল ফটক। পিছনে পাঁচিল-ঘেরা খানিকটা ঘাস জমি; তার ওপরে কলঘর স্নানের ঘর; তারি পাশে শ্রীভবনের নিজেদের কুয়ো, তার থেকে অনবরত জল তুলে চৌবাচ্চায় ভরা হত। রান্নাঘর আর শ্রীভবনের মাঝখানে অনেকখানি ফাঁকা জমি; সেখানে সবজি বাগান ছিল, গুদোমঘর ছিল, গোয়ালঘর ছিল। নিজেদের গরুও সেখানে; দুবেলা ছেলেমেয়েরা দুধ খেত।

একটা লাল গরু ছিল এমনি বদমেজাজী যে দূর থেকে মানুষ দেখলেই খুঁটি উপড়ে তাকে তাড়া করত। সে তো খটাখট শব্দ শুনেই

Scanned by CamScanner

বাপরে মারে করে দৌড় লাগাত। ঐ প্রথম দিনই দেখলাম একজন বিখ্যাত শিল্পীকে তাড়া করেছে। তিনি অদ্ভুত বেগে ছুটে একলাফে শ্রীভবনের গেট টপকে পড়িমড়ি করে লাল কাঁকরের পথটুকু পেরিয়ে, সিঁড়ির উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে, হাঁপাতে লাগলেন।

অমনি খট করে শ্রীভবনের সদা-সতর্ক অধ্যক্ষার দরজা খুলে গেল। বেরিয়ে এসে গম্ভীর মুখে তিনি বললেন, 'আপনি কি জানেন না যে এ সময়ে মেয়ে-বোর্ডিংয়ে পুরুষ ভিজিটারদের আসবার কথা নয়? যান শীগ্‌গির!'

শিল্পী বললেন, 'আপনি আমাকে যা খুশি করতে পারেন, রিপোর্ট করতে পারেন, আশ্রম থেকে তাড়িয়েও দিতে পারেন, এমন কি মেরেও ফেলতে পারেন। কিন্তু ঐ গরু ওখান থেকে বিদেয় না হলে, আমি এক পা নড়ছি না।'

তখন অধ্যক্ষা ও উপস্থিত সকলে গরুর দিকে চেয়ে দেখে, সে ফটকের দিকে মুখ করে, লাল লাল চোখ দিয়ে শিল্পীর দিকে তাকিয়ে মাথা নীচু করে শিং বাগিয়ে, আস্তে আস্তে সামনের ডান পার খুরটা মাটিতে ঠুক ঠুক করে ঠুকছে আর নাক দিয়ে ঠিক ধোঁয়া না ছাড়লেও, ফোঁস-ফোঁস করে এত জোরে নিঃশ্বাস ছাড়ছে যে ঐ অত দূর থেকেও আমরা শুনতে পাচ্ছিলাম। একটু পরে অবিশ্যি গয়লা এসে হাজির ও তার সঙ্গে গরুর ভালো মেয়েটির মতো প্রস্থান। তারপর আমি স্নান করে তৈরি হয়ে গুরুদেবের সঙ্গে চা খেতে উত্তরায়ণে গেলাম।

তখন ওখানে পাশাপাশি তিনটি মাত্র বাড়ি ছিল। প্রথমটি প্রাসাদের মতো উত্তরায়ণ, এখন যার নাম হয়েছে উদয়ন। তার পাশে একতলা কোণার্ক, সেখানে তখন জাপানী যুযুৎসু শিক্ষক মিঃ তাকাগাকি সপরিবারে বাস করতেন। তার পাশে কুঞ্জবনের মধ্যে মাটির কুটির, তার খড়ের চাল; সেখানে অমিয় চক্রবর্তী মশাই সপরিবারে থাকতেন। আমাকে সোজা উত্তরায়ণের দক্ষিণের একটি ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। সে ঘরে গুরুদেব লিখতেন পড়তেন ছবি আঁকতেন।

গুরুদেবের কাছে তখন আর কেউ ছিল না। আমার বুক টিপটিপ

Scanned by CamScanner

করছিল। এত কাছে থেকে একলা তাঁকে দেখার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। প্রণাম করতেই পাশের মোড়াতে বসালেন। বললেন, 'প্রথমে ভেবে-ছিলাম আশা এক বছরের জন্য চলে যাচ্ছে, তোমার ঘাড়ে শিশু-বিভাগ চাপাব। তারপর ভেবে দেখলাম তার চাইতে আমার কলেজের বি. এ. ক্লাসে ইংরেজি অনার্স পড়াও। আর যারা ম্যাট্রিক দেবে তাদের অঙ্ক কষাও।' আশা মানে আশা অধিকারী, পরে তাঁর আর্যনায়কমের সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল।

গুরুদেব যদি বলতেন কলাভবনের ছেলেদের রাঁধতে শেখাও, তাতেও আমি আপত্তি করতাম না। আমার মনের উপরে এমনি তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাব ছিল যে যা করতে বলতেন প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে পারতাম। কত সময় কত বার ছোটখাটো ক্ষোভ নিয়ে, রাগ নিয়ে তাঁর কাছে ছুটে গিয়েছি, একবারটি মুখের দিকে স্নিগ্ধ গম্ভীর দৃষ্টিতে চেয়ে বলেছেন, 'তাতে কি হয়েছে? ওরা যাই করুক না কেন, তোমার গায়ে কি তাতে ফোস্কা পড়েছে?' অমনি আশ্চর্য হয়ে ভেবেছি, 'তাই তো, বলুক না যা মুখে আসে, করুক না যা খুশি তাই, আমার তাতে কি-ই বা এসে যায়?' মুহূর্তের মধ্যে মন থেকে সব ক্ষোভ দূর হয়ে যেত।

প্রথমবার এক সপ্তাহ থেকে, কাজকর্মের বিষয়েও যে শিল্পী মনীষীর জুড়ি দেখি নি, সেই নন্দলাল বসুর কাছে রোজ এক ঘণ্টা ছবি আঁকা শেখার ব্যবস্থা করে চলে এসেছিলাম। তারপর ১লা জুলাই ওখানে গিয়ে কায়েমি হয়ে বসলাম।

দিন সাতেকের মধ্যে বুবুও এসে উপস্থিত হল; দুজনে মহা উৎসাহে অধ্যাপনা শুরু করলাম। দুদিনেই বুঝলাম আশ্রমজীবন আর কবির উপস্থিতি আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। ভাবতাম এখানেই জীবন কাটিয়ে দিতে পারি; কিন্তু ছিলাম মাত্র নয়টি মাস, ১৯৩১-এর জুলাই থেকে ১৯৩২-এর এপ্রিল অবধি। তবু ঐ নয়টি মাস আমার জীবনের উপরে যে ছাপ রেখে গিয়েছে, তেমন আর কোনো ন'মাস রাখতে পারে নি।

মনের ভিতরে একটা বন্ধ কুঁড়ি যেন হঠাৎ আলো হাওয়া পেয়ে খুলে

Scanned by CamScanner

গেল। সেই সময়ে শান্তিনিকেতনে কবি অনেকগুলি অসাধারণ মানুষকে জড়ো করেছিলেন, যাঁদের সান্নিধ্যে এসে হঠাৎ আমার মনটা পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হল। অথচ কর্মক্ষেত্রে অনেক অবহেলা অসম্পূর্ণতা ও দলাদলির গ্লানি ছিল। বড় বেশি কথা-লাগালাগি মন-ভাঙাভাঙি, বুক-জ্বলুনি। মোম-বাতির ঠিক তলাটিতে অনেকখানি জমানো অন্ধকার। কিন্তু চারদিকে যখন চাঁদের হাট, অন্ধকারটুকুকে ক্ষমা করা যেত।

সেবার রবীন্দ্রনাথের সত্তর বৎসর পূর্তির জয়ন্তী উৎসব হবে। তার তোড়জোড় চলছিল, আমি তারি মধ্যে গিয়ে পড়লাম। পরিবেশটাই নতুন রকমের; ভোরবেলায় ওঠা, বৈতালিক, গাছের তলায় ক্লাস। সবটার মধ্যে এমন এক বাঁধন ছাড়ার ভাবের সঙ্গে কড়া নিয়ম-পালন, দেখে প্রথমটা হকচকিয়ে গেলাম। কেবলই ঘণ্টা পড়া আর অমনি ছেলে-দের লাইন দেওয়া। সারাটা দিন ঘণ্টা দিয়ে ভাগ করা; কলঘরে যাওয়া, ঘর ঝাঁট দেওয়া, খাওয়া, বসা, উপাসনা করা, খেলাধুলো, গানবাজনা সব কিছু নিয়ম নিগড়ে বাঁধা। আবার তারি মধ্যে কোথা থেকে অগাধ ছুটির অবকাশ এসে পড়ে; ভেবেই পেতাম না। দল বেঁধে কোপাই যাওয়া, গেটের নিচে সাহিত্যবাসর, নাচগান, অভিনয়, সব কিছুর দেখতাম সময় হয়ে যাচ্ছে।

এত বাড়ি ঘর, দেয়াল, বেড়া, ফটক, অনুমতিপত্র, নিয়ম-কানুন কিছুই ছিল না। মনে হত কোথাও একটা অদৃশ্য বড় গাছ, দেশের মাটিতে শিকড় নামিয়ে বিশাল হয়ে বেড়ে উঠছে। ভাবতাম তার ডাল-পালায় কত পাখি বাসা বাঁধবে; তার ছায়ায় কত পথিক আশ্রয় পাবে; তার পাতার মর্মরে চারিদিক সঙ্গীতময় হবে। তার ফলে কত ক্ষুধা মিটবে, তার ফুলে কত রূপ ফুটবে। একটা বেড়ে ওঠা, গড়ে ওঠা, সৃজনময় ইঙ্গিতের আভাস পেতাম। ভেবে আনন্দে অধীর হতাম সেই বেড়ে ওঠা গড়ে ওঠার সঙ্গে আমিও জড়িত থাকব।

নিয়ম থাকলেও, সব নিয়মের অত কড়াক্কড়ি ছিল না। সব সময় সব ক্লাস বসত না। বুবুকে অনেক সময় গাছের মগডাল থেকে ছাত্রছাত্রীদের ফুসলিয়ে নামাতে হত। আমার ইংরিজি ক্লাসে গুরুদেবের এক সুদর্শন

Scanned by CamScanner

নিকট আত্মীয় এক দিন দুই পায়ে কাজ্জ থেকে হাঁটু অবধি পুরু ব্যান্ডেজ বেঁধে এসে বলল 'ব্যথার চোটে মরে গেলাম, ছুটি না দিলে বাঁচব না।' বললাম, 'কি হয়েছে?' 'সারা পায়ে বড় ফোড়া।' 'কবে হল?' 'রাতা-রাতি হয়েছে। নিজেই ব্যান্ডেজ বেঁধেছি, এখন হাসপাতালের ডাক্তারকে না দেখালেই নয়।'

নির্দয়ভাবে বললাম, 'ডাক্তারকে দেখাবার আগে আমাকে দেখাও।' ছাত্রর চক্ষুস্থির! 'সে বড় বীভৎস দৃশ্য, আপনি সইতে পারবেন না।' আমি পার্শ্বস্থিত আরেকটি দ্বাদশবর্ষীয়কে বললাম, 'ব্যান্ডেজ খুলতে সাহায্য কর।' দেখতে দেখতে ব্যান্ডেজের স্তূপ জমে গেল আর ফরসা নিখুঁত পা দুখানি নগ্ন সৌন্দর্যে প্রকট হল। কটমট করে তাকিয়ে বললাম, 'দাঁড়িয়ে থাক। বসতে গেলে ফোড়ায় লাগতে পারে।' ঐ ছেলেটির নাম সুনৃতকুমার, সুরেন্দ্র ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র।

আরেকদিন অবাক হয়ে দেখি আমি চৌবাচ্চার নলের অঙ্ক শেখাচ্ছি আর একটা ছেলে দিব্যি আমার দিকে পাশ ফিরিয়ে, গাছে পিঠ ঠেসে, কি একটা বই পড়ছে আর তার মাথার সমস্ত চুল খাড়া হয়ে যাচ্ছে, চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। রেগেমেগে বইটা চেয়ে বসলাম। চটি বই, কাগজের মলাট, মলাটে আঁকা একটা বিকট জানোয়ারের মুখ একটা গহ্বর থেকে বেরিয়ে রয়েছে। নিচে লেখা 'তিব্বতী গুহার ভয়ঙ্কর'। রোমাঞ্চ সিরিজ ৩১নং। লেখকের নাম মনে নেই।

বইটা নিয়ে পড়লাম। মনে হল যারা রোমাঞ্চ চায়, তাদের ভালো রোমাঞ্চ দিলেই তো ল্যাঠা চোকে। বকাবকি, বই বাজেয়াপ্ত করে কি রসের পিপাসা দূর হয়?

মাসকাবারে ওস্তাদ বলে একজন রোগা লোক থলি বগলে মাস্টার-দের এ গাছতলায় ও গাছতলায় খুঁজে খুঁজে মাইনে দিয়ে যেত। আমার মাইনে ঠিক হয়েছিল পঁচাশি টাকা, তার থেকে বোর্ডিং খরচা কুড়ি টাকা কেটে, ওস্তাদ আমার হাতে পঁয়ষট্টি টাকা দিয়ে যেত, তখন আমাকে পায় কে। নিজের রোজগারের টাকা যথেচ্ছ খরচ করার যে অনাস্বাদিত আনন্দ তা আমি পূর্ণমাত্রায় ভোগ করলাম। একে ওকে খাইয়ে, উপহার কিনে,

Scanned by CamScanner

বই কিনে, কাপড় কিনে, চটি কিনে,—তখন এক টাকা এক আনায় অপূর্ব সব চটি পাওয়া যেত—মাসকাবারে একটা পয়সাও বাকি থাকত না।

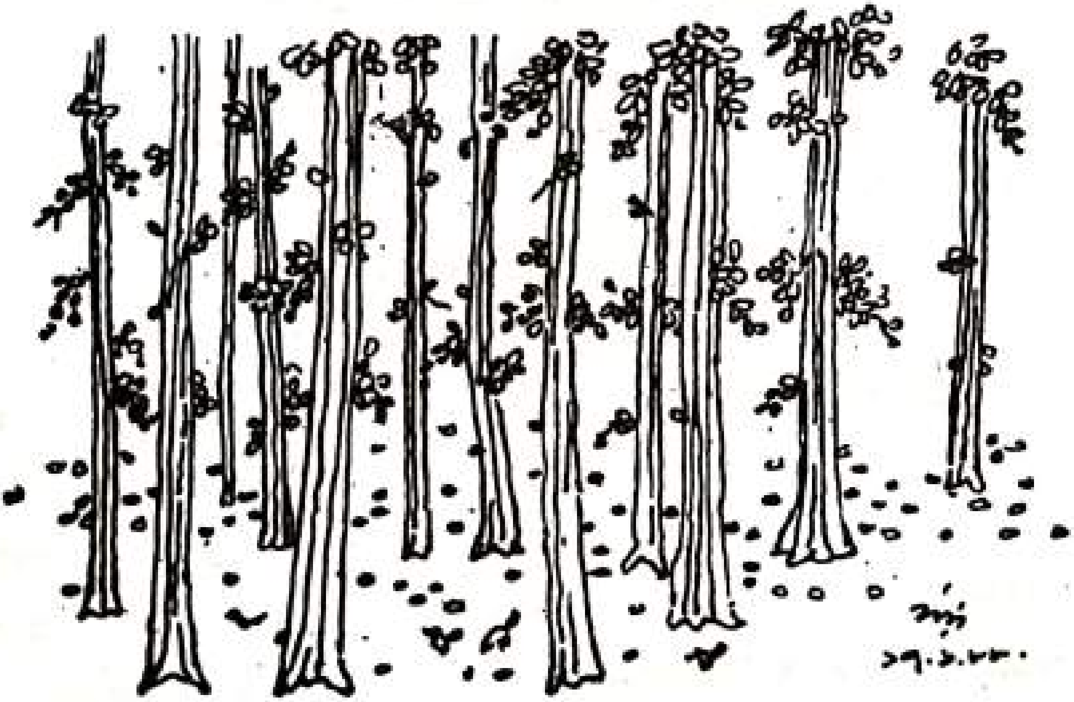

Scanned by CamScanner

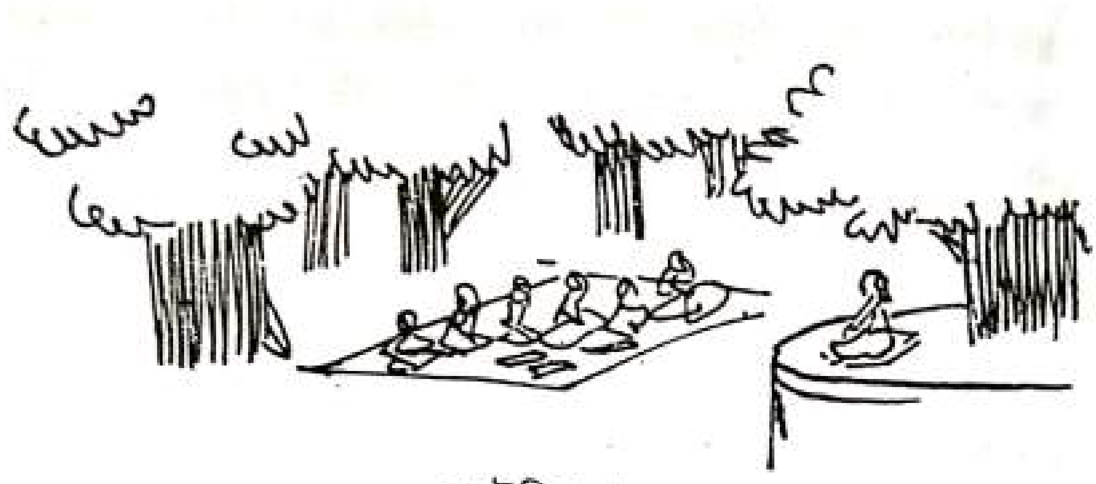

॥ উনিশ ॥

শান্তিনিকেতনের ঋণ আমি এ জীবনে শোধ করতে পারব না।

কবি শেলির প্রসঙ্গে একদা ব্রাউনিং কয়েকটি অবিস্মরণীয় কথা লিখেছিলেন, যার বাংলা অনুবাদ করলে, অনেকটা এই রকম দাঁড়ায় ঃ—

"যাত্রাপথের শত বন্ধ্যা যোজনের মাঝে,
এক বিঘৎ ভূমি যেন তারার মতো জ্বলে।
একদা সেখানে দেখেছিলাম বনফুলের পাশে,
দেহ-থেকে-খসে-পড়া এক ঈগলের পালক।
তুলে নিয়ে তাকে বুকে রেখেছিলাম ;
আর কিছু মনে নেই।"

তেমনি আমার জীবনে শত বন্ধ্যা দিবস-পক্ষের মাঝে একটি দিন উদ্ভাসিত হয়ে আছে। ১৯৩২ সালের জানুয়ারি মাস। যতদূর মনে পড়ে একটা বুধবার, শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয়ের সেদিন ছুটি। মেয়েদের বোর্ডিং-এর নাম শ্রীভবন; তারি একটা ছোট দক্ষিণের ঘরে, পূর্ণিমা আর আমি থাকি। পূর্ণিমা দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাগ্নি, আমার বাল্যবন্ধু ও সহকর্মী।

ছুটির দিনের সকালটা ধীরে গড়ায়; তারি মধ্যে দিন্‌দার ড্রাইভার শুভেন্দু একটা চিরকুট নিয়ে এল। দিন্‌দা গাড়িতে করে সিউড়ি যাবেন, বন্দুকের লাইসেন্স বদলাতে হবে। আমরা যেন দশটার মধ্যে তৈরি থাকি। তখন হয়তো বেলা আটটা হবে; শান্তিনিকেতনে সকাল সকাল ভোর হয়, আটটার মধ্যে অনেকগুলি ঘণ্টা পড়ে গেছে। কিন্তু দুপুরের

Scanned by CamScanner

খাওয়া কি হবে?

আমার বন্ধু পূর্ণিমা, সে জন্মগৃহিণী। পাঁচ মিনিটের মধ্যে রান্নাঘরে গিয়ে সব ব্যবস্থা করে ফেলল। সেখানকার কর্ত্রীদের মধ্যে যাঁর সঙ্গে আমাদের সব চাইতে বেশি ভাব, তাঁর নাম হিরণদি। তিনি বললেন, পৌনে দশটার মধ্যে লুচি, আলুর দম, ইলিশ মাছ ভাজা আর সন্দেশ প্রস্তুত থাকবে। আমরা যেন তুলে নিই।

কে না জানে যে বাধা না পড়লে কোনো শুভ কাজই ভালোভাবে সম্পন্ন হয় না! সেদিনও তাঁর ব্যতিক্রম হল না। দিন্‌দার সঙ্গে কমল-বৌঠানের ছোটোখাটো কোনো বিষয় নিয়ে খিটিমিটি লাগাতে, বৌঠান গোটা পাঁচেক পুরনো ছেঁড়া মশারি নিয়ে জোড়াতালি দিতে বসলেন। সে এমন একটা কাজ যা সাত দিন উদয়াস্ত ফোঁড় তুললেও শেষ হতে পারে না। স্নানও করলেন না, কথাও বললেন না। ওরি মধ্যে আমরা গিয়ে একবার বৃথাই সেধে এলাম। মুখও তুললেন না।

শেষ পর্যন্ত সাড়ে দশটার সময় টিফিনক্যারিয়ার বোঝাই করে সামগ্রী নিয়ে, দিন্‌দার সঙ্গে বুবু, কমল-বৌঠানের জায়গায় অনেক-কষ্টে-রাজি-করানো হিরণদি আর আমি রওনা হলাম।

এখন যে সুরক্ষিত সুন্দর পথ দিয়ে লোকে শান্তিনিকেতন থেকে সিউড়ি যায়, তখন সে পথ ছিল না। উত্তরায়ণের সামনে দিয়ে লাল মাটির পথ ধরে, গোয়ালপাড়া হয়ে কোপাই নদীর উপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে উত্তরমুখো যেতে হত। আমরাও সেই পথেই গিয়েছিলাম। মাঘ মাস, কোপাই নদীতে সামান্য জল; বালি আর নুড়ির উপর দিয়ে স্বচ্ছন্দে গাড়ি চলে গেল। ওপারে ধু ধু করছিল বাউলদের দেশ। লাল শুকনো রুক্ষ মাটি মাঝে মাঝে খসে ধ্বসে গেছে, বেঁটে বেঁটে তাল আর খেজুর গাছ, মনসা আর শ্যাওড়া গাছ। মাঝে মাঝে কেয়ার ঝোপ। দিন্‌দা বললেন— 'ওখানে বড় সাপ। শান্তিনিকেতন থেকে বেরুবার মুখে কেয়া-বন দেখেছিলি?'

ফস্ করে শুভেন্দু বলল, 'এখানকার সাধারণ লোকেরা বলে এদেশে মহর্ষিদেবের পায়ের ধুলো পড়েছিল বলে এখানে সাপে কামড়ালেও কিছু

Scanned by CamScanner

হয় না।'

মাঝে মাঝে বড় বড় বট-অশ্বত্থ গাছ। ধানক্ষেত। হঠাৎ কেমন অচেনা জায়গায় এসে পড়লাম। একটা গাঁ। তার চারদিকে দেড়মানুষ উঁচু, তিন হাত পুরু মাটির দেয়াল তোলা; মাঝখান দিয়ে পথ গেছে, তার দু'মাথায় দুটি দরজা, তার পাল্লা নেই। যেই আমাদের গাড়ি একটা দরজা দিয়ে গাঁয়ের মধ্যে ঢুকল, গা ছম্‌ছম্‌ করে উঠল। গাঁয়ে জনমানুষ নেই, দরজা-জানালায় পাল্লা নেই। হু হু করে একটা শীতের বাতাস আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ঢুকল, এ-ঘর ও-ঘর করে ঘুরে একটা গোঙানির মতো শব্দ তুলল। গাঁয়ের শেষে আবার একটা ভাঙা দরজা দিয়ে বেরিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

দিন্‌দা বললেন, 'বিশ্রী লাগল তো? ওরা পাঁচিল তুলেছিল ঠ্যাঙাড়ের ভয়ে। চারদিকের খোলা মাঠ ছেড়ে এইখানে গাদাগাদি করে থাকত। রাতে দু'মাথার দরজা দুটি বন্ধ করে, জোয়ানরা লাটি সোঁটা নিয়ে পালা করে পাহারা দিত। ঠ্যাঙাড়েদের হাত থেকে বাঁচলেও, শেষ পর্যন্ত ম্যালেরিয়া সবাইকে সাবাড় করল। এদিকে এমনি অনেক গ্রাম দেখতে পাবি।'

মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তখনো ওসব অঞ্চলে ম্যালেরিয়ার প্রবল প্রকোপ। আর কখনো ওদিকে যাই নি; পাঁচিল ঘেরা মাটির ঘরগুলো এখনো দাঁড়িয়ে আছে, না মাটির সঙ্গে মিশে গেছে জানি না।

কারো মুখে কথা নেই। চারদিকে বীরভূমের শীতের দিনটি ঝিমঝিম করছে। আকাশের রঙ নীল, এতটুকু মেঘ নেই। ঠাণ্ডা নির্মল শুকনো বাতাস। ঢেউ খেলানো ভাঙা লাল মাটি। হিরণদি বললেন, 'দ্যাখ, দ্যাখ, দ্যাখ।' চেয়ে দেখি শুকনো একটা নদীর শীর্ণ জলের রেখা, অনেকখানি হলদে বালি, তারি পাশে উঁচুনিচু পাথুরে জায়গায় মেলা বসেছে। উঁচু পাড়ির ওপর দিয়ে একজনের পিছনে একজন একসারি বাউল চলেছে মেলার দিকে। গান হবে। এখন থেকেই লোক জড়ো হচ্ছে, যেন প্রাণের স্রোতে বান ডেকেছে।

দিন্‌দা বললেন, সারা পৌষ মাস বীরভূমের নানান জায়গায় মেলা

Scanned by CamScanner

হয় : কোথাও তিনদিন, কোথাও বা সাতদিন। পালা করে হয়, অনেক ব্যবসায়ী সারা শীতকাল মেলায় মেলায় ঘোরে। গাড়ি থেকে দেখতে পেলাম লাল গোল মাটির হাঁড়ি, ডবল বুনুনির বেতের ঝুড়ি, কাঠের মালা, পাথরের বাসন। এরাই হয়তো পৌষের গোড়ায় শান্তিনিকেতনে এসেছিল। মন কেমন করতে লাগল।

দিন্‌দা গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়লেন। আমরাও নামলাম; চুল বাঁধার দড়ি, পুঁতির মালা কিনলাম। হিরণদি সিউড়ির মিশ্র মোরব্বা কিনলেন। মরা গাঁয়ের সমস্ত বিষাদটুকু মন থেকে মুছে গেল।

যখন সিউড়ি পৌঁছলাম, বেলা হয়ে গেছে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আপিসে নেই। দিন্‌দা পিছপাও হবার ছেলে নন্‌, চললেন তাঁর বাড়িতে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব মানে স্বর্গীয় গুরুসদয় দত্ত। দিন্‌দাকে পেয়ে যেন হাতে চাঁদ পেলেন। কিছুতেই ছাড়তে চান না। পনেরো মিনিটে আপিসে লোক পাঠিয়ে লাইসেন্সের কাজটুকু সেরে দিলেন। বসা হল না, দিন্‌দা বেলায় বেলায় শান্তিনিকেতনে ফিরতে চান। গুরুসদয় দত্তকে সেবার চিনবার সুযোগ হয় নি; তাঁর সম্বন্ধে বেশি কিছু না জানাতে তেমন আগ্রহও বোধ করি নি। এমন কি, সব চেয়ে যেটা আমার চিত্তকে আকৃষ্ট করেছিল, সেটি হল তাঁর চাপরাশির হাতে ধরা চামড়ার একটা বিচিত্র খাপে সাজানো কম করে দশটি নানা রঙের ঝরনা কলম। কারো যে একসঙ্গে এত কলম থাকতে পারে এ আমি ভাবতেও পারতাম না। আরো পরে কেঁদুলির মেলায় যখন দেখেছিলাম গুরুসদয় দত্ত ঘুরে ঘুরে বাউলদের কাছ থেকে পুরনো গানের পদ সংগ্রহ করছেন, তখন তাঁর অন্য পরিচয় পেয়েছিলাম।

ফিরবার পথে দিন্‌দা নিচু গলায় 'বিশ্ববীণা রবে বিশ্বজন মোহিছে'—এই গানটি গাইছিলেন। মনে আছে গলা যখন খাদে নামছিল, আমারো বুকের মধ্যে গুরু-গুরু করে উঠছিল। দিন্‌দা লোকের মনে সুর নামাতে জানতেন।

পুরোনো একটা মজা পুকুরের ধারে বসে লুচি, আলুর দম, ইলিশ-মাছ ভাজা আর সন্দেশ খেয়েছিলাম। সঙ্গে কুঁজোর জল ছিল, কি

Scanned by CamScanner

ভাগ্যিস ভাঙে নি! তারপর পুকুরের বিবর্ণ ঘাসে ঢাকা পাড়ি বেয়ে নিচে নেমে হাত মুখ ধুয়েছিলাম। সামান্য জলে, কাদার মধ্যে মনে হল কোনো রকমের মাছ কিলবিল করছিল।

তারপর ফিরে এলাম। সূর্য হেলে পড়তে লাগল, গাছের ছায়া লম্বা হল। দিন্‌দা নীরব হলেন। মনটা কেমন ভরে গিয়েছিল। গোয়ালপাড়ার পথ দিয়ে শান্তিনিকেতন পৌঁছতে তখন দিন্‌দার বাড়িটিই আগে চোখে পড়ত। ওদিকে এত বাড়িঘর গাছপালা ছিল না। দূর থেকে 'সুরপুরী'র লাল টালির ঢালু ছাদ আর আমবাগান দেখা যেত।

দিন্‌দা হঠাৎ বললেন, 'তোদের চায়ের সময় উতরে গেছে, একটু থেকে যাস্।'

একটু ভাবনা যে হচ্ছিল না, তাও নয়। অতগুলো ছেঁড়া মশারি—! কিন্তু গাড়ি থামতেই লালপাড় কাপড় পরে, হাসিমুখে কমল-বৌঠান বেরিয়ে এসে বললেন, 'সাব্, ভাল জলখাবার করেছি!'

জীবনের বহু ব্যর্থ বিফল বন্ধ্যা দিবস-মাসের মধ্যে অমনি একেকটি দিন তারার মতো জ্বলজ্বল করে।

Scanned by CamScanner

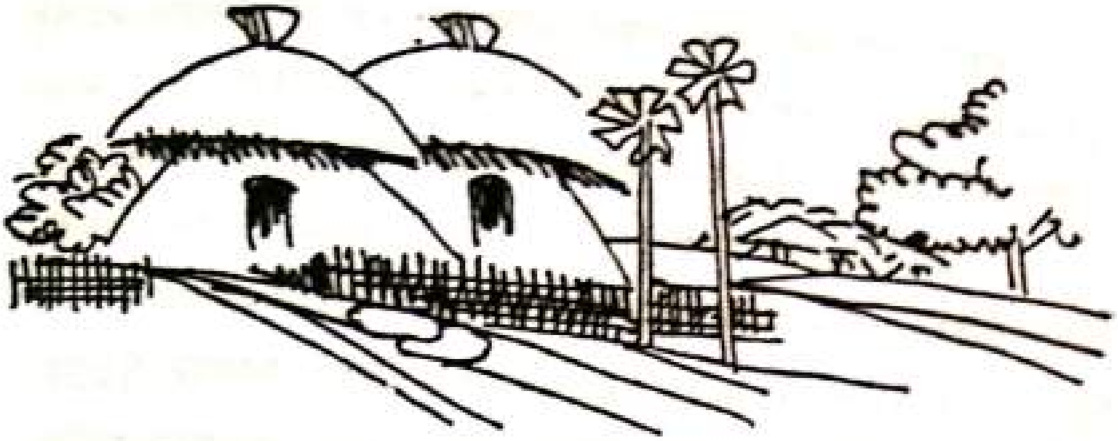

॥ কুড়ি ॥

সবাই বলত ওস্তাদের ভারি দেমাক; কারণ ও নাকি ভুবনডাঙার বিখ্যাত ঠ্যাঙাড়েদের বংশধর। ওদের গ্রাম সম্পর্কের আত্মীয়স্বজনরা নাকি সে-কালে বাঁশের রণ-পা চড়ে রাতারাতি পঞ্চাশ মাইল দূরে ডাকাতি করে ভোরের আগে বাড়ি ফিরে, পুকুরের জলে রণ-পা ডুবিয়ে রেখে, হাত-পা ধুয়ে, ভালো মানুষের মতো ঘুমিয়ে থাকত, কাকপক্ষীও টের পেত না। পেয়াদা পুলিস নিজের চোখে দেখে যেত, সূর্য ওঠার আগে হানা দিলেও এদের যে যার বাড়িতে পাওয়া যায়। কথাটার সত্যি মিথ্যা জানি না।

এবার ছুটির দিনের রেলের লাইনের ওপারে ওদের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। গ্রামের নাম পারুলডাঙা। আমাদের নিয়ে কি করবে ওরা ভেবে পায় না। বাড়ির ছেলেবুড়ো মেয়েপুরুষ সবাই আহ্লাদে আট-খানা। কোথায় বসাবে, কি খাওয়াবে! বললে—'দিদি তোমরা রাত অবধি থেকে যাও, পুকুরে জাল ফেলি, পাঁঠা কাটাই, তোমাদের না খাইয়ে ছাড়ি কি করে।' অনেক কষ্টে বুঝিয়ে বললাম স্কুলের ছেলেমেয়ে নিয়ে এসেছি, উপাসনার ঘণ্টা পড়ার আগেই আশ্রমে ফেরা চাই।

ওস্তাদ সেখানকার হালচাল জানে, অবস্থাটা সে বুঝল। তবু বার বার বলতে লাগল একদিন ছুটির বারে সকালে যেতে হবে, দুপুরে খেতে হবে। শেষ পর্যন্ত সোনার মতো চকচকে মাজা কাঁসার গেলাসে ঠাণ্ডা মিষ্টি ইঁদারার জল আর তাজগুড়ের সঙ্গে কাঁচা ছোলার শুঁটি দিয়ে জল-যোগ করে, অন্ধকার নামবার আগেই আমরা পা চালিয়ে আশ্রমের পথ ধরলাম।

Scanned by CamScanner

লোমহর্ষণ সব গল্প বলত ওস্তাদ। নাকি ছাতিমতলায় যেখানে মহর্ষির উপাসনার বেদী,—তখনো জায়গাটা এখানকার সংস্কৃতরূপ ধরে নি—সেইখানেই নাকি ডাকাতদের শলা-পরামর্শ হত। তার পক্ষে ভারি সুবিধার স্থান ছিল ওটা। কোথাও কিছু নেই, খোলা মাঠে তিনটি ছাতিম গাছের আশ্রয়, বেঁটে খেজুর আর মনসার ঝোপ আর লাল পাঁজর বের করা ভাঙা মাটি। এখনো নাকি ওখানে বিশেষ বিশেষ জায়গায় খুঁড়লে, বিশ-পঁচিশটা মরা মানুষের খুলি বেরুনো কিছু আশ্চর্য নয়। শুনে আমরা শিউরে উঠতাম। রাতে বুবু জানলা খুলে রাখা সম্বন্ধে ইতস্তত করত।

কিন্তু এসব গল্পের সঙ্গে আমাদের শান্ত স্নিগ্ধ রূপটির এতই তফাৎ যে গল্পগুলোকে সত্যি বলে মেনে নেওয়া শক্ত ছিল। গত ছত্রিশ বছরের মধ্যে আশ্রমের চেহারা ও ভাব বদলিয়ে গিয়েছে। ১৯৩১ সালের রূপটি মনে করতে চেষ্টা করি। তখনো বেশির ভাগ মাটির ঘরেই ছেলেরাও থাকত, মাস্টার মশাইরাও থাকতেন। গুরুপল্লীর তকতকে মাটির ঘরের সারির সে কি শোভা! লাইব্রেরি, রান্নাঘর, শ্রীভবন, কলাভবনের ছিল পাকা বাড়ি। কলাভবনের ছাত্ররা অনেকেই থাকত দেহলীর কাছে দ্বারী কি দ্বারিক কি ঐ ধরনের কি যেন নামধারী পুরনো বাড়িটিতে। সে বাড়ি অনেক দিন হল প্রথমে ধ্বংসস্তূপে পরিণত ও পরে অদৃশ্য হয়েছে।

ওখানে নিশিকান্ত বলে একজন আশ্চর্য ছাত্রের সঙ্গে আলাপ হল। বয়সে আমার চাইতে কিছু ছোট হবে, দেহে রূপের বালাই নেই, মোটা বড় বড় দাঁত। আলুথালু বেশ, মাথার চুলে সময়মতো ছাঁট পড়ে না, সর্বদা খাই-খাই করে বেড়ায়। কিন্তু এসবের আড়াল থেকে আশ্চর্য এক সৃজনশীল কবি ও শিল্পী থেকে থেকেই দেখা যায়। তাছাড়া সে ছিল রসের ঝুড়ি। প্রথম দিনেই বুবুকে আমাকে সুরুলের পথে দেখে বলল—'কোথায় যাচ্ছ?' বললাম সুরুলে যাব হেঁটে, আবার ফিরব। বলল, 'টর্চ নিয়েছ?' টর্চ কেন? বেশি রাত হবার আগেই ফিরব, বাঁধানো সড়ক দিয়ে। শ্রীভবনের মেজেন্‌রা সড়ককে বলত 'সোরান' অর্থাৎ সরণি; ভারি মিষ্টি ওখানকার লোকের কথা, আর শুধু মিষ্টি নয়, অনেক সাধু-ভাষার চল ওদের মুখে মুখে। বীরভূমের সাধারণ লোকেদের কথা ভাষার

Scanned by CamScanner

মধ্যে একটা মার্জিত ভাব, একটা নিজস্ব বলিষ্ঠতা আছে। প্রথম যখন শুনেছিলাম বড় ভালো লেগেছিল।

সে যাই হোক, নিশিকান্ত বলল, 'যেও না, এঁড়েল-বাঁকে ধরবে।' আমরা তো অবাক্! এঁড়েল-বাঁক আবার কি? নিশিকান্ত জিব কেটে বলল, 'রাতে যাদের নাম করতে নেই!' বলেই সরে পড়ল। কিছুদিন বাদে দেখি এক শিশি টোমাটো সস্ তৈরি করে এনেছে আমাদের জন্য। লম্বা একটা শিশি, তার গায়ে এলোপ্যাথিক ওষুধের ডোজের মতো করে কাগজ কেটে সাঁটা হয়েছে। তিনটি মাত্র ডোজ, তাও একেবারে অসমান। গলার কাছে আধ ইঞ্চি লম্বা সরু করে কাটা এক ডোজ, তাতে আমার নাম লেখা ; আর শিশির নয়-দশমাংশ জুড়ে সরু লম্বা একটা ডোজ, তাতে আমাদের আরেক বান্ধবীর নাম লেখা। যার যেমন চেহারা তার সঙ্গে ডোজ মেলানো!

চমৎকার রাঁধতে পারত নিশিকান্ত আর অপূর্ব কবিতা লিখত, অভাবনীয় ছবি আঁকত। এই সময়ে আঠারো বছর পরে তাকে দেখে-ছিলাম পণ্ডিচেরির আশ্রমে। অনেক রোগা হয়ে গেছে, কিন্তু তেমনি অপূর্ব কবিতা লিখছে, আশ্চর্য ছবি আঁকছে। দেখলাম সোনা হেন মুখ করে এক তরকারি ভাত খাচ্ছে আর দেখলাম তেমনি স্নেহভরা ব্যবহার। তবে তার জীবনযাত্রা অন্য রকমের হয়ে গেছে। যতদূর জানি এখনো সে সেখানেই আছে।

সুরুলে যেতাম আমরা তিন-চারজন লোকের বাড়িতে। তাঁদের মধ্যে সবার আগে ডাঃ হ্যারি টিম্বার্সের নাম করতে হয়। সপরিবারে একতলা এক বাড়িতে থাকতেন, 'কোয়েকার' সম্প্রদায়ের লোক তাঁরা, যতদূর মনে পড়ে সোসাইটি অফ্ ফ্রেন্ড্স্ কি ঐ ধরনের কোনো প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে এসে আমাদের দেশের দুঃখ দূর করার কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, টাইফাস্ ইত্যাদি রোগের বিশেষজ্ঞ। কয়েক বছর বাদে অতি অকালে রাশিয়ার কোনো প্রদেশে টাইফাস্ রোগেই মারা যান।

Scanned by CamScanner

দুটি মেয়ে ছিল ওঁদের, বাড়ির ফটকের কাছে আমরা পৌঁছতেই ছুটে বেরিয়ে এসে আমাদের টেনে তারা ঘরে নিয়ে যেত। স্বামী-স্ত্রী যেন মাণিকজোড়, বেশি বয়স ছিল না, আমাদের চাইতে হয়তো পাঁচ সাত বছরের বড়। তাঁদের অনাবিল স্নেহ, অকুণ্ঠ আতিথেয়তার কথা ভুলবার নয়। সে সময়ে ওসব অঞ্চলে দারুণ ম্যালেরিয়ার প্রকোপ ছিল। গ্রামকে গ্রাম উজাড় হয়ে যেত ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়াতে। মশার রাজত্ব ছিল শান্তিনিকেতনের আশেপাশের গ্রামগুলিতে। মশা দূর করে ম্যালেরিয়ার কবল থেকে সমস্ত এলাকাটাকে মুক্ত করার কাজে যাঁরা প্রথম ব্রতী হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের পল্লী-সংগঠন বিভাগের আদি কর্মীরা তাঁদের অন্যতম নেতা। এখন ওখানে স্বাস্থ্য উথলে পড়ে। মানুষ ওখানে চেঞ্জে যায়। ওঁদের অনেকেরি নাম লোকে ভুলে গেছে।

আর ছিলেন ডাক্তার আলি, লম্বা ফরসা সুদর্শন মানুষটির অমায়িক ব্যবহারে কে না মুগ্ধ হত! ব্যাচেলার মানুষ, পুরনো বাড়ির তিনতলায় তাঁর বাস ছিল, উৎকৃষ্ট একজন পাচক ছিল। মাঝে মাঝে রাতে নেমন্তন্ন করতেন, অন্যান্য অধ্যাপকদের সঙ্গে আমরাও থাকতাম। ফিরতে একটু রাত হত, যানবাহন জুটত না—এক যদি দিন্‌দা গাড়ি নিয়ে যেতেন—নইলে হেঁটে শ্রীভবনে পৌঁছবার আগেই দশটা বেজে যেত, আশ্রমের বিজলি বাতি নিবে যেত। বোর্ডিং সুপারিন্টেন্ডেন্ট বেজায় চটে যেতেন। ছাত্রী হলে নিশ্চয় সাজা দিতেন, কিন্তু অধ্যাপিকাদের আর মুখের উপর কি বলবেন? বলতে ভুলে যাচ্ছি ডাঃ আলি বলতেন, উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক নাকি ঐ বাড়িতে রাত কাটিয়েছেন; নাকি ভূত আছে। মাঝে মাঝে ধীরাদার বাড়িতে গিয়েও খেয়ে আসতাম। জাপানী উদ্ভিদতত্ত্বে বিশেষজ্ঞ কাশহারার মেয়েকে উনি বিবাহ করেছেন। কাশহারা নাকি বড় বড় গাছ, এক জায়গা থেকে তুলে অন্য জায়গায় লাগাতেন। ধীরাদা অর্থাৎ ধীরানন্দ রায়, যিনি পরে পল্লী সংগঠন বিভাগের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। গৌরদার বাড়িও যেতাম, গৌর ঘোষের নাম তখন সবাই জানত, বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন। শিল্পী মুকুল দে'র বোনের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। সেই বিয়ের নেমন্তন্নে গিয়েছিলাম শান্তিনিকেতনে যাবার

Scanned by CamScanner

অল্পদিন পরেই। মনে আছে, বরের বাড়িতে মহিলা কেউ নেই বলে শান্তিনিকেতনের গিন্নিদের মহা ভাবনা, তাহলে বৌ বরণ করে কে ঘরে তুলবে? ওরা তো কাউকে বলে নি!

বরের বাড়ি গিয়ে দেখলাম, রোগা ঢ্যাঙা কে এক গিন্নি, লালপাড় কাপড় পরে একগলা ঘোমটা টেনে, দিব্যি সুন্দর বৌ বরণ করে ঘরে তুললেন। আরো শুনলাম তাঁর নাম আলুদাদা, গৌরবাবুদের বন্ধু বিশেষ। এই অনাবিল সরল জীবনটি বেশ লাগত, যদি না বড় বেশি লাগালাগি কান-ভাঙাভাঙি থাকত। কিন্তু সেসব হল যাদের ছোট মন তাদের কথা।

সত্যিকারের চাঁদের হাট ছিল তখন ওখানে। যাঁদের সান্নিধ্যে আসতে পারার সৌভাগ্য লাভ করে আমি ধন্য হয়ে গেছি, এখন তাঁদের বেশির ভাগই স্বর্গে গেছেন। ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী, বিধুশেখর শাস্ত্রী, নন্দলাল বসু, নেপালচন্দ্র রায়, কালীমোহন ঘোষ, তেজেশচন্দ্র সেন, আর্যনায়কম —আমরা তাঁকে ডাকতাম আরিয়েমদা...চারুচন্দ্র দত্ত, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তনয়েন্দ্রনাথ ঘোষ। এঁরা সবাই চলে গেছেন। যাঁরা এখনো আছেন তাঁদের মধ্যে শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুরেন কর, শ্রী অমিয় চক্রবর্তী ইত্যাদি জনাকয়েক নাম মনে পড়ছে। তাছাড়া বিদেশীদের কয়েকজনকে দেখেছিলাম, পণ্ডিত গায়ক বাকে সাহেব ও তাঁর স্ত্রী, রেভারেন্ড টাকার সাহেব ছিলেন, বিশ্ববিখ্যাত মানবপ্রেমিক আন্ড্রুজ সাহেবও আসা-যাওয়া করতেন। বাকে আর অ্যান্ড্রুজ নেই, টাকারের খবর কেউ জানে না।

দিন্‌দাকে ছোটবেলায় একবার আমাদের পাহাড়দেশে দেখেছিলাম, তারপর দার্জিলিঙেও দেখেছিলাম। সে আরেক রূপ, ছুটির রূপ; এখানে তাঁকে তাঁর নিজের আস্তানায় দেখলাম। বাড়ির নাম সুরপুরী, এখন দেখে মনে হয় পাড়ার মধ্যে; তখন দেখে মনে হয়েছিল বনবাদাড়ের মাঝখানে। আশেপাশে বিশেষ বাড়িঘর ছিল না, নিজেদের আমবাগান, বেল-জুঁই-মাধবীলতা, পেয়ারা গাছ, আর চারদিকে খোলা ডাঙা জমি, শ্যাওড়াগাছ, বুনো খেজুর, মনসা গাছ, বেঁটে তালগাছ। কিছু দূরে শ্মশান, সেখান থেকে গভীর রাতে ট্যাঁ-ট্যাঁ শব্দ শোনা যেত। দিন্‌দা হেসে

Scanned by CamScanner

বলতেন, শকুনের ছানার ডাক, কমল-বৌঠানের অন্যরকম ধারণা। প্রথম দিন বিকেলেই কবির সঙ্গে ওঁদের বাড়ি গেলাম। বাইরে একটা সজনে গাছের নিচে তক্তপোশ ফেলা, সেইখানে আমরা বসলাম। গুরুদেবের জন্য বেতের চেয়ার এল। সুগন্ধি দার্জিলিং চা খেলাম, কমল-বৌঠান বাগান থেকে দুটি বড় বড় ডবল বেলফুল তুলে আমার খোঁপায় গুঁজে দিলেন। মনে হয় সেদিনের কথা।

তারপর বুবুর সঙ্গে অনেকবার গেছি ওঁদের বাড়ি, বুবুর নিজের মামা, ওকে যতবার খেতে বলেন, আমি একটা প্রায় অচেনা বাইরের মেয়ে, আমাকেও ততবার বলেন। একবার বুধবারের ছুটিতে বুবু আর আমি নিরামিষ রাঁধলাম তেজেশবাবুর বাড়িতে। সে বাড়ি এখনো আছে, তার নাম তালধ্বজ, মাঝখানে ছাদ ফুঁড়ে একটা তালগাছ উঠেছে, তাকে ঘিরে বাড়িটি। সেখানে সকাল থেকে দুটি স্টোভে বুবু আর আমি কুচো শুকতো, চাপর ঘণ্ট, ডাল ছড়ানো, আলুর পায়েস ইত্যাদি রেঁধে দিন্‌দার গাড়িতে চাপিয়ে সুরপুরী গেলাম। জনা পনেরো-ষোল লোক খাবে। আমাদের দেখেই দিন্‌দা বললেন, 'তেজু তোদের জন্য একটা আশ্চর্য জিনিস রাঁধছে, রান্নাঘরে গিয়ে দেখে আয়।'

রান্নাঘরের কাছ গিয়ে দুর্গন্ধে টিকতে পারি না। মাগো, তেজুবাবু শুঁটকি রাঁধছেন। যদ্দুর মনে পড়ে উনি শ্রীহট্টের ছেলে। আমাদের প্রতিক্রিয়া দেখে দিন্‌দা চটে কাঁই! ভালো জিনিস ভালো লাগবে কেন? রাঁধলে মোটেই গন্ধ থাকে না! ইত্যাদি কত কি বললেন। খেতে বসে আমরা শুঁটকি মাছ ভাত চাপা দিয়ে লুকোই, আর দিন্‌দা নিজে পায়েস খাবার পরেও আরেক গ্রাস শুঁটকি খেয়ে মুখশুদ্ধি করলেন।

ছোট ছোট কত ঘটনা মনে আসে। যখন সময় পেতাম লাইব্রেরি থেকে বই নিয়ে পড়তাম। প্রভাতদা ছিলেন লাইব্রেরিয়ান; সে একটা কম বয়সের প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, তখনো তাঁর রবীন্দ্রজীবনী-রচয়িতা বলে খ্যাতি হয় নি, পুরস্কার পান নি। লম্বা ফরসা চেহারা, কুচ-কুচে কালো চুলদাড়ি, সারাদিন বই ঘাঁটেন, কি যেন লেখেন, সেই লেখা নিয়ে প্রায় রোজ একবার করে গুরুদেবের কাছে ছুটে যান। শুনলাম

Scanned by CamScanner

জীবনী লেখা হচ্ছে, ভুলচুক যদি কিছু থেকে যায়, তাই গুরুদেবকে দেখিয়ে নেওয়া। কম কষ্ট করা হয় নি ঐ জীবনীর পিছনে। সে সময় কাজটার গুরুত্ব কম লোকেই বুঝতে পেরেছিল। অনেকেই সমস্ত ব্যাপার-টাকে পরিহাসের বিষয় বলে মনে করত। বছরের পর বছর অনলসভাবে খেটে যে গ্রন্থ রচিত হল, সে যে ভবিষ্যতের বিদ্যান্বেষীদের একটা মণি-কোঠার মতো হবে, সে আর আশ্চর্য কি! একেবারে সব তথ্যই যে নির্ভুল এ কথা হয়তো সত্যি নয়, কিন্তু জীবনব্যাপী সাধনার ফলের মূল্য নির্ণয় করা যায় না।

পণ্ডিত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কেও দেখেছিলাম ওখানে, তখনো তাঁর আদর্শ অভিধান নিয়ে কাজ করছেন। দুঃখের বিষয় তখন তাঁর কর্মনিষ্ঠার আদর দেখাই নি, তাঁর মূল্যের কথা ভেবেই দেখি নি।

নগেন আইচ বলে আরেকজন ছিলেন; অতি শান্ত অতি নম্র, নিজেকে সর্বদা আড়াল করে রাখতেন, গলার স্বর বড় একটা শোনা যেত না।

মনে আছে বছরের গোড়ার দিকে গান্ধী দিবস পালন করা হত। সেদিন আশ্রমে সব চাকরদের ছুটি, তারা নিমন্ত্রিত অতিথি হয়ে রান্নাঘরে এসে দুপুরে খিচুড়ি, কপির ডালনা, আলুর দম খেয়ে যেত। কাজ করত ছাত্রছাত্রীরা, মাস্টার মশাইরা ও দিদিমণিরা। কাজ কিছু কম ছিল না।

মেয়েরা রান্নাঘর ধোয়া-পাকলা, বাসন মাজা, দুপুরের রান্নার ভার নিত। ছেলেরা কুয়ো থেকে জল তুলত, ঘর-দোর, বাগান-মাঠ সব পরিষ্কার করত। সকালের জলখাবারের জন্য হালুয়াও রাঁধত। সে বছর দেখলাম, অতিরিক্ত উৎসাহের জন্যই হোক কি যে কারণেই হোক, খিচুড়ি রান্নার ঘিটুকুও হালুয়াতে খরচ করে ফেলল। মেয়েদের তাই দেখে চক্ষু--স্থির! এখন কি দিয়ে কি হবে?

তারপর কুরুক্ষেত্র। এদিকে হালুয়াতে কিছুতেই ঘি আটকানো যাচ্ছে না। চারদিক দিয়ে ঘিয়ের নদী গড়িয়ে যাচ্ছে। বাটি করে সেই ঘি সংগ্রহ করে রান্নার কাজে পুনরায় লাগানো হল।

সেদিন ছোট ছেলেমেয়েদের লাইন বাঁধিয়ে বড় কুয়োতে স্নান করাতে

Scanned by CamScanner

নিয়ে এলেন নগেন আইচ। সকলে তাঁর অনভ্যস্ত হাতের আপ্রাণ চেষ্টা দেখে হেসেছিল। পরে গুরুদেবের কাছে শুনেছিলাম অনেকদিন আগের একটা ঘটনা। তখন আশ্রমের পয়সাকড়ি নেই, বড়ই একটা সঙ্কটের সময় যাচ্ছে, কবির ভাবনার শেষ নেই, রাতে ঘুম নেই। এমন সময় আস্তে আস্তে একদিন নগেন আইচ এসে তাঁর সারা জীবনের সংগ্রহ যথাসর্বস্ব দান করে গেলেন। শুনে আমরা কি যে লজ্জা পেলাম তা বলবার নয়। সত্যিকার মহত্ত্ব ঘণ্টা বাজিয়ে কানে আসে না।

গুরুদেব কখনো কড়া, কখনো কোমল ; তাঁর দয়ার কোনো লেখা-জোখা ছিল না। হঠাৎ লাউ-কিম-কি নামী একজন অজ্ঞাতকুলশীলা চৈনিক মহিলা এসে তাঁর পা জড়িয়ে ধরল, তাকে আশ্রয় দিতেই হবে। গুরুদেবের দয়া হল, তাকে আশ্রমের হাসপাতালে ছোট ছেলেমেয়েদের দেখাশুনোর ভার আর শ্রীভবনে বাস করার অধিকার দিলেন।

শ্রীভবনে যে সকলের অপ্রিয় হয়ে উঠল; হাসপাতালে ছেলেমেয়েরা তার অচেনা চেহারা ও অদ্ভুত বেশবাস দেখে ভয়েই আধমরা। মেয়েরা এসে আমাদের কাছে নালিশ করত, কিমকি-দিদি মাস্টার-চাবি দিয়ে নাকি ওদের বাক্স-প্যাঁটরা খুলে সার্চ করে। কি সার্চ করে? না, স্বাধীনতা সংগ্রামের যুগ সেটা, ও নিশ্চয় স্পাই, ইংরেজ সরকারের জন্য তথ্য সংগ্রহ করে বেড়াচ্ছে। কেউ দেখেছে? না। তবে না দেখলেও সন্দেহের যথেষ্ট কারণ আছে। গুরুদেবের কানেও কথাটা গেল। তিনি কি যে করবেন ভেবে পান না; আশ্রিতাকে ত্যাগ করা তাঁর বিবেকে বাধে, অথচ—। কিমকি-দিদিই হঠাৎ দুদিনের ছুটি নিয়ে নিজের কালো টিনের ট্রাঙ্কটি অনঙ্গাবাবুর মোটরে চাপিয়ে চিরদিনের মতো হাওয়া হয়ে গিয়ে সমস্যার সমাধান করে দিল। তখন কথাটা বিশ্বাস না করলেও, এখন মনে হয় সত্যিই বোধহয় স্পাই ছিল, তবে কিছু সুবিধা করতে পারে নি। অন্য সময় হলে কি হত জানি না, রবীন্দ্র-জয়ন্তীর বছর সেটা, সকলের মন অন্যদিকে।

সুখে-দুঃখে জীবন কাটত; হয়তো কোনো অন্যায় সমালোচনা শুনে রেগেমেগে কবির কাছে গিয়ে নালিশ করলাম; চুপ করে সবটা শুনে জিজ্ঞাসা করলেন, 'গায়ে ফোস্কা পড়েছে নাকি?' অমনি সব রাগ জল

Scanned by CamScanner

হয়ে যেত। নিজে কত সমালোচনা শুনেছেন সে কথা বলতেন। বলতেন যারা কাজ করতে চায় তাদের সমালোচনা শুনবার জন্যে প্রস্তুত হতে হয় ; যারা কাজ করে না, তারা সমালোচনাও শোনে না। লজ্জা পেয়ে ফিরে আসতাম।

তখন এত বেড়া এত ফটক ছিল না; এত ঘরবাড়ি, এত জনসংখ্যাও ছিল না। সকলের কাছে সকলের অবাধ গতি ছিল ; ছোট ছেলেমেয়েরাও অনেক সময় বেড়াতে বেড়াতে গুরুদেবের সামনে হাজির হত, তাঁর জল-খাবারে ভাগ বসাত।

আকাশটা মাটিটা বড় কাছাকাছি ছিল। প্রকৃতির বুকে ছেলেমেয়েরা মানুষ হবে বলে কলকাতার আরাম ছেড়ে ঐ রুক্ষ কাঁকরের দেশে অভাবে দুশ্চিন্তায় কবির দিন কেটেছিল। আমি যখন গেছি তখন সেসব পুরনো কথা হলেও, প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগটি টের পেতাম। ছয় ঋতুকে উৎসব করে আহ্বান করা হত। বৃষ্টির পর রোদ উঠলে ক্লাস ভেঙে যেত, দলে দলে সব গান গাইতে গাইতে কোপাই নদীর ধারে যেত। এখনো মাঝে মাঝে যায়; দেখলে যা আর ফিরবার নয় তার জন্য মন কেমন করে।

একবার কোপাই নদীর ধারে দশ-এগারো বছরের একদল ছেলেমেয়ে আর হিরণদিকে নিয়ে চড়িভাতি করতে গেলাম। হিরণদি রান্নাঘরের মেট্রন, নিজেও পাকা রাঁধিয়ে, আর ভারি রগুড়ে। জনা ত্রিশ মাথা, আমার কাছ থেকে দশ টাকা চাঁদা আদায় হয়েছে, তাই দিয়ে খিচুড়ি মাংস মণ্ডামিঠাই হবে। আমি পয়সাওয়ালা মানুষ, মাসকাবারে পঁয়ষট্টি টাকা মাইনে পাই, নেবে না-ই বা কেন দশ টাকা? রান্না প্রায় শেষ, সবাই মিলে মহা আনন্দে কোপাই নদীতে স্নান করা গেছে। এমন সময় ভারি কলরব। দেখি একদল সাঁওতাল ছেলেমেয়ে খোকাবুড়ো নদীর জল উজানে ঠেলে মহা হৈ-চৈ করতে করতে আসছে। তাদের সবার হাতে জাল, পোলো, বল্লম, ধামা ঝুড়ি, ভাঙা হাঁড়ি, যার যেমন জুটেছে। সবাই মিলে যেমন করে পারে মাছ ধরে ধরে ছুঁড়ে ডাঙায় ফেলছে। ডাঙাতেও নদীর দুই তীরে কল-কল করতে করতে মাছ-ধরুয়াদের সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে

Scanned by CamScanner

চলেছে জনা সত্তর-আশি বুড়োবুড়ি, ছোট ছোট ছেলে আর গাঁয়ের বৌ-ঝিরা। যেমন ডাঙায় মাছ পড়ছে সঙ্গে সঙ্গে পেট চিরে ঝোড়ায় ফেলা হচ্ছে। দশ-বারো বছরের ছেলেরা জলে নেমে, তীরের কাছে পাথরের গর্ত থেকে রাশি রাশি চিংড়ি মাছ টেনে বের করছে দেখে আমরা অবাক।

শুনলাম বছরের মধ্যে চার-পাঁচবার বিশেষ বিশেষ সময়ে ওরা গাঁসুদ্ধ এমনি মাছ ধরতে বেরোয়। গাঁয়ে ফিরে সব মাছ একসঙ্গে করে মোড়লকে দেওয়া হবে। মোড়ল প্রত্যেক পরিবারের প্রয়োজন বুঝে মাছ ভাগ করে দেবে। এমন সুন্দর ব্যবস্থার কথা শুনে ভালো লাগল।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় কয়েকজন মিলে সাঁওতাল গ্রাম দেখতে গেলাম। এখন যে জায়গাটাকে পিয়ারসন পল্লী বলা হয় সেইখানে। মাঝখান দিয়ে চলে গেছে তকতকে করে গোবর দিয়ে লেপা একটি সড়ক, তাতে কোথাও একটা কুটো পড়ে নেই। পথের দুধারে ফুটফুটে পরিষ্কার দু'সারি মাটির ঘর, গায়ে গায়ে লেগে রয়েছে। সব লেপাপোঁচা ঝকঝক করছে। একটা ঘরের মধ্যে দেখলাম একগাদা ন্যাংটো ছেলেপুলে শুয়োর ছানা ও মা-শুয়োর প্রসন্নভাবে গাদাগাদি করে রয়েছে। সবাই ফুটফুটে পরিষ্কার।

নিজস্ব জীবনধারা ওদের, নিজেদের পুজো-পরব, আইন-কানুন। জাতির স্বকীয়তা প্রাণ দিয়ে রক্ষা করে, বাইরের লোককে ওদের সামাজিক জীবনে হস্তক্ষেপ করতে দেয় না। গরীব কিন্তু সৎ; ওদের অপরাধগুলোর মধ্যে আপত্তিকর অনেক কিছু থাকলেও, নোংরামির লেশ ছিল না। অন্তত উনিশ শ একত্রিশ সালে যেমন দেখেছিলাম, তেমনি বললাম।

নন্দবাবুর ছাত্ররা সাঁওতাল গ্রামের ছবি আঁকতে যেত। আমিও তাঁর রোজ দু ঘণ্টার ছাত্রী ছিলাম, যদিও রোজ তাঁর দেখা পাব এমন আশা করতাম না। কাজের অবসর মতো যেতে হত, হয়তো ততক্ষণে মাস্টার মশাই অন্য কাজে লেগে গেছেন। একদিন এসে আমার ডেস্কের পাশে বসলেন। মাটি থেকে এক হাত উঁচু ডেস্ক, শতরঞ্চির উপর বসা। পাশে

Scanned by CamScanner

মাটির হাঁড়িতে জল, আঁকার সরঞ্জাম ইত্যাদি। মাস্টারমশাই ছবি আঁকা সম্বন্ধে গল্প করতে করতে আবার তুলিগুলি ছেঁটেছুঁটে ঠিক করতে লাগলেন। দেখতে দেখতে যে যার কাজ ছেড়ে চারিদিকে ভিড় করে দাঁড়াল, নীরব নিষ্ঠায় পূর্ণ একটা ছোটখাটো ভিড়।

মাস্টারমশাই তুলিটাকে মাঝে মাঝে পরীক্ষা করছিলেন। তুলি ধোয়া ময়লা জলে ডুবিয়ে একটুকরো ফালতু কাগজে ইচ্ছামত আঁকিবুকি টানছিলেন। আমি বিস্ফারিত লোচনে দেখছিলাম আঁকিবুকির ভিতর থেকে কেমন একটা ছবি ফুটে উঠছে; পাখির বাসায় ছানাগুলো হাঁ করে আছে মা কখন এসে পোকা খাওয়াবে। ছবিটা কবে হারিয়ে গেছে, সে দুঃখ আজো যায় নি। মনে আছে মাস্টারমশাই বলেছিলেন, চোখ বুজে সমস্ত ছবিটা আঁচ করে নিতে হয়, আঁকা হয়ে গেলে এখানে একটা লতা, ওখানে একটা পাখি বসিয়ে ফাঁক ভরতি করতে হয় না।

আশ্চর্য মানুষ ছিলেন নন্দলাল বসু। শিল্পী বললে, বিশেষত সেকালের শান্তিনিকেতনের শিল্পী বললেই, অনেকের চোখের সামনে লম্বা চুল, ঢুলুঢুলু চোখ, লুটানো কাপড়, এলানো দেহ যে একটি ন্যাকা-মূর্তি ফুটে উঠত, মাস্টারমশাই ছিলেন ঠিক তার উল্টো। চুল এত ছোট করে ছাঁটা যে কোঁকড়া কি সোজা সহজে বোঝা যেত না। তামাটে রঙ, বলিষ্ঠ দেহ, স্পষ্ট কথা। রোজ বিকেলে কলাভবনের ছেলেমেয়েদের ভলিবল খেলতে হত। মাস্টারমশাইও অনেক সময়ই যোগ দিতেন।

গান্ধী দিবসে কলাভবনের ছেলেদের নিয়ে মাস্টারমশাই খাটা পাই-খানা পরিষ্কার করতে যেতেন; ঐ কাজটি প্রত্যেক বছর ওঁরা বেছে নিতেন। এখনো যেন চোখের সামনে দেখতে পাই একটা কোদাল কাঁধে মাস্টারমশাই দলবল নিয়ে চলেছেন 'ফাগুন লেগেছে বনে বনে ..' গাইতে গাইতে।

কত দেশের কত লোক তখন শান্তিনিকেতনে আসতেন যেতেন তার ঠিক নেই। ভাবতাম বিশ্বভারতী নামটি বড় মানিয়েছে। তখনো বিশ্ব-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয় নি, কবি তখনো তাঁর স্বপ্নে দেখা ছবিটির বাস্তব রূপ দেবার চেষ্টা করছেন। প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতি তাঁর

Scanned by CamScanner

পছন্দ ছিল না। তিনি চাইতেন সম্পূর্ণ একেকটা মানুষ গড়তে। প্রকৃতির সব সৃষ্টি যেমন নিজেদের অপূর্ব নিয়ম অনুসারে বেড়ে ওঠে, মানুষের ছেলেমেয়েরাও তাই করুক এই ছিল তাঁর ইচ্ছা। তাদের সমস্ত জন্মগত শক্তিগুলি বিকশিত হোক ; বিশ্ব-প্রকৃতির সঙ্গে তারা মিলে যাক; এই ছিল তাঁর স্বপ্ন। কিন্তু কি করে সেটা সম্ভব হতে পারে, তাই নিয়েই ছিল সমস্যা।

গাছপালাগুলো যেখানে পুঁতে দেওয়া যায় সেখানেই থাকে। যে সার দেওয়া যায় তাইতেই পরিপুষ্ট হয়; এমন কি কিছু না দিলে হয়তো মরেও যায়। মানুষের শিশুরা যে তেমন শান্ত-শিষ্ট বাধ্য নয়। তাদের প্রাণের অবাধ স্ফূর্তিকে বাড়তে দিলে যে অন্যরা ত্রাহি-ত্রাহি ডাক ছাড়ে। ওখানে গিয়েই যে কঠোর নিয়মের সঙ্গে অবাধ স্বাধীনতার মিশেল দেখে অবাক হয়েছিলাম, এই হয়তো তার মূল কারণ।

ভারি সরল জীবনধারা ছিল ওখানকার, সাজসজ্জার বালাই ছিল না। উৎসবের দিনে মেয়েরা হয়তো বাসন্তী রঙে সুতির শাড়ি ছুপিয়ে নিত, খোঁপায় হয়তো ফুলের মালা জড়াত, রেশমীও পরত না। রঙও মাখত না।

Scanned by CamScanner

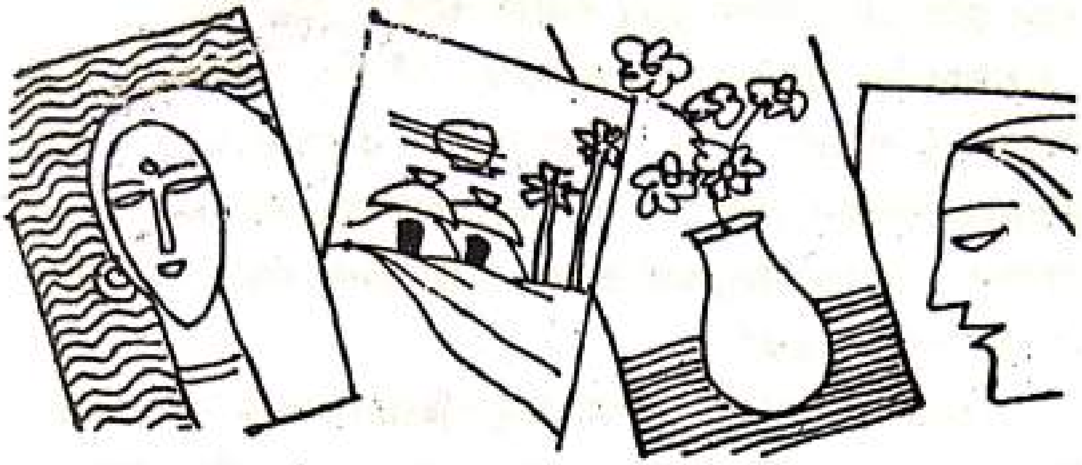

॥ একুশ ॥

এমন সব চ্যালা পেয়েছিলেন বলেই রবীন্দ্রনাথ আশ্রমটি গড়তে পেরেছিলেন। আমি যখন গিয়েছিলাম তখন আশ্রমের বয়স প্রায় ত্রিশের কাছাকাছি ; প্রথম প্রতিষ্ঠার তীব্র অনুপ্রেরণা অনেকটা স্তিমিত হয়ে এসেছে। নানান কার্যকরী কারণে প্রথম পরিকল্পনাটিকেও অনেকখানি কেটেছেঁটে ঢেলে সাজাতে হয়েছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দেয় ছাত্রছাত্রীরা, কাজেই সেখানকার শিক্ষা-পদ্ধতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতে হয়। এদিকে গুরুদেব কলকাতায় শিক্ষা-পদ্ধতির ওপর কি রকম হাড়ে চটা ছিলেন সেটা তাঁর জীবন-স্মৃতি না পড়ে, শুধু তোতা-কাহিনী পড়লেও বোঝা যায়।

আমি দেখতাম পড়া গেলানোর চেয়ে মানুষ তৈরির দিকে সবার ঝোঁক। ফলে ভারি কর্মঠ, সৎ ও সৌজন্যশীল একদল ছেলেমেয়ে বেরুত, কিন্তু গুটিকতক বিশেষ ব্যতিক্রম ছাড়া, পরীক্ষার ফল অতিশয় মন্দ হত। বিশেষ করে ইংরিজি বিদ্যার দৌড় দেখে আমি অবাক হয়ে যেতাম। অথচ সাহিত্যবোধের দিক থেকে ছেলেমেয়েদের তারিফ না করেও পারতাম না। ওদের সাহিত্যসভাগুলি বাস্তবিক আনন্দের ব্যাপার ছিল। আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে মনে হত সাধারণ স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েদের কলম থেকে এত ভালো রচনা সচরাচর দেখা যায় না। হয়তো গুরুদেবের অনুপ্রেরণাতেই সেটা সম্ভব হয়েছিল।

গোড়ার দিকে একবার উপরের ক্লাসের একটি ছেলের পাঠ্যপুস্তক

Scanned by CamScanner

খুলে দেখি এক জায়গায় Soot শব্দটির পাশে বাংলায় লেখা 'ঝোল'। সে আবার কি? জিজ্ঞাসা করতেই সকলের উচ্চ হাস্য। শুনলাম ছেলেটি নবাগত ও পূর্ববঙ্গীয় ; তার আগে একদিন রান্নাঘরে 'মাঝের ঝুল' চাওয়াতে সকলের পরিহাসের পাত্র হতে হয়েছিল, তাই তনয়দা যেই বললেন Soot মানে ঝুল, ছাত্র ভাবলে, আহা উনিও বাঙাল। এই ভেবে মার্জিনে লিখল 'ঝোল'।

ঐ তনয়দা আরেকজন আশ্চর্য মানুষ ছিলেন। যাকে বলে জাত-শিক্ষক। তবে মুখে কটু কথা আর বুকভরা স্নেহ। অমন খাঁটি লোক কম দেখা যায়। এদিকে কাউকে ক্ষমা করতেন না, অন্যায় দেখলে গাল দিয়ে ভূত ভাগিয়ে দিতেন। আমাদেরও ছাড়তেন না। ওদিকে নীরবে, সকলের অগোচরে, যার যেটির অভাব হচ্ছে, সেটি যোগাতেন।

সবাই বলত, ও বছরটি নাকি অন্য সব বছর থেকে আলাদা, বিশেষ একটি বছর। কারণ বৈশাখে রবীন্দ্রনাথের সত্তর বছর পূর্ণ হয়েছে, পরের বছর জানুয়ারি থেকে তাঁর জয়ন্তী উৎসব হবে। সারা বছর ধরে তারই তোড়জোড় চলছে। হয়তো আপাতদৃষ্টিতে আমার অনভ্যস্ত চোখে যাকে পড়াশুনার অবহেলা মনে হত, তাও এরি জন্যেই ।

জয়ন্তী উৎসব হল কলকাতায়, টাউন হলে। তার সামনে চওড়া রাজপথ ঘিরে নিয়ে সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান; বড় বড় হলঘরে কবির নিজের আঁকা ছবির প্রদর্শনী ও নানান ফটোগ্রাফ। বাইরে একটা উঁচুদরের স্বদেশী শিল্প প্রদর্শনী। তাছাড়া গান-বাজনা, বক্তৃতা ও জয়ন্তী উপলক্ষে দুখানি বিশেষ গ্রন্থ প্রকাশন ; একটি বাংলায় ছোট বই, আরেকটি সুবৃহৎ ও মূল্যবান ইংরেজি গ্রন্থ, তাতে দেশ-বিদেশ থেকে জ্ঞানী-গুণীরা কবির সম্বর্ধনায় যোগ দিয়েছেন।

প্রস্তুতি পর্ব শুরু হয়েছিল অনেক আগে শান্তিনিকেতনে। নন্দবাবু ছবির পাহাড়ের পাশে মাটিতে বসে গুরুদেবকে বাছাই করার কাজে সাহায্য করতেন। সে খুব সহজ কাজ নয়, একজন জাত-শিল্পী, একজন শখের শিল্পী; দুজনেই অসাধারণ, দুজনারি সমান-তীব্র মতামত। মাঝে মাঝে মহা তর্কাতর্কি শোনা যেত, অবিশ্যি সবই নিচু গলায়।

রোজ সন্ধ্যায় উত্তরায়ণের পশ্চিমের বড় হলে নাটকের মহড়া চলত। লোকে লোকারণ্য, শিক্ষক, শিল্পী, গাইয়ে, বাজিয়ে, অভিনেতা, শ্রোতা আর গুরুদেব নিজে। তাঁরো রোজ মত বদলায়। সব মনে নেই, তবে বোধ হয় গোটাতিনেক নাটক হয়েছিল। তার মধ্যে 'শাপমোচন' ছিল, 'নটির পূজা' ছিল। কঠিন শিক্ষক গুরুদেব, ক্ষুদ্রতম ত্রুটিও ছেড়ে দিতেন না। অপার ধৈর্য, বারে বারে একই দৃশ্যের পুনরাভিনয়, একই গানের পুনরাবৃত্তি। মাঝে মাঝে তাঁর ধৈর্যের বাঁধ ভাঙত; হয়তো প্রধান অভিনেতাদের একজনকে এক কথায় বিদায় দিয়ে, তার জায়গায় আরেক-জনকে বসিয়ে দিলেন। ফলে মান-অভিমান, কান্নাকাটি। সেদিকে গুরুদেব ফিরেও দেখতেন না, ধর্তব্যের মধ্যেই আনতেন না। এই ধরনের ঔদাসীন্য সৃষ্টিকারদের মধ্যে না থাকলে, কোনো অপূর্ব সৃষ্টিই সম্ভব হত না। নির্মমভাবে নিজেকে ও অপরকে বলিদান। কোনো কষ্টকে কষ্ট বলে মানা নয়, নিজের বেলাও নয়, অপরের বেলাও নয়, গুরুদেবের কাণ্ড দেখে ওই কথা অনেকবার মনে হয়েছিল।

শেষকালে প্রস্তুতি-পর্ব শেষ হল। বাকিটুকু হবে কলকাতায়, অকু-স্থলে। অভিনয়ের কিছু হবে নিউ এম্পায়ারে, কিছু জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-দালানে। ডাঃ টিম্‌বার্স ভালো নাচ জানেন, রুশ কস্যাক্ নাচে অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখান। কবি তাঁকে দিশি নাচ শিখিয়েছেন শাপমোচনে, একটি প্রধান ভূমিকায় নামিয়েছেন, নাচছেও সাহেব খুবই ভালো বলতে হয়, তবে বড় বেশি দুম-দুম ধুপ-ধুপ শব্দ হচ্ছে, স্টেজের নিরাপত্তা সম্বন্ধে সকলের মহা ভাবনা।

আমাকেও নিয়েছেন গুরুদেব ছোট একটি ভূমিকায়। 'নটির পূজা'য় আমি হলাম ভিক্ষুণী উৎপলপর্ণা। শেষ মহড়ার সময় গুরুদেব দাঁড়াতেন ঠাকুরদালানের এক মাথায়, আমাদের দাঁড় করাতেন অন্য মাথায়। মাইক-টাইকের বালাই ছিল না, স্রেফ চ্যাঁচাতে হবে। তাও এমন ভাবে চ্যাঁচাতে হবে যে চ্যাঁচানো বলে টের পাওয়া যাবে না ; মনে হবে স্বাভাবিক কণ্ঠে কথা বলা হচ্ছে। স্কুলে কলেজে উৎসব উপলক্ষে নাটক করেওছি, করিয়েওছি, এমন কি প্রয়োজন হলে লিখেওছি। কিন্তু সেসব ছিল ছেলে-

Scanned by CamScanner

খেলা। এ একটা সাধনা। প্রত্যেকটি শব্দ শুনতে পাওয়া চাই, উচ্চারণ বিশুদ্ধ হওয়া চাই, স্বর ঠিক যেমনটি দরকার তেমনি হওয়া চাই। আমরাও শীতের মধ্যে ঘেমে উঠি, গুরুদেবের সুন্দর মুখখানাও একটু লাল দেখায়, কপালের মাঝখানে একটু ভ্রূকুটি, গলার স্বরে একটু অসহিষ্ণুতা আর দৃষ্টিতে বাজপাখির তীক্ষ্ণতা!

এর মধ্যে আবার মহড়া বন্ধ রেখে পৌষ উৎসব করা হল। এই প্রথম আমি পৌষ উৎসব দেখলাম, দেখে একেবারে অভিভূত হয়ে গেলাম। গ্রাম্য জীবনের যেন একটা বান ডাকল, সমস্ত বীরভূম আশ্রমের ওপর ভেঙে পড়ল। উত্তরায়ণের পুবের মাঠে মেলা, পথের দুধারে দোকানঘর। 'শান্তিনিকেতন' বাড়ির পাশেই আমাদের বিশ্বভারতীর চায়ের দোকান। বুবু আর আমি ভোর থেকে রাত অবধি সেখানে চপ গড়ি আর ডিমে রুটির টুকরো ডুবোই আর ভাজি। আর তনয়দারা হাজার হাজার পেয়ালা চা তৈরি করেন।

তারি মধ্যে আবার বুবুর দাদার বেড়াতে এসে অসুখ করল, বুবু রণে ভঙ্গ দিয়ে তাকে নিয়ে কলকাতায় চলে গেল। আমি একা কাজের সমুদ্রে কূল পাই না। শেষ পর্যন্ত কয়েকজন দক্ষ ছাত্র ডেকে এনে কার্য সমাধা হল। কাজ করব কি, কানে আসে একতারার শব্দ, বাউল গানের সুর। হাজার হাজার পায়ের কব্জি দেখতে পাই, আমাদের চায়ের দোকানের তিরপলের তলায় ছয় ইঞ্চি ফাঁক। সেখান দিয়ে আবার অষ্টপ্রহর হু হু করে উত্তুরে হাওয়া ঢোকে। একেক বছর বীরভূমের শীতটি খুব কম পড়ে না!

সামনে মণিপুরী জিনিসের দোকান। চুপ করে থাকতে না পেরে, মাঝে মাঝে একবার উঠে গিয়ে একটা লাল নীল আর মুগার ডোরাকাটা কালো রেশমী গায়ের চাদর কিনে আনলাম। দাম তার দু টাকা চোদ্দ আনা। অনেকে বলল নাকি ভারি ঠকিয়েছে। সেই চাদরটি আমি দশ-বারোটা শীতকাল গায়ে জড়িয়েছিলাম। শান্তিনিকেতনের মেলায় তখন লোকে সস্তা খাঁটি জিনিস কিনতে যেত।

ঐ প্রথম সাঁওতালদের খেলাধুলো দেখলাম। তীর খেলা আর তেল-

Scanned by CamScanner

তোলা বাঁশ বেয়ে ওঠা। সে এক মজার ব্যাপার। একজন যদি-বা অনেক কষ্টে খানিকটা উঠল, অমনি আরেকজন অনেকটা দূর থেকে এক লাফে তার ঘাড়ে চাপল আর দুজনেই পিছলে মাটিতে নেমে এল। সাঁওতাল নাচও ভালো করে ঐ প্রথম দেখলাম। তাছাড়া সে যে কত রকমের কি ভালো মিষ্টি, মোরব্বা, পাথরের বাসন, কাঠের বাসন : রাতে যাত্রাগান, খোলা আকাশের নীচে ফিল্ম দেখা। শীতে হাত-পা প্রায় অসাড়, তার উপর গায়ে ঘেঁষে বসে গাঁয়ের লোকেরা রাতভোর এমনি বিড়ি খেলে যে তিন-চার দিন পর্যন্ত নিজের চুলে সেই বিড়ির গন্ধ পাচ্ছিলাম। তারপর ভাঙা মেলা; তারপর সব ফাঁকা; কয়েকটা গর্ত, কয়েকটা শালপাতার ঠোঙা, ভাঙা কলসির কানা আর বাতাসে ওড়া কাগজের কুচি।

মেলার শেষে কয়েকদিনের ছুটি পেলাম, বাড়ি গেলাম। তখন আমরা ভবানীপুরে একটা তিনতলা বাড়িতে থাকি। যতি হাবু আর সে ছোটটি নেই, স্কুলের উঁচু ক্লাসে পড়ে। শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে তাদের অদম্য কৌতূহল। একবার গিয়ে দেখেও এসেছিল। গুরুদেব চায়ের নেমন্তন্ন করে খাইয়েছিলেন। বাকে সাহেবের বাড়িতে তাঁর স্ত্রীর হাতে রান্না ডেনিস্ হাই টিও হয়েছিল; টোস্ট করা চিজের আর মাছের স্যান্ড-উইচ, আলুর স্যালাড, গরম গরম ঘরে তৈরি মিষ্টি বিস্কুট। বাকে সাহেব বাংলা গান গেয়ে শুনিয়েছিলেন। যতি হাবুর সঙ্গে মাও ছিলেন, সবাই আশ্চর্য! এখন শান্তিনিকেতনের মেলা থেকে ছোটখাটো কাঠের আর পাথরের জিনিস, পুঁতির মালা, সাঁওতালি রূপোর আংটি পেয়ে সবাই মহাখুশি।

অনেকের মনে থাকতে পারে যে ঐ জয়ন্তী উৎসবের শেষের দিকে গান্ধীজীর কারাবরণের খবর আসতেই, কবি উৎসব বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তবে নিউ থিয়েটার্সের বিশেষ অনুরোধে কবি ‘নটীর পূজা’র ফিল্ম তুলতে রাজি হয়েছিলেন। সে আরেক কাণ্ড। নিউ থিয়েটার্স তখন খুব বেশি দিন প্রতিষ্ঠিত হয় নি; বাংলা সবাক চিত্রও তার নতুনত্ব হারায় নি, এমনি সময় ‘নটীর পূজা’ তোলা হল। তাও আবার স্টেজ প্রোডাকশনের ছবি, না আছে তাতে সিনারি না আছে যথেষ্ট জনগণোপযোগী রস-রসিকতা।

Scanned by CamScanner

শেষ পর্যন্ত যখন ছবি রিলিজ হল, জনতা রেগেমেগে চেয়ার ভেঙে, আলো ফাটিয়ে, টিকিটের দাম ফেরত চাইতে লাগল। পঁয়ত্রিশ বছর পরে সে ছবি আরেকবার দেখানো হয়েছিল বোলপুরে, এবার দর্শকরা ভেবেই পেল না অত রাগের কি কারণ থাকতে পারে!

উত্তেজনা ঠাণ্ডা হয়ে গেল, আবার নিত্যকার নিয়মে পড়াশুনো শুরু হল। একদিন সন্ধেবেলায় উপাসনার পর, পড়ার ঘণ্টার আগে, একদল কলেজের ও স্কুলের উপরের ক্লাসের ছেলে হুড়মুড় করে রান্নাঘরে ঢুকে পড়ে, কোলপাঁজা করে ঠাকুরদের সরিয়ে দিয়ে একশো সাতাশটা ডিম খেয়ে ফেলল। তাই নিয়ে মহা সোরগোল। উত্তরায়ণে অধ্যাপক সভা বসে গেল। গুরুদেব একবার চারিদিকে প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকালেন, তারপর আমাকে বললেন, 'তুমি তো সদ্য কলেজ ছেড়েছ, বল দিকিনি ওরা কেন এরকম করল, ওরা তো কেউ গুণ্ডা ডাকাত নয়!' আমি বললাম, 'খিদের জ্বালায় করেছে বোধ হয়।' 'কেন, রান্নাঘরে কি ওরা যথেষ্ট খেতে পায় না?' কি করে বলি তা পায় না? রান্নাঘরে দুবেলা অপর্যাপ্ত পরিমাণে ভাত ডাল তরকারি, প্রায়ই মাছ বা ডিম, ক্বচিৎ কদাচিৎ মাংসও পায়। সকালে ভালো জলখাবার দেওয়া হয়। গুরুদেবকে বুঝিয়ে বললাম যে যত গোলমাল শুধু বিকেলের জলখাবার নিয়ে। কখনো পরোটা তরকারি বা যথেষ্ট মুড়িমাখা শশা কলা থাকে বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে বাটি করে বড় দু'টুকরো ফুটি আর দু'টুকরো পেঁপে ছাড়া কিছু থাকে না। তাই খেয়ে কি বেলা সাড়ে এগারোটা থেকে রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত থাকা যায়? দেখলাম গুরুদেবের বিরক্তি দূর হয়ে গেছে, মুচকি মুচকি হাসছেন। জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমিও কি তাই খাও?' আমি বললাম, 'না।' প্রসঙ্গটি ঐখানে বন্ধ হল। আসলে রান্নাঘরের পিছনে কো-অপ থেকে চারদিনের বাসি পাঁউরুটি পাওয়া যেত, ছোটগুলোর দাম দু পয়সা, বড়গুলোর এক আনা। এক আনা দিয়ে কাগজের মোড়কে মাখন পাওয়া যেত। তিন পয়সা করে একেকটা মুরগির ডিম। বুবু আর আমি তাই কিনতাম। একটা সুবিধা ছিল যে রুটিটা টোস্ট করার হাঙ্গামা করতে হত না, এমনি শুকিয়ে টোস্ট হয়ে থাকত।

Scanned by CamScanner

কাটতেও হত না, রান্নাঘরের নোড়া দিয়ে আস্তে ঠুকলেই চৌচির হয়ে যেত। হিরণদি এক ফোঁটা তেল দিয়ে ডিম ভেজে দিতেন। আমরা তাঁর ছোট কাজের ঘরটিতে বসে উৎকৃষ্ট জলযোগ করতাম। কখনো তনয়দা, কখনো নিশিকান্ত আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করতে আপত্তি করতেন না। তবে আমরা বড়লোক, পঁয়ষট্টি টাকা আয়-বলেছি কি বুবু মিনিমাগনা খাটত, বাড়ির মেয়েরা কাজ করার জন্য টাকা নেবে, এতে ওদের বাড়ি থেকে আপত্তি ছিল!—যাই হোক, আমরা পয়সা খরচ করব না তো কে করবে? মাঝে মাঝে গুরুপল্লীতে একজনদের বাড়িতে গিয়ে সাড়ে তিন টাকা দিয়ে রঙিন শাড়ি পর্যন্ত কিনতাম।

বেশ ছিলাম, হঠাৎ কেমন তাল কেটে গেল। আসলে জায়গাটা বড় ভালো লাগত, কত ভালো লোকের দেখা পেয়েছিলাম, কত আজীবনের বন্ধু লাভ করেছিলাম, আজ পর্যন্ত যাদের সঙ্গে স্নেহের বন্ধন ছিন্ন হয় নি; কিন্তু খালি মনে হত কাজের যথেষ্ট সম্মান নেই এখানে। গুরুদেব নিজে তখন নানান ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছেন, নিত্য বিদেশ থেকে ডাক আসে, আশ্রমের ভিতরকার সংবাদ সব তাঁর কাছে পৌঁছত না, পৌঁছলেও তার সুরাহা করে দেবার ফুরসৎ পেতেন না। ইংরেজিতে যাকে বলে academic dignity, সেটি খুঁজে পেতাম না; যেন একটু জমিদারের সেরেস্তার মতো আবহাওয়া। মনে মনে একটু একটু করে অনেক দিন থেকে ক্ষোভ জমা হচ্ছিল। যতই চৈত্র মাস ও বছরের শেষ এগিয়ে আসতে লাগল, ততই অসহ্য লাগতে লাগল।

এদিকে গুরুদেবও বিদেশে ; স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সব বিষয়ে আমার সঙ্গে একমত নন; তার উপরে কানে কানে কে যেন কেবলি বলে—'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, আর কোনোখানে।' ঝপ্ করে ত্যাগপত্র দিয়ে বসলাম এবং সেটি গৃহীতও হল। ছেড়ে যেতে বড় কষ্ট হয়েছিল। কি অপূর্ব আদর্শে গড়া বিদ্যালয়! এখনো মনে হয় ওখানকার কতকগুলি নিয়ম আজকালকার ক্ষুব্ধ ছাত্রসমাজের নিশ্চয় ভালো লাগত। তার মধ্যে একটি ছিল ছাত্রদের বিচারসভার ব্যবস্থা। ছাত্ররা অপরাধ করলে ছাত্ররাই তার বিচার করে, দরকার হলে সাজা দিত। নিয়ম-কানুন ছিল,

Scanned by CamScanner

যথেষ্ট গাম্ভীর্য রক্ষা হত, কারো কিছু বলবার থাকত না, অবিচার বোধের ছিদ্র থাকত না। মনে পড়ে কত চাঁদনি রাতে গান শোনা, বর্ষাশেষে কোপাই নদীর ধারে বেড়ানো, খোয়াইয়ের মধ্যে কত রহস্য আবিষ্কার। চারু দত্ত মশাই এসে উত্তরায়ণে থাকতেন, আশ্রম-তত্ত্বাবধানের ভার পড়ত তাঁর উপর। তাঁর সঙ্গে কত সন্ধ্যা কাটিয়েছিলাম বুবু আর আমি, কত সাহিত্যালোচনা কত দেশপ্রেমের কথা, কত রসের গল্প! গুরুদেব নিজে কত সময় সন্ধ্যাবেলায় খেতে বসে পাশে ডেকে বসিয়ে লুচি-তরকারি তুলে দিয়েছেন, বিদায় নিয়ে আসবার সময় নিজের গলা থেকে ফুলের মালা দিয়েছেন, বলেছেন, অতিথিকে দক্ষিণা দিতে হয়। তবু সইল না।

শেষে একদিন সকালে অনঙ্গবাবুর লড়ঝড়ে মোটরে টিনের ট্রাঙ্কটি আর পাটকিলে হোল্ড্অলটি তুলে চলে এলাম। ক্রমে আশ্রমটি পিছনে পড়ে থাকল, তার ছায়াময় আশ্রয়টুকু দূরে সরে গেল, সেই ছোট পুলটি পার হয়ে বোলপুর শহরে ঢুকে পড়লাম।

কবি ফিরে এলে কেউ তাঁকে আমার চলে আসার কথা নিশ্চয় বলে-ছিল। আমার মনে ক্ষোভ জমা ছিল, তাই আমি অনেকদিন চুপ করে-ছিলাম। তারপর সূর্যের আলো, দক্ষিণের হাওয়া লেগে ক্ষোভ কোথায় মিলিয়ে গেল। আমি তখন গুরুদেবকে একখানি ছোট চিঠি লিখলাম। কি লিখেছিলাম তার এক বর্ণও মনে নেই, কিন্তু তার উত্তরে তিনি আমাকে যে চিঠি লিখেছিলেন, সেটি আজ অবধি যত্ন করে রেখে দিয়েছি। এইখানে তাকে প্রকাশ করলাম ঃ—

উত্তরায়ণ
ওঁ শান্তিনিকেতন
বাংলা

কল্যাণীয়াসু,

তোমার চিঠিখানি পড়ে খুব খুশি হয়েছি। প্রতিদিনের কাজের টানা-হেঁচড়া গোলমালের মধ্যে আমাদের আশ্রমের আসন অখণ্ড থাকে না। মলিনও হয়, দুঃখও পাই। কিন্তু সেই কাজের বাইরে তুমি যে আসন

Scanned by CamScanner

পেয়েছ সে রইল তোমারি চিরকালের জন্যে। তোমার যখন অবকাশ, যখন খুশি, যদি এসো তাহলে দেখবে তোমার জন্য রয়েছে তোমার যথার্থ স্থান।

আজ ৭ই পৌষের মন্দিরের কাজ শেষ করে এলেম। তোমার কথা মনে পড়ল। ছুটি নেই তোমাদের, যদি আসতে পারতে নিশ্চয়ই তোমার ভাল লাগত।

তুমি আমার আন্তরিক আশীর্বাদ গ্রহণ করো। ইতি। ৭ই পৌষ ১৩৩৯।

শুভানুধ্যায়ী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

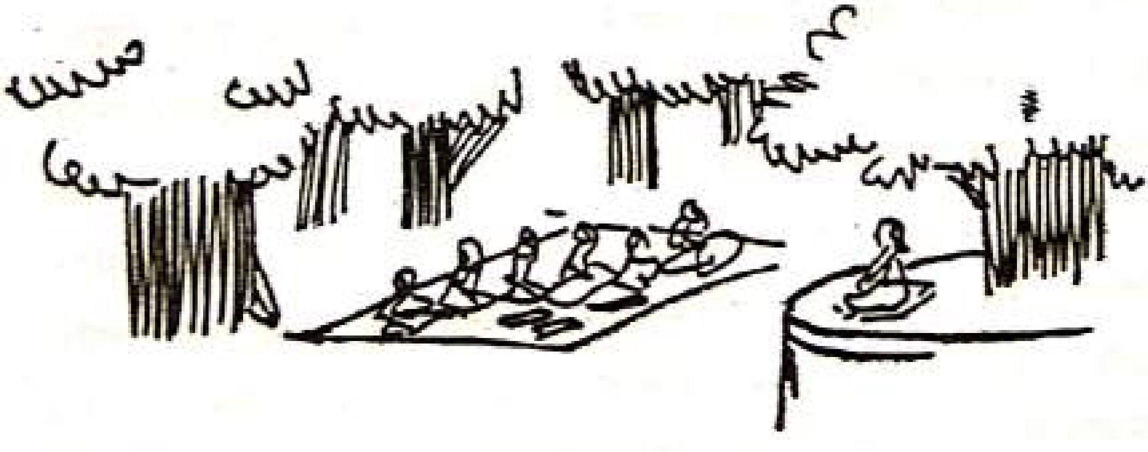

Scanned by CamScanner

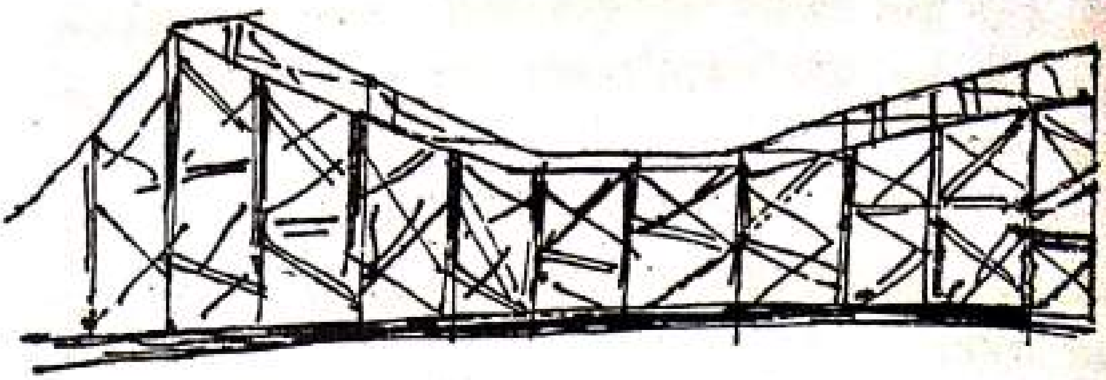

॥ বাইশ ॥

শান্তিনিকেতন থেকে যখন কলকাতায় ফিরে এলাম, দেখলাম আধখানা মন সেখানে ফেলে এসেছি। শহুরে জীবন কিছুতেই ভালো লাগে না। দারুণ একটা কুঁড়েমিতে কিছুতেই মন বসাতে পারি না। এদিকে বাবা রেগেমেগে চতুর্ভুজ। বারে বারে কাজ ছাড়া, মত বদলানো মনের অনিশ্চয়তার লক্ষণ। এ ধরনের দুর্বলতা বাবা দেখতে পারতেন না। মনের দরজা এঁটে বন্ধ করে রাখলেন; এ জীবনে আর সে দরজা খোলাতে পারলাম না। কি করে বোঝাই তাঁকে যে অনিশ্চয়তা নয়, এ এক ধরনের নিশ্চয়তার অবশ্যম্ভাবী ফল। আমার মন তার জায়গা খুঁজে পাচ্ছে না; কি করে থাকি সেখানে!

বাবার সঙ্গে মনের যোগসূত্রটি এবার ছিঁড়ে গেল। দু'জনে দু'রকমের ভাষা বলতে শুরু করলাম। কথা বলা মানেই মতভেদ। আমাকেও এক রকম শান্ত ঔদ্ধত্যে পেয়ে বসল। নিজের মতটি না বলে থাকতে পারতাম না। বাবা কিছু বললেই আমার মনে হত ঠিক তার উল্টোটি। অথচ এ বিষয়েও আমার কোনো সন্দেহ ছিল না যে, যে-সব কারণে বাবা আমার উপর অসন্তুষ্ট হচ্ছেন, সে-সবই বাবার কাছ থেকেই উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া। বাবা আয়নার কাঁচের দিকটা দেখতেন, সেখানে উজ্জ্বল হয়ে সব কিছুর হুবহু প্রতিকৃতি দেখা যেত। আমিও সেদিকটা দেখতে পেতাম, তবুও বারে বারে আয়না ঘুরিয়ে পিছনদিকের সূক্ষ্ম নক্সা দেখার চেষ্টা করতাম। যেটা যেমন সেটাকে তেমন দেখে মন উঠত না; এও আমার বাপের বংশের রক্তের সঙ্গেই পাওয়া, এ কথা বাবাকে বলি কি করে? বাবা যে কানে তুলো গুঁজেছেন। শেষ পর্যন্ত রেগেমেগে চেষ্টা

Scanned by CamScanner

করাও ছেড়ে দিলাম।

১৯৩২ সাল। আমার চব্বিশ বছর বয়স। তখনকার হিসাবে বিয়ের বয়স পেরিয়ে যায় আর কি। বছর দুই আগে একবার আমার হয়েই গিয়েছিল আরেকটু হলে; কিন্তু সেই সোনালি গুটিটাও কেটে বেরিয়ে এসেছিলাম। বাবা যত খুশি হয়েছিলেন, ততটা দুঃখিত হলেন। এ সবই আমার শান্তিনিকেতনে যাবার সঙ্গে সঙ্গে চুকেবুকে গেছিল। আমাদের বাড়িতে মেয়েদের বিয়ে-থার কথা কেউ বলত না। একেক সময় মনে হত যে মা বোধ হয় মেয়েদের বিয়ের বিরোধী। বিয়ে হওয়ার চেয়ে বিয়ে না হওয়াতেই যেন বেশি খুশি।

ততদিনে আমরা পদ্মপুকুরের নিমগাছে ছাওয়া বাড়িটি ছেড়ে ভবানী-পুরে অ্যালেনবি রোডে একটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন তিনতলা বাড়িতে উঠে এসেছিলাম। ইতিমধ্যে দিদিও ঘরে বসে থেকে বিরক্ত হয়ে উঠে বি-টি পাস করে, গোখেল মেমোরিয়াল কলেজে অধ্যাপনা শুরু করে দিয়েছে। একশো টাকা মাইনে ওর। তাতে আমারো ভারি সুবিধে হয়ে গেল, কারণ বলা বাহুল্য শান্তিনিকেতনে থাকাকালে সাংসারিক জিনিসের অনিত্যতা সম্পর্কে ঘোর ঔদাসীন্যের ফলে ট্যাঁক গড়ের মাঠ। সেখানকার যেসব প্রাণের বন্ধুরা অসুবিধায় পড়ে ধারধোর করেছিল, তারা সবাই এখন নাগালের বাইরে। তাছাড়া ধার ফেরত চাই-ই বা কি করে? মাসকাবারে পঁয়ষট্টি টাকা পেতাম, একদিক থেকে বলা যায় বেশ পয়সাওয়ালা লোক ছিলাম, দরকারের সময় আমার কাছ থেকে নেবে না তো কার কাছ থেকে নেবে! অগত্যা দিদির মনিব্যাগ সহায়।

কাগজপত্রে ইংরেজিতে বাংলায় কিছু কিছু প্রবন্ধ লিখি, সামাজিক বা সাহিত্যিক বিষয়ে। মাগনা, বিনি পয়সায়, প্রচুর প্রশংসাবাদের পরিবর্তে। তাছাড়া 'সন্দেশ' যতদিন চলেছিল প্রতি মাসে একটি করে গল্প দিতাম। ভেবেচিন্তে লিখতাম না, মনে কেমন যেন ঝলক দিত, কলম থেকে কথাগুলো আপনি বেরুত, চাঁচাছোলা ন্যাড়া-ন্যাড়া। এত সংক্ষেপে লেখা যে ছাপাখানায় যদি একটা শব্দ বাদ পড়ে যেত, তাহলে সে জায়গাটা অর্থহীন হয়ে যেত। অনেক বছর পরে ছড়ানো গল্পগুলোর যে

কটিকে খুঁজে পেলাম সেগুলো 'বদ্যিনাথের বড়ি' নাম দিয়ে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেছিলাম। কিন্তু যে গল্পটি ছিল আমার বাবার প্রিয় সেটিকে আর পেলাম না। তার নাম ছিল 'কাগ নয়', এখনো তার দুঃখ ভুলি নি। ঐ বাড়িটার কাছেই বিজলি ঘর, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ডাইনামো চলত সেখানে। অনবরত একটা গম্ভীর শব্দ হত, আমাদের বাড়িটাও একটু একটু কাঁপত। জ্যাঠামশাইয়ের সেই পুরনো বাড়ি ২২নং সুকিয়া স্ট্রীটে প্রেস চলার শব্দের কথা মনে হত। সে বাড়িও এমনি করে কাঁপত।

জীবনে এই প্রথম মাঝে মাঝেই শরীর খারাপ হতে লাগল। শুয়ে শুয়ে পাশের বাড়িটাকে দেখতাম। আমাদের শোবার ঘরের জানলা থেকে ওদের জানলার দূরত্ব মাত্র আট ফুট। তিনতলায় আমাদের শোবার ঘর, জানলার নিচের খড়খড়িটা একটু তুললেই দোতলায় ওদের খাবার ঘরের অনেকখানি দেখা যেত। জানলার পাশেই ওদের খাবার টেবিল।

ডিমের মতো গোল একটা কাঠের টেবিল, তাতে চাদর নেই, চিনেমাটির বাসন। শুনেছিলাম ওরা বাঙালি খ্রিস্টান শিক্ষিত পরিবার, বুড়ি শাশুড়ি; তাঁর এক আধাবয়সী অবিবাহিত মেয়ে, মোটা, কালো, কর্কশ গলা, ওপরের ঠোঁটে একটু গোঁফের ছায়া। পাড়ার একটা বড় স্কুলের নিচের ক্লাসে পড়ান। তাছাড়া ছিল বুড়ির ছেলে, তাকে কখনো গলা তুলে কথা বলতে শুনি নি। ছেলের বৌ ফ্যাকাশে, রোগা, বাক্যহীনা। আর তাদের গুটিকতক ছেলেমেয়ে, যাদের কলরবে ওদের বাড়ি ভরে থাকত।

প্রথমটা তত লক্ষ্য করি নি; তারপর একবার জ্বরজারি বুকে ব্যথা হয়ে দিন পনেরো লেবু-বার্লি খেয়ে শুয়ে থাকতে হয়েছিল। তখন বুঝতে পারলাম পাশের বাড়িতে একটা জীবন্ত নাটিকা আস্তে আস্তে ফলিত হচ্ছে।

নিজে খেতাম না বলে ওদের খাবার সময়টি ঠিক টের পেতাম। খড়খড়িটা একটু তুলে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতাম। বাড়িটা বুড়ির, হয়তো কিছু পয়সাকড়িও ছিল তাঁর। বুঝতে পারলাম তিনিই ও-বাড়ির মাথা এবং তাঁর পরেই মেয়ের স্থান। তারপর নাতি-নাতনিরা, ছেলে-বৌ কেউ নয়।

Scanned by CamScanner

টেবিলের দু মাথায় বসতেন মা-মেয়ে, মাঝখানে নীরব পুত্রটি, হয়তো চল্লিশ-বেয়াল্লিশ বয়স হবে। ছেলেমেয়েরা বোধ হয় রান্নাঘরে খেত। এখানে বৌ পরিবেশন করত। বিধবা বলে ওঁদের বাড়িতে বেশি মানা-মানি ছিল না; না থাকারই কথা। শাশুড়ির হাত খালি, থান পরনে, কিন্তু খাওয়াদাওয়ার বাছবিচার ছিল না। মাছের কাঁসি নিয়ে বৌ পাশে দাঁড়ালেই, সবার আগে তিনি সবার বড় দুটি মাছের টুকরো চামচে করে তুলে নিয়ে, মেয়ের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতেন। সে ও বাকি মাছের মধ্যে সব চেয়ে বড় দুটি তুলে নিত। সবার শেষে স্বামীকে পরি-বেশন করে, বৌ নিজের জন্য আধ টুকরো মাছ, কি এক টুকরো কাঁটা রেখে দিত।

দুধের বেলাও তাই। তখন টাকায় চার সের দুধ পাওয়া যেত কলকাতায়। দুধ একটু ঘন করে জ্বাল দিয়ে, সরসুদ্ধ কড়াই করে' বৌ টেবিলে আনত। শাশুড়ি হাতা দিয়ে ভাগ করে দুধের সঙ্গে প্রায় অর্ধেকটি সর নিয়ে নিতেন ; তারপর মেয়েও একটা বড় ভাগ নিত। সবার শেষে স্বামীর বাটিতে বাকি দুধটা ঢালতে যেতেই, স্বামী একবার চোখ তুলে তাকাত। বৌ তখন একটু দুধ নিজের জন্য রেখে দিত।

দু'বেলা রোজ দেখতাম এই ছোট নাটিকার পুনরাভিনয়। শেষের বেলায় বৌয়ের ঐ চোখ তুলে ছোট তাকানোটি আমার মনে আস্তে আস্তে বড় হয়ে দেখা দিতে লাগল। অলক্ষ্যে থেকে ওদের কাছ থেকে মানবজীবনের পাঠ নিলাম।

এখানেই এ গল্পের শেষ নয়। হঠাৎ একদিন শুনলাম বুড়ি রাতে ঘুমের ঘোরে স্বর্গে গেছেন। ক'দিন ও-বাড়িতে লোকজনের আসা-যাওয়া ও আমার সুস্থ হয়ে ওঠার দরুন নাটিকা দেখা হয়নি। তারপর একদিন দুপুরে কৌতূহলবশত খড়খড়ি তুলে তাকিয়ে দেখি রঙ্গমঞ্চের সাজ পালটেছে। টেবিলে সাদা চাদর পাতা, ভালো দেখতে কাঁচের বাসন সাজানো, স্বামী-স্ত্রী ছেলেমেয়েদের নিয়ে আনন্দ করে খেতে বসেছে। দেখে বড় ভালো লাগল।

কিন্তু ছেলেমেয়েদের পিসিমা কোথায়? পাশের বাড়ি থেকে খুড়িমা

Scanned by CamScanner

আমাদের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন, তিনি বললেন, ওদের নিয়মে মেয়েরাও পৈতৃক সম্পত্তির ভাগ পায়। সে-সময় হিন্দুদের মেয়েরা কিছুই পেত না, এ কথা বলা বাহুল্য। কাজেই বাড়ি ভাগ হয়েছে, পিসির এখন আলাদা হেঁসেল। সেদিকটা আমাদের বাড়ি থেকে দেখা যেত না।

তারপর নিজের ভাবনা-চিন্তা নিয়ে নিবিষ্ট ছিলাম, ওদের কথা মনে ছিল না। বেশ কিছুদিন পরে একটা ছুটির দিনে পাশের বাড়িতে সকালে আবার হাঁকডাক। খুড়িমার ছেলেরা দৌড়ে এসে দাদা কল্যাণ অমিকে ডেকে নিয়ে গেল। পাশের বাড়ির ঝি এসে কান্নাকাটি করছে, পিসিমা সেই যে আটটায় স্নান করতে ঢুকেছেন, এখন প্রায় দশটা বাজে, এখনো বেরোন নি, ডাকাডাকির কোনো উত্তরও দিচ্ছেন না। আর ভাইও ভোরে কোথায় বেরিয়ে গেছেন, তাঁর নাগাল পাওয়া যাচ্ছে না।

স্নানের ঘরের দরজা ভেঙে দেখা গেল, পিসিমা ভিজে কাপড় পরে মাটিতে শুয়ে আছেন, চোখ দুটি বোজা। সে চোখ আর খুলল না। মনটা খারাপ হয়ে গেল। ছোট সুখী পরিবারটিকে দেখে খুশি হতাম; ভাবতাম মা মরে ওদের শাপে বর হয়েছে। সেদিন হঠাৎ মনে পড়ে গেল যে এক-একদিন বিকেলে দেখেছি, ছেলেমেয়েদের পিসিমা বুকে একতাড়া খাতা আঁকড়ে ধরে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছেন। নিজের দরজা খুলবার আগে একবার এদের অংশের জানলার দিকে তাকাতেন। মনে হত বড় ক্লান্ত, বড় একা।

ভাবতাম এক শতকের প্রায় সিকি ভাগ কাটিয়ে দিয়েছি, কিন্তু বলবার মতো কি করেছি? কয়েকটা স্কলারশিপ মেডেল পেয়েছি, কয়েকটা প্রবন্ধ আর ছোটদের গল্প লিখেছি। ব্যস্, তাতেই হয়ে গেল?

বিলেত গিয়ে আরো পড়াশুনো করলে কেমন হয়? কিন্তু যাবই বা কি করে? মরে গেলেও বাবার কাছে টাকা চাইতে পারব না; দিদির মাইনে একশো টাকা, দাদা স্ট্যাটিস্টিকেল ইনস্টিটিউটে শিক্ষানবিশি করছে। শান্তিনিকেতনের কথা মনে হত। সেখানে গিয়ে কোনো লাভ হয় নি বলতে পারব না। তাঁদের হয়তো হয় নি, কিন্তু আমার যথেষ্ট হয়েছে। কত লোকের সান্নিধ্যে এসেছি, কত বন্ধু লাভ করেছি।

Scanned by CamScanner

মনে পড়ল নেপালবাবুর বাড়িতে মাঝে মাঝে নেমন্তন্ন হত। ইতি-হাসের অধ্যাপক নেপালবাবু। অনেকের কাছে তাঁর আলাভোলা ভাবের গল্প শোনা যায়, তার কিছু হয়তো সত্যি, বাকি বানানো। কিন্তু তাঁর অগাধ স্নেহের কথা বড় একটি শোনা যায় না। সে স্নেহের তুলনা হয় না। আমি ছিলাম অচেনা একটা মেয়ে, বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যার সব সময় খুব বনিবনাও থাকত না, আমাকে কেন তিনি ডেকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে লুচি, মাছের কালিয়া, আর ছোট ছোট খুরিতে করে সত্যিকার বাঙালদেশের ভাপা দই খাওয়াতেন।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ, প্রায়ই তাঁদের বাড়িতে ধরে নিয়ে যেতেন। না খাইয়ে বৌদি ছাড়তেন না। আরো কত-জনার কত স্নেহের কথা ভাবতাম। সুপ্রিয় বলে একটা ছেলে ছিল, উঁচু ক্লাসে পড়ত, রোগা, তালঢ্যাঙা, পড়াশুনোয় যত্ন নেই, ভারি বেয়াদব। খুব বকতাম তাকে, কড়া কড়া কথা বলতাম।

রোজ ভোরে ঘুম থেকে উঠে দেখতাম আমার জানলার বাইরে কে একটা গোলাপ ফুল রেখে গেছে। বুবু আমার অজ্ঞাত ভক্তকে নিয়ে রসালাপ করত। একদিন তাকে হাতেনাতে ধরলাম। ঘরের ভিতর থেকে হাত বাড়িয়ে তার হাতের কব্জিটাকে শক্ত করে ধরে ফেললাম। সুপ্রিয় আমাকে দেখে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। হাত ছেড়ে দিতেই পাঁই-পাঁই ছুট।

গুরুদেব ওর চঞ্চলতার কথা শুনে ওকেই ছাত্রমণ্ডলীর কর্তা করে দিলেন। অন্যায় অনিয়ম বন্ধ করাই হল ওর কাজ। আশ্চর্য পরিবর্তন হল ওর, এত কর্তব্যপরায়ণ দয়ালু অধিনায়ক কম ছিল। দুঃখের বিষয় সুপ্রিয় অকালে দেহত্যাগ করেছিল।

এইসব নানা কথা ভাবতাম। তার মধ্যে একদিন নীহারদা, অর্থাৎ ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, হঠাৎ এসে বললেন, 'এটা কিন্তু তোমার কুঁড়েমি করার সময় নয়।' ধরে নিয়ে গেলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কাছে। আশুতোষ কলেজের মেয়েদের বিভাগ খোলা হচ্ছে, একজন মহিলা অধ্যাপিকা দরকার, ওদিককার ভার নেবার জন্য।

Scanned by CamScanner

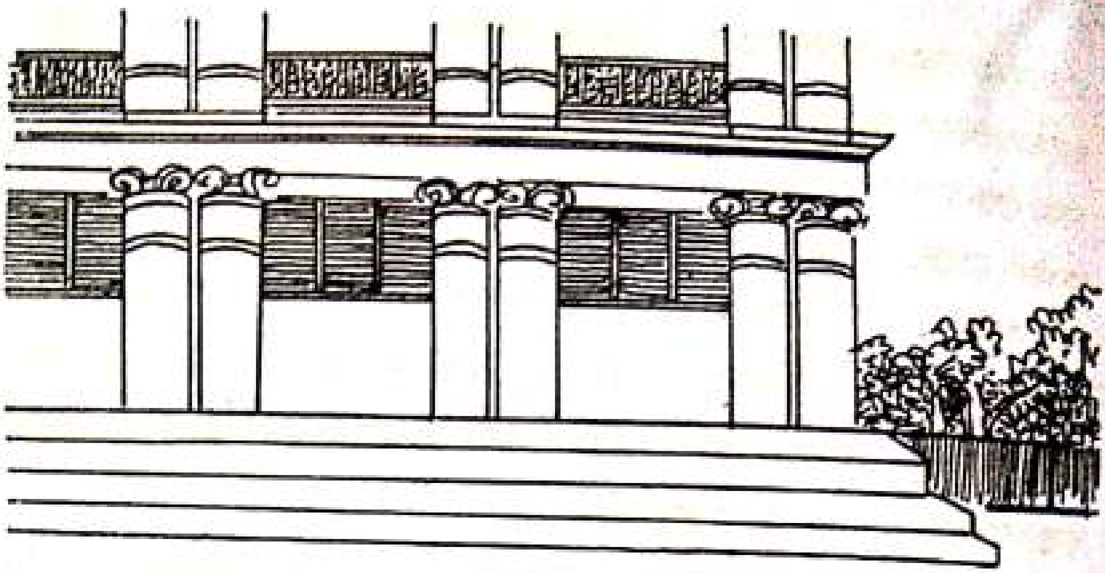

॥ তেইশ ॥

শ্যামাপ্রসাদবাবু আমার ইন্টারভিউ নিলেন ওঁদের পৈতৃক বাড়ির দোতলার সামনের ঘরে। নীহারদা আমাকে পৌঁছে দিয়ে কি একটা অযথা অজুহাতে সরে পড়ল। শ্যামাপ্রসাদবাবু বললেন, 'বসুন।' বসলাম। চাকরির জন্য এই আমার প্রথম ইন্টারভিউ, চাকরির দরখাস্ত দেওয়া এই প্রথম ও শেষ। এর আগে দার্জিলিং-এর সেই স্কুলে, তারপর শান্তিনিকেতনে আমাকে চিঠি লিখে দরখাস্ত করতে হয় নি। তাঁরা ঘরোয়াভাবে আমাকে ডেকেছিলেন আর আমিও লক্ষ্মী মেয়ের মতো গিয়েছিলাম। এ দরখাস্তটাও আমি নিজে লিখি নি, নীহারদা-ই লিখে এনে আমাকে বলেছিল, 'এইখানে সই কর।' দেখলাম বয়সটা একটু বাড়িয়ে লিখেছে। সে কথা বলাতে বলেছিল, 'তা না হলে ওরা তোমাকে নেবে না।'

শ্যামাপ্রসাদবাবুর সামনে গোল কাঠের টেবিলের উপর সেই দরখাস্তটিকে দেখলাম। ঘরে কয়েকটা কাঠের চেয়ার, একটি বেঞ্চি; দরজায় পরদা নেই। দেয়ালে ছবি হয়তো ছিল, কিন্তু তাও সাজাবার উদ্দেশ্যে নয়, বোধ হয় বড় বড় ফটো। শ্যামাপ্রসাদবাবুর পরনে গেঞ্জি ও ধুতি। মুখের দু'পাশে প্রসন্নভাবে গোঁফ ঝুলে রয়েছে, চোখ দুটি হাসি-হাসি। বুঝলাম আমি মনোনীত হয়েই গেছি। অমন খাসা একখানা দরখাস্ত দেখে মনোনীত না করেই বা করেন কি! পরে চিঠিতে দেখলাম একশো টাকা মাইনে পাব। দুটো-একটা মামুলি প্রশ্ন করেই বললেন, 'তা হলে

Scanned by CamScanner

সোমবার থেকে, কেমন?' আমি তো অবাক। আরো বললেন, 'মেয়েরা ভর্তি হতে শুরু করেছে কিনা, দেরি করাটা ঠিক নয়।' এক কথায় রাজি হয়ে গেলাম। নমস্কার করে চলে যাচ্ছি, ডেকে বললেন, 'এতটুকু কোথাও অসুবিধা মনে করলে আমাকে জানাবেন।'

সিঁড়ির কাছে নীহারদা দাঁড়িয়ে। হেসে বলল, 'একেবারে না দেখে বহাল করতে তো আর পারেন না!'

এই প্রথম শ্যামাপ্রসাদবাবুকে দেখলাম। ছোটবেলায় দেখা সেই আমাদের বাংলার বাঘের ছেলে। আমার মাস্টারমশাই রমাপ্রসাদবাবুর ছোট ভাই। তখন বয়সটা তাঁর তেত্রিশ চৌত্রিশের বেশি নয়। দিব্যি গেঞ্জি গায়ে তরুণ বয়স্কা অপরিচিতার ইন্টারভিউ নিলেন। ভেবে হাসিও পেল, আশ্চর্যও লাগল। একবারও মনে হল না এর মধ্যে কোথাও এতটুকু সৌজন্যের অভাব আছে। তাঁকে যখনি দেখেছি, যেখানেই দেখেছি, মনে হয়েছে, সৌজন্যের প্রতিমূর্তি।

আশুতোষ কলেজের মেয়েদের বিভাগ নতুন খুলেছে। তখনো কলেজের নিজের বাড়ি হয় নি, বর্তমান বাড়ির প্রায় উল্টোদিকে "বিজনি হাউস" ভাড়া নিয়ে কলেজ হয়। মেয়েদের ক্লাস সকাল সাতটা থেকে সাড়ে দশটা কি পৌনে এগারোটা, তার আধ ঘণ্টা পরে ছেলেদের ক্লাস।

দু-একদিনের মধ্যেই বুঝলাম ঐ ব্যবধানটা অনেক বুদ্ধি করেই করা হয়েছে। ১৯৩২ সালের মেয়েরা এখনকার মতো এত বেশি প্রকট ছিল না যে তাদের দেখবার জন্যে লোকের কৌতূহল হবে না। যতক্ষণ মেয়েদের ক্লাস চলত কলেজের বড় বড় লোহার গেট এঁটে বন্ধ করে, দরওয়ান টুল নিয়ে বসে থাকত। ছুটি হলে সব মেয়েদের পার করে দিয়ে তবে ছেলেদের ঢুকতে দিত। ছেলেরাও ফুটপাথে দাঁড়িয়ে থাকত, এদিকে পা দিলেই দরওয়ান রেগে উঠত।

আসলে জমিদার বাড়ি; সামনে পাম গাছের সারি, ভিতরেও বাগান, কিছু দামি দামি গাছ, রান্নাবাড়ি। এখন কলেজ হয়েছে। বাড়ির সামনের হাতাটুকু বেশ; সেখানে বেড়াতে ইচ্ছা করে। কিন্তু বেড়ালেই রাস্তায় দর্শক জোটে। আমি মেয়েদের ডেকে আনি। তাদের কারো কারো

Scanned by CamScanner

আমার কাছাকাছি বয়স। একসঙ্গে বসলে আলাদা করে চেনা যায় না। নতুন মেয়েরা জিজ্ঞাসা করে, কোন্ ইয়ারে ভরতি হয়েছি। শেষটা মেয়েদের কমনরুমে বসা ছেড়ে দিতে হল। অধ্যাপকদের বসবার ঘরে গেলাম। তাঁরা খুব খুশি হলেন মনে হল না। বোধ হয় রসালাপে বাধা পড়ত।

এক মাসের মধ্যে বাহাত্তরটি মেয়ে ভরতি হল। চার ইয়ারেই মেয়ে এল : যতদূর মন হচ্ছে তখনও বিজ্ঞান বিভাগ খোলা হয় নি। কলেজের অধ্যক্ষ একজন আশ্চর্য মানুষ। নাম পঞ্চানন সিংহ; একমুখ দাড়িগোঁফ, প্রসন্ন স্নেহশীল ব্যবহার।

কোমলে কঠিনে সমাবেশ, গুরুর যেমন হওয়া উচিত। ছাত্রীদের কন্যার মতো দেখতেন, যত্নও করতেন, আবার দরকার হলে শাসনও করতেন, কাউকে ছেড়ে কথা কইতেন না। একদিন একটা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন। বললেন, 'লেখাপড়া শিখতে গেলে মেয়েদের ঘরকন্নার কাজ শেখা হয় না।' মিটমিট করে হেসে আমার প্রথম বার্ষিক শ্রেণীকে বললেন, 'রাঁধতে পার? শুধু মুখে বললে হবে না, রেঁধে প্রমাণ করে দাও।'

ব্যস্ আর কথা নয়, একটা রবিবার অধ্যাপকমণ্ডলীকে নেমন্তন্ন করে আমাদের বাহাত্তরটি মেয়ে নিখুঁত ভাবে খাইয়ে দিল, শুক্তো, ছ্যাঁচড়া, মোচার ঘণ্ট, মাছের কালিয়া, মাংস, চাটনি, পায়েস। পঞ্চাননবাবু নিজের কান মলে কথা ফিরিয়ে নিলেন। এখন অবিশ্যি মনে হয় সবটাই একটা সার্থক পরিকল্পনা, রাগিয়ে দিয়ে ভোজ আদায় করা।

ভালোই লাগত। ভারি সুষ্ঠুভাবে কাজ চলত। শান্তিনিকেতনে পড়াশুনা সম্পর্কে যেমন একটা অগোছাল ভাব ছিল, এখানে ঠিক তার উল্টো। কখনো কোনো অশান্তি ঘটে নি। একবার প্রবীণ পূর্ণচন্দ্র উদ্ভটসাগর এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই তো ফ্যাসাদে ফেললেন! কি সব বই পড়াতে দিয়েছেন! এদিকে "কৃষ্ণকান্তের উইল" পড়াতে হবে; ওদিকে পয়ে র-ফলা একার ম উচ্চারণ করলে ছাত্রীরা হয়তো গার্জেনের চিঠি আনবে। কি করা যায় বলুন!'

বললাম, 'খালি উচ্চারণ করবেন তো? আর কিছু করবেন না তো?'

Scanned by CamScanner

উদ্ভটসাগর নাসা কুঞ্চিত করলেন। আমি ব্যস্ত হয়ে বললাম, 'তা হলে কোন ভয় নেই।'

বাতাসটাই অন্যরকম। সেই গানের সুর প্রাণের জোয়ার কোথায়? শুধুই পড়াশুনো; ভাবি তাই দিয়ে কি আর নারী তৈরি হয়? শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের জীবনে এক ধরনের পরিপূর্ণতা ছিল। তাদের রান্না-ঘরে, অতিথিশালায় ডিউটি থাকত। বর্ষাদিনে চাঁদনি রাতে উৎসব হত, বেড়ানো হত। নাটক, প্রদর্শনী, সাহিত্যসভা। আর গান দিয়ে ফাঁকগুলো ভরা। এখানে শুধু পড়া।

অবিশ্যি শুধু পড়া কি আর হয়? বিশেষ করে যেখানে বাহাত্তরটি ষোল থেকে কুড়ি-বাইশ বছরের মেয়ে জড়ো হয়েছে? প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে কোঁকড়া চুল স্বাস্থ্যবতী একটি মেয়ে ছিল। পড়াশুনায় বেশ ভালো। তার মুখে একটা বুদ্ধির দীপ্তি তাকে অন্য মেয়েদের থেকে আলাদা করে রাখত। দশটা সুন্দর মেয়েকে ছেড়ে বার বার তার উপরেই চোখ পড়ত। তার নাম বাণী রায়। তখনি কবিতা লিখত কিনা জানি না।

মাঝে মাঝে শ্যামাপ্রসাদবাবু কলেজ দেখতে আসতেন। কিন্তু কোনো বিষয়ে আমার মতামত চাইতেন বলে মনে পড়ছে না। অধ্যাপকমণ্ডলীর কোনো সভার কথাও মনে নেই। সবটাতেই একটা বাধ্য, শিষ্ট, ভদ্র ব্যবস্থা। মাঝে মাঝে হাঁপিয়ে উঠতাম। শান্তিনিকেতনে যাঁরা অধ্যাপনা করতেন তাঁদের সবাইকে ডেকে গুরুদেব মাঝে মাঝেই সভা করতেন। সেখানে ন্যূনতম মাস্টারমশাইকে মনের কথা বলার সুযোগ দিতেন।

একদিন শ্যামাপ্রসাদবাবু আমাকে বললেন, 'একটা এক্সপেরিমেন্ট করব। তুমি ছেলেদের ইংরেজি অনার্সের একটা ক্লাস নেবে।' সাহিত্যের ইতিহাস পড়াতে হবে। ইংরেজি অনার্সের মেয়ে দুটিও থাকবে। একটু ঘাবড়ে গেলাম। সেকালে সবাই বলত আশুতোষ কলেজে লক্ষ্মী ছেলেরা যায় না। যাদের আর কোথাও নেয় না তারাই নাকি যায়। বাপে তাড়ানো মায়ে খেদানোর দল দিয়ে কলেজ ঠাসা। মনে পড়ল প্রথম প্রথম শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের সম্বন্ধেও লোকে এই কথাই বলত।

Scanned by CamScanner

কিন্তু সেখানেও তো কত আনন্দের সঙ্গে ছেলেদের ইংরেজি অনার্স পড়িয়েছি। তাছাড়া শ্যামাপ্রসাদবাবুর কথা ঠেলা আমার সাধ্যের বাইরে।

প্রথম দিন আমিও একটু ভয় পাচ্ছিলাম আর ছাত্ররাও আমাকে পরখ করে নিচ্ছিল। পা ঘষছিল, নিজের মধ্যে কথা বলছিল। মেয়ে দুটো আমার কাছ ঘেঁষে বসেছিল। বিপদ বুঝলে আমার পিছনে আশ্রয় নেবে। আমি ছেলেদের বললাম, 'তোমরা আমার ছোট ভাই। যার যা বলার—নিজেদের মধ্যে বলে নেওয়া আর পা ঘষা হয়ে গেলে, রোল্ কল্ করব।' অমনি সব চুপ। এমন কি লাস্ট বেঞ্চির দুটি ছেলে, যারা একটু বাড়াবাড়ি করছিল, তারা তখনি উঠে ক্ষমা চাইল। ব্যস্, ওদের আর আমার মধ্যে একটা সাঁকো তৈরি হয়ে গেল।

মাত্র একটা বছর ওখানে অধ্যাপনা করেছিলুম। তার মধ্যে এক-দিনের জন্যেও একটিও অপ্রিয় ঘটনা ঘটে নি। ক্লাসে সর্বদা একটা আনন্দের পরিবেশ বিরাজ করত।

কিন্তু মন ভরত না। জানতাম এক বছরের কনট্র্যাক্ট সই করেছি, তার বেশি থাকা হবে না। রুটিন বাঁধা কাজ আমাকে দিয়ে হবে না। তাছাড়া বেলা বারোটার মধ্যে বাড়ি ফিরে আসি, সামনে অনেকগুলো ঘণ্টা মরুভূমির মতো খাঁ খাঁ করে। সব চাইতে খারাপ হল যে লিখতে ইচ্ছা করে না। জীবনে মাঝে মাঝে এই রকম ব্যর্থ বন্ধ্যা একেকটা সময় এসেছে।

তার মধ্যে দিদি বলল, 'তোর করার কিছু না থাকে তো আমাদের কলেজে পার্টটাইম লজিক পড়াস না কেন!' এক মুহূর্তও চিন্তা না করে বললাম, 'পড়াব।' পরদিন-ই হরিশ মুখার্জি রোডে ওদের কলেজে গিয়ে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাত্রী ও প্রধানা শ্রীযুক্তা সরলা রায়ের সঙ্গে দেখা করলাম। সোমবার থেকে রোজ দু'এক ঘণ্টা লজিক পড়াব ঠিক হল। শনি রবি ছুটি; ওঁরা গাড়ি করে নিয়ে যাবেন, দিয়ে যাবেন, বেতন পঞ্চাশ টাকা। সকালে সোয়া ছ'টায় আশুতোষ কলেজের বাস আসে; ফিরতে বারোটা বাজে। স্নানাহার করে উঠতে না উঠতে গোখেলের গাড়ি আসে,

Scanned by CamScanner

ফিরি চারটের পরে। ভাবলাম এবার সময়কে জব্দ করেছি, এমনি এঁটে রেখেছি যে নিরন্তর ঐ পাখা ঝাপটানির শব্দ শুনতে পাব না। বিকেলে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি আসব, তারপর ভাইবোনেরা বাড়ি ফিরলেই, অমনি বাড়ির হাওয়াটা কেমন জমজমাট হয়ে থাকবে।

তবে শান্তিনিকেতনে গিয়ে অবধি এদের থেকে একটু অন্য রকম করে ভাবি। বিশেষ করে সেখানকার বন্ধুবান্ধবরা দেখা করতে এলে, এরা তাদের নিয়ে পরে যেসব মন্তব্য করে, তাতেই বুঝি ঐ বন্ধুত্বগুলোর ভাগ এরা নেবে না। ঘনিষ্ঠ পরিবারের বন্ধুরাও সাধারণ সম্পত্তি হয়। তাই মনে একটু খচ্ খচ্ করে।

দিদি বদলায় না। বলে, 'মিসেস্ পি কে রায় তোর কাজ দেখে খুব খুশি। দেখিস যেন আবার মেয়েদের সঙ্গে বেশি ঠাট্টা-তামাশা করিস না।' এদিকে মিসেস্ পি কে রায় যে একজন অসাধারণ মহিলা তা টের পাই। অনেক বয়স হয়েছে, শুনেছিলাম আমাদের দাদামশাই দিদিমাকে চিনতেন। চিত্তরঞ্জন দাশের নিকট-আত্মীয়া, দার্শনিক ডক্টর পি কে রায়ের স্ত্রী। পি কে রায় তখন নেই, বোর্ডিংই সরলা রায়ের ঘরবাড়ি। শোক পেয়েছেন যথেষ্ট, ছেলে মারা গেছে, ছোট মেয়েটি চিররুগণা। তার সঙ্গে তাঁর মা'র ব্যবহারে কি কোমলতা, কি অপরিসীম করুণা দেখেছি। শুনেছিলাম অল্প বয়সে নিজের মাকে হারিয়েছিলেন। বারো বছর বয়স থেকে ছোট ভাই-বোনদের মা হয়ে বসেছিলেন। স্বামীর সঙ্গে বিলেতে ছিলেন অনেক দিন। যেখানেই যখন গেছেন দেশের ছেলেমেয়েদের যাতে ভালো হয় শুধু সেই চেষ্টাই করেছেন। বিদেশে যাতে ভারতীয় জ্ঞান ও সংস্কৃতির আদর হয়, সেই চেষ্টাই করেছেন।

আমার বড়দা, সুকুমার, যখন বিলেতে ছিল ১৯১২-১৯১৩ সালে, ওঁরাও তখন সেখানে। ওঁদের বাড়িটি ছিল ওখানকার ভারতীয় ছেলেদের মিলনস্থল। গানবাজনা হত, মূক নাটক হত, রবীন্দ্রনাথের নাটক ইংরে-জিতে অনুবাদ করে অভিনয় করাতেন। এ-সব কথা বড়দা বাড়িতে লিখত।

সরলা রায় এলোমেলো কাজ করতেন না। পৌরাণিক বিষয় নিয়ে

Scanned by CamScanner

মূক অভিনয় হবে। বড়দাকে ধরে বসলেন লাইব্রেরিতে গিয়ে বই ঘেঁটে, তখনকার পোশাক-পরিচ্ছদ, গৃহসজ্জা কেমন ছিল সব জেনে দিতে হবে!

তার উপর সর্বদা আমাদের মেয়েদের শিক্ষার দিকে দৃষ্টি। একটা বৃত্তির ব্যবস্থা করে ফেললেন, যার সাহায্যে একজন করে ভারতীয় মেয়ে তিন-চার বছর বিলেতে শিক্ষা করে ডিগ্রি নিতে পারে। বহু মেয়ে এই বৃত্তির সুবিধা নিয়ে বিলেত গিয়েছে।

গোখেল মেমোরিয়েল স্কুল ও কলেজ ইনিই একরকম একা হাতে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। গুরুদেব যে পরিপূর্ণ মানুষ গড়ার স্বপ্ন নিয়ে শান্তি-নিকেতন বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন, সরলা রায়ের চোখেও সেই স্বপ্ন ছিল। তিনিও চাইতেন পরিপূর্ণ নারী তৈরি করতে। বলতেন, শুধু পড়া-শুনো দিয়ে তা হয় না। শতকরা নিরানব্বুই জন মেয়েই সংসার করবে, অথচ স্কুলের পাঠ্য তালিকায় তার জন্যে কোনো প্রস্তুতিই নেই। পাস করবে, কিন্তু রাঁধতে, ছেলেমেয়ে দেখতে, সুন্দর করে সংসার সাজাতে শিখবে না। তাঁর স্কুলে সেই চেষ্টাই করতেন, যাতে নিটোল একটি জীবনের জন্যে মেয়েরা প্রস্তুত হয়। স্বপ্নটাও ছিল, চেষ্টাও ছিল। তাই আমার ভালো লাগল। দেখতাম মোটাসোটা মানুষটি, চুলে পাক ধরেছে, থান পরনে, তবু একটু মেম-মেম ভাব। চেষ্টাকে কর্তব্য মনে করতেন তাই করে যেতেন, লোকের মতামতের ধার ধারতেন না। একটার পর একটা সিগারেট খেতেন, সিগারেটের টিন নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন। সে সময় এটা একটা অভাবনীয় ব্যাপার ছিল। অনেকে নিন্দা করত।

কিছু-না থেকে অত বড় স্কুল-কলেজ করলেন। অক্লান্তভাবে খেটে টাকা তুললেন। তাঁর অসাধ্য কিছু ছিল না। তখন বৃটিশ রাজের যুগ। একজন বড় ব্যবসাদার একটা শর্তে স্কুলের জন্য মোটা চাঁদা দিতে চেয়ে-ছিলেন। শর্তটা হল কোনো একটা ফ্যাশনেব্‌ল্‌ অনুষ্ঠানে তাঁকে বড়-লাটের পাশে বসার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। সরলা রায়ও কম ছিলেন না; ব্যবসাদারকে বড়লাটের পাশে বসার ব্যবস্থা করে দিলেন, স্কুলের তহবিলে মোটা টাকা জমা হল।

তাঁর স্কুলে সামান্য পার্ট-টাইম অধ্যাপিকা হয়েও গর্ববোধ করতাম।

Scanned by CamScanner

দুঃখের বিষয় দু'বেলা কলেজ করা শরীরে কুলোল না। পার্ট-টাইম কাজটি ছাড়তে হল। এখনো ঐ স্কুল-কলেজের জন্যে আমার মনের মধ্যে একটা কোমল উষ্ণ জায়গা রাখা আছে।

১৯৩২ সাল ক্রমে শেষ হয়ে এল। আবার ছোটদের জন্যে লেখার দিকে মন দিতে পারলাম। মনে কি রকম একটা ব্যর্থতাবোধ একটা ক্ষোভ জমা হচ্ছিল, সেসব আস্তে আস্তে কোথায় যে মিলিয়ে গেল, নিজেই টের পেলাম না।

একদিন কোথায় একটা পুরনো চীনা প্রবাদ পড়লাম।

'Plant a green bough within your heart,
and the singing bird will come.'

নিভৃত হৃদয়ে একটি সবুজ গাছের ডাল পুঁতে দাও; গানের পাখি নিজেই আসবে।

ছোটবেলা থেকে আমার জীবনের আকাশে বাতাসে যে-সব পাতার মর্মর, ছোট ছেলের কলহাস্য, স্নেহের কণ্ঠ শুনেছি তারাই আমার মনের বনের গানের পাখি। সবুজ গাছের ডালটি যতদিন পুঁততে পারি নি, বসার একটু জায়গা পায় নি তারা।

বুঝতে পারি জন্মক্ষণে পরিপূর্ণরূপে জন্মাই নি আমি। তার পর থেকে প্রতি মুহূর্তে যা দেখেছি, যা শুনেছি, যা পড়েছি, যা ভেবেছি, যা দিয়েছি, যা পেয়েছি আর যা পাবার নয়, যাকে শুধু স্বপ্নে দেখেছি, সব মিলিয়ে তিলে তিলে কণা কণা করে আমি তৈরি হয়েছি। তাদের কাছে আমার ঋণ-ই আমার পরম গৌরব।

Scanned by CamScanner

উপসংহার

পাহাড়ে শহরটির নাম শিলং। আমাদের নীল করুগেটের ছাদ দেওয়া বাড়িটির নাম ছিল হাই-উইন্ড্স্। সেই তীক্ষ্ণ বাতাস আটত্রিশ বছর পরেও আমার মনে ঢেউ তোলে।

একবার গিয়ে জায়গাটাকে দেখে এসেছিলাম। ন্যাসপাতি গাছের বদলে অন্য গাছ দেখলাম। বুনো আপেল গাছটিও নেই। পাতিলেবুর গাছ দুটির মাঝখানে যে বড় বড় সবুজ মাকড়সারা জাল বুনে প্রজাপতি ধরত, তারা সবাই চলে গেছে। লেবুগাছ কেটে, এখন যাঁরা ও বাড়িতে থাকেন তাঁদের মোটর গাড়ির গ্যারাজ হয়েছে।

মার ভায়োলেট বাগানের মাঝে যে ঝাউগাছ ছিল, তার জায়গায় ত্রিশ ফুট উঁচু দেবদারু।

ঘরের ভিতরে যাওয়া হল না। যাঁরা ওখানে থাকেন তাঁদের তেমন আগ্রহ দেখলাম না। সামনের কাঁচের দরজাটা ভেজিয়ে দিলেন। তখন অক্টোবর মাসের শেষ, হঠাৎ বড় শীত করতে লাগল। বাইরে দাঁড়িয়ে চারদিকে চেয়ে দেখলাম। পূর্বের সেই সিসল গাছের বেড়াও নেই। সেখানে দেয়াল বসেছে। রাতে নিশ্চয় ঝিঁ ঝিঁ পোকারাও আর ডাকে না।

যেসব বড় বড় গাছ তাদের সবুজ ছায়া দিয়ে কাউই সাহেবের বাড়ি-টাকে আড়াল করে রাখত, তারা সব কোনকালে কার উনুনে পুড়েছে। বাড়িটা ন্যাড়া হয়ে সকলের চোখের সামনে প্রকট। তার গায়ে এতটুকু মায়া-ও লেগে নেই।

সামনে ফিরিঙ্গিদের সরকারি স্কুলটা প্রায় তেমন-ই আছে। শুধু মনে হল ছেলেমেয়েগুলো যেন তখনকার চাইতে অনেক বেশি কালো। টিচাররা এখনো পাশের বাড়িতে থাকেন। তার অন্য পাশে নরেন্দ্র বাড়ি-টাতেও শুনলাম কয়েকজন ফিরিঙ্গি টিচার থাকেন। ঐ বাড়িতে বাংলার বাঘ দেখেছিলাম। অন্য লোক, অন্য হাওয়া।

Scanned by CamScanner

আমাদের বাড়ির পিছনে, পাহাড়ে নদীটির ধারেও সারি সারি বাড়ি হয়েছে। এখান থেকে জলের ওঠা-পড়া আর দেখা যায় না।

নদীর ওপারে লুমপারিং পাহাড় এখন শহর হয়ে গেছে। সব জায়গায় বিজ্‌লি বাতি জ্বলে। ঐখানে একবার দেখেছিলাম পাহাড়ের চুড়োয় বাচ্চার ডাক শুনে, মা-গরু আমাদের মেদির বেড়া ডিঙিয়ে, পাথর টপকিয়ে, বাগান মাড়িয়ে, কাঁটাতারে গা ছিঁড়ে, পাগলের মতো খাড়া পথ বেয়ে, কোনোদিক ভ্রূক্ষেপ না করে, রক্তাক্ত দেহে হাম্বা হাম্বা করে বাচ্চার কাছে ছুটে যাচ্ছে।

দশ বছর ঐখানে বাস করে, এত মনোযোগ দিয়ে দেখেও যা সন্দেহ করি নি, এবার তাকে স্পষ্ট দেখতে পেলাম। উঁচু পাহাড়ের মাথায় মাথায় মোটর যাবার পথ। ঘন বন পাতলা হয়ে গেছে। পাহাড় চূড়োয় যেখানে তখন রোমাঞ্চ বাস করত, এখন সেখানে জিপ গাড়ি যাওয়া-আসা করছে।

আমাদের স্কুলটাকেও দেখতে গেলাম; তার প্রত্যেকটি ঘরের প্রত্যেকটি কোনা আমার মনে আঁকা ছিল। কোথাও নেই সে। ছোট পাহাড়ের মাথাটি ফাঁকা ; কিন্তু মরশুমি ফুল ফুটেছে। সেই স্কুলবাড়িটা নাকি পুড়ে গেছে। অনেক নিচে পাহাড়ের গা কেটে কংক্রিটের নতুন স্কুলবাড়ি হয়েছে, কেমন চাঁচাছোলা, কার্যকরী, আধুনিক।

বন এসে তখন আমাদের ঘরে ঢুকত। বনে আগুন লাগলে আঙিনায় তার ছাই পড়ত। এখন বন তার সবুজ শতরঞ্চি গুটিয়ে সরে গেছে। যেখানে ধানক্ষেত ছিল সেখানে পাড়া হয়েছে। কে যেন জানতে চাইছিল অমন ঘিঞ্জি পাড়ার নাম 'ধানক্ষেতি' কেন?

ঐখানেই নদীর ধারে নতুন রাস্তা হবার সময় কুলিমেয়েরা দুপুরে কাজ থামিয়ে নদীর জলে হাত পা ধুয়ে, গাছে ঝোলানো ন্যাকড়ায় বাঁধা কলাই ওঠা বাটি থেকে মোটা মোটা মেটে রঙের ভাতের সঙ্গে লঙ্কায় রগরগে লাল শুঁটকি মাছের চচ্চড়ি খেত। এখন ওখানে কত চায়ের দোকান, রেস্তোরাঁ, হোটেল। কুলিমেয়েদের কাজ করে বুল্‌-ডোজার। ওখানকার লোকেরা গর্ব করে বলল, 'দেখ, এখন এখানে থাকার কত

আর কোনোখানে—১৩

Scanned by CamScanner

সুবিধা। তোমরা শুধু কষ্টই করে গেছ।'

হঠাৎ চেয়ে দেখি, নদীটা কিছু বদলায় নি। নুড়ি পাথরের উপর দিয়ে, পুলের তলা দিয়ে, কুলকুল করে তেমনি চলেছে। আকাশে চোখ তুলে দেখলাম পাহাড়ের আকৃতি-ও তেমনি আছে। তেমনি গাঢ় নীল আকাশে তেমনি ছেঁড়া সাদা মেঘ ভাসছে।

ছোট বোনটাও সঙ্গে ছিল। তার কোনো কথাই মনে ছিল না; ছেড়ে যাবার সময় তার দেড় বছর বয়স। যা দেখে আমার মন আঁকুপাকু করছিল, এত অন্তরঙ্গ হয়েও তাই দেখে সে নির্বিকার।

বড় কষ্ট হল। খানিকটা পাহাড়ে উঠলাম। যেখানে ছিল সরলগাছের ঘন জঙ্গল, সেখানে পরিপাটি সারি সারি ঝাউগাছ। বাঘের খোঁয়াড়টিও আর নেই। শুনলাম ওসব অঞ্চলের দুশো মাইলের মধ্যে বাঘ-চিতাবাঘের দেখা পাওয়া যায় না। বুঝলাম ওখান থেকে আমার ছোটবেলাটি পাত-তাড়ি নিয়ে আর কোনোখানে চলে গিয়েছে।

আর আমার সেই ভালোবাসার মানুষগুলোর কি হল?

বাবা, মা, জ্যাঠামশাইরা, জ্যাঠাইমারা, পিসিমারা, মাসিমারা, বড়দা, বড়বৌঠান, মণিদা, আরো কতজনা কেউ বয়স হয়ে, কেউ বয়স না হতেই, যার যখন সময় হল, চলে গেছেন। একদিন যাঁদের বারণ উপদেশ শুনে তিতিবিরক্ত হয়ে উঠতাম, এখন তাঁরা কেউ আমার কোনো কাজে বাধা দেন না বলে মনটা কেমন করে।

আমাদের অত আদরের সবার ছোট ভাই যতিও আর নেই। জীবনে অনেক বিদ্যা অনেক অর্থ অর্জন করেও সে সুখী হয় নি। তারপর একদিন অকালে একলা গেল চলে। বিদায় নেবার অবকাশটুকুও দিল না।

যারা বাকি আছি, তারা সংসারের ধান্দায় কিছুটা দূরে দূরে সরে গিয়েছিলাম, যতি চলে যাওয়াতে আবার সবাই কাছাকাছি ঘন হয়ে বসেছি।

দিদি আর বিয়ে করল না; এখন সে কলকাতার একটি নামকরা কলেজের অধ্যক্ষা। ছোটবোনটা বিলেত আমেরিকা ঘুরে খেতাব নিয়ে এসে একটা বিখ্যাত স্কুলের প্রধানা শিক্ষিকা। তার আইন পাস করা,

Scanned by CamScanner

ভূতত্ত্ববিদ-স্বামীটি ভারি রসিক, ঘোর 'বাংগাল' এবং বেজায় তার্কিক। ভাইরা যে যার কাজে রত। দাদা হল স্ট্যাটিস্টিসিয়ান, এখনো কেমন একটা ছোকরা-ছোকরা ভাব। ছোটদের জন্যে গুটিকয়েক ভালো ভালো বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প লিখেছে। মেজ ভাই কল্যাণ ডাক্তার, বেশি কথা-টথা বলে না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে রসে টৈটম্বুর। তারপর অমি, সে-ও ভালো কাজ করে। সরোজ হল এঞ্জিনিয়ার, একমাত্র সে-ই সরকারি চাকুরে। হরিচরণ, নন্দ, ঋষি, নীলু, সতু, দুখু, শিউলি, বেলী আর যারা যারা আমাদের ছোটবেলাটাকে মশগুল করে রেখেছিল, তারা প্রায় সবাই ভালো আছে। আমার প্রিয় বন্ধু বুবুর বিয়ে হয়েছিল সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বড় ছেলে সুবীরেন্দ্রের সঙ্গে। সুবীরেন্দ্র অকালে সরে পড়েছে। বুবু শান্তিনিকেতনেই থাকে। ঐ সুবীরেন্দ্রের ছোটভাই একদিন সুস্থ পায়ে লম্বা ব্যান্ডেজ বেঁধে আমার ইংরেজি গ্রামার ক্লাস থেকে ছুটি নেবার তালে ছিল। আমার সেদিনকার নির্মমতা সে কবে ক্ষমা করেছে। এখনো দূর থেকে দেখতে পেলেই হাসিমুখে ছুটে আসে।

একদিন মনে ক্ষোভ নিয়ে যে শান্তিনিকেতন ছেড়ে চলে এসেছিলাম, সেই এখন আমার প্রৌঢ় বয়সের মনের নিবাস। সেখানকার নীল আকাশে, সবুজ শালের বনে, পলাশ শিমুল ফুলের রঙে, শুকনো পাতার গুছির ভিতর, উত্তরে হাওয়ার ঝিরঝির ঝুরঝুর শব্দে আর কোনোখানের রঙ দেখি সুর শুনি।

আমাদের শান্তিনিকেতনের বাড়ি থেকে এক পা বাড়ালেই দিন্দার বাড়ির কতকালের চেনা সেই লাল টালির ছাদ দেখা যায়। সেখানে দিন্দার ভাগ্নে থাকে। তাকে দেখি আর ভাবি তাহলে দিন্দাও আছেন কাছেই কোথাও, কান পাতলেই হয়তো গান শুনতে পাব।

পুরনো শান্তিনিকেতনের গুরুদেব, বন্ধুদের দল হালকা হয়ে গেছে। ক্ষিতীন্দ্রমোহন নেই, বিধুশেখর শাস্ত্রী মশাই নেই, নন্দলাল নেই, তনয়েন্দ্র নেই, নগেন আইচ নেই, তেজুবাবুও নেই। দিন্দার বাড়িতে এখন আর কেউ বিচিত্র উপায়ে শুঁটকি মাছ রাঁধে না। সেই মাটির রান্নাঘরটিও উধাও।

Scanned by CamScanner

তবে তেজুবাবুর তালগাছ ঘিরে তালধ্বজ বাড়িটিকে কাঁচের মন্দিরের পাশে যে কেউ দেখতে পাবে। সেখানে এখন কারু সঙ্ঘের মেয়েরা শিল্প-কর্ম করেন। জানলে তেজুবাবু হয়তো খুশিই হতেন।

রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে এখন সবাই চেনে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রূপ যেন খুলে যাচ্ছে। এখন তিনি ভুবনডাঙার নিজের বাড়িতে থাকেন। কেউ গেলে বৌদি কত আদর করেন।

বিদেশী বন্ধু প্রফেসর টাকারের খবর জানি না। প্রিয় বন্ধু হ্যারি টিম্‌বার্স বহুদিন হয়ে গেল স্বর্গে গেছেন, আর্তসেবা করতে করতে, টাইফাস্ রোগে, যত দূর মনে পড়ে রাশিয়াতে।

ডক্টর ধীরেন্দ্রমোহন সেনকেও সবাই চেনে। তিনি এখন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। তাঁর দাদা বীরেন্দ্রমোহনকে—যিনি কাকেও কখনো কটু কথা বলেন নি—কখনো কলকাতায় কখনো শান্তিনিকেতনে দেখা যায়। সম্প্রতি তাঁর স্বাস্থ্য ভালো যাচ্ছে না।

এবার এ কাহিনী শেষ করে দেবার সময় এসেছে। রবীন্দ্রনাথের কথা কিছু বলার নেই; তাঁকে আমরা এমন করে পেয়েছিলাম যে হারানো অসম্ভব। লিখতে লিখতে বুঝতে পেরেছি শুধু কবি কেন, ঐ যে তিনি যাদের কথা বলেছিলেন—যারা আমার সাঁঝসকালের গানের দীপে জ্বালিয়ে দিল আলো আপন হৃদয় দিয়ে, এই জীবনের সকল সাদা কালো যাদের আলোছায়ার লীলা, সেই যে আমার আপন মানুষগুলি নিজের প্রাণের স্রোতের'পরে আমার প্রাণের ঝরনা নিল তুলি—তারা মানুষের রক্তের সঙ্গে মিশে থাকে, ছেড়ে যায় না কখনো।

—শেষ—

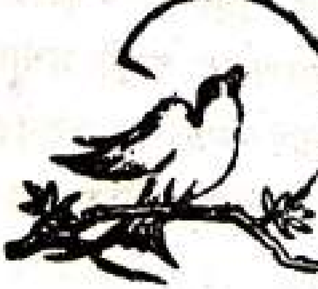

Scanned by CamScanner